হযরত শেখ নিজামউদ্দিন আওলিয়া (রঃ)

জীবন ও কর্ম

[আধ্যাত্মিকতার আলোকে]

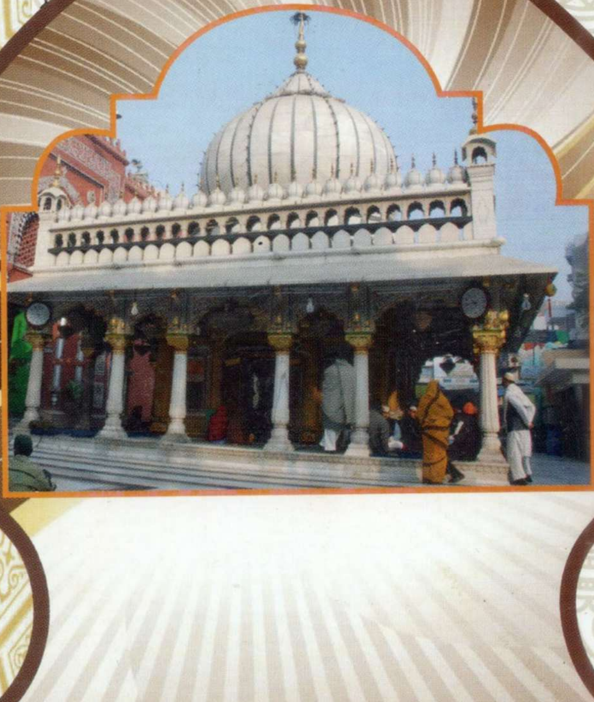

প্রফেসর ড. মুহম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী

হযরত শেখ নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.) ঃ জীবন ও কর্ম
[আধ্যাত্মিকতার আলোকে]

ড. মুহম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী

আলোকধারা বুকস্
এস জেড এইচ এম ট্রাস্টের প্রকাশন
চট্টগ্রাম।

হযরত শেখ নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.) ঃ জীবন ও কর্ম
[আধ্যাত্মিকতার আলোকে]
শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট প্রকাশন
আলোকধারা বুক্‌স-এর পক্ষে

প্রকাশক
সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান
গাউসিয়া হক মন্‌জিল
মাইজভাণ্ডার শরিফ
ডাক-ভাণ্ডার শরিফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম-৪৩৫২

প্রথম প্রকাশঃ সেপ্টেম্বর ২০১৫
দ্বিতীয় প্রকাশঃ ২৬ শে আশ্বিন, ১১ অক্টোবর ২০১৮
আ. বু-১২

প্রচ্ছদঃ লাইভ কালার

মুদ্রণঃ
দি আলোকধারা প্রিন্টার্স
এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট
ডিউ উদয়ন (১৩তলা)
বাস টার্মিনাল সংযোগ সড়ক,
চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম।

মূল্যঃ একশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র।

ISBN 978-984-92208-0-0

Hazrat Shaikh Nizam Ud Din Auliya (R.) : Life and Activities (In Light of Spiritualism) by: Dr. Muhammad Abdul Mannan Chy. Published by Syed Mohammed Hasan on behalf of Alokdhara Books, an organ of Shshanshah Hazrat Syed Ziaul Huq Maizbhandari (KA) Trust, Gausia Huq Manzil, Maizbhandar Sharif, P.O.-Bhandar Sharif, Fatikchari, Chittagong-4352. Price: Tk 150 USS 5.00.

উৎসর্গ

তাসাওউফ জগতের এক অবিস্মরণীয় মহান ব্যক্তিত্ব

মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ গোলাম রহমান মাইজভাণ্ডারী (কঃ)

হযরত বাবা ভাণ্ডারীর (১৮৬৫-১৯৩৭)

পবিত্র কর্ম ও মর্মের স্মরণে

সূচীপত্র

লেখকের কথা -- ০৫

মুখবন্ধ -- ০৮

প্রথম অধ্যায় -- ২৪

সূচনা বক্তব্য

দ্বিতীয় অধ্যায় -- ৩০

হযরত নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.)'র আধ্যাত্মিক বিকাশে তাঁর জন্মস্থান বাদাউনের প্রভাব

তৃতীয় অধ্যায় -- ৩৭

দিল্লীতে প্রাথমিক পর্যায়ে অবস্থানকালে শেখ নিজাম (র.)'র জীবন সংগ্রাম ঃ শিক্ষাগত উৎকর্ষ সাধন ও দারিদ্র্যকে জয়

চতুর্থ অধ্যায় -- ৪২

হযরত শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জেশকর (র.)'র সান্নিধ্যে হযরত নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.)

পঞ্চম অধ্যায় -- ৪৯

বাবা ফরিদের জামাত খানার (খানকাহ্) কর্মকান্ডের কিঞ্চিৎ বর্ণনা

ষষ্ঠ অধ্যায় -- ৫৫

ভারত বর্ষে চিশ্তীয়া ত্বরিকার কর্তধার হিসেবে শেখ সৈয়দ নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.):

সপ্তম অধ্যায় -- ৬৮

সামা মাহ্ফিল ও হযরত নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.)'র খানকাহ্

অষ্টম অধ্যায় -- ৭৮

শেখ নিজাম (র.)'র সর্বশেষ শারীরিক অসুস্থতা ও পরপারে পদার্পণ

নবম অধ্যায় -- ৮১

শেখ নিজাম (র.)'র নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা

দশম অধ্যায় -- ৮৯

শাসন কার্যে নিয়োজিত শাসক বা সুলতানগণ এবং রাষ্ট্র সম্পর্কে শেখ নিজাম (র.)'র মনোভাব

একাদশ অধ্যায় -- ১০৬

অমুসলিমদের সাথে শেখ নিজাম (র.)'র সম্পর্ক

দ্বাদশ অধ্যায় -- ১০৮

মানুষ হিসেবে শেখ নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.)

ত্রয়োদশ অধ্যায় -- ১১৫

সুফিসাধক হিসেবে শেখ নিজাম (র.)

চতুর্দশ অধ্যায় -- ১২৫

শেখ নিজাম (র.) ও তাঁর খলীফাবৃন্দ

পঞ্চদশ অধ্যায় -- ১৩৪

হযরত শেখ নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.)'র জীবন ও কর্মের সামগ্রিক মূল্যায়ন

তথ্যপঞ্জি -- ১৪৫

লেখকের কথা

আধ্যাত্মিকতার প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে সাধারণভাবে স্বচ্ছ ও সঠিক দৃষ্টি ভঙ্গীর অভাব প্রতীয়মান হয়। আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে দু'ধরণের মতামত পরিদৃষ্ট হয়। এক পক্ষ মনে করেন, শরীয়ত যথার্থভাবে পালন করা, ওজিফা পাঠ করা, মৌখিক বা কলবের যিকির (উচ্চ বা নিম্নস্বরে) করা প্রবৃত্তিই হচ্ছে আধ্যাত্মিকতা। এ মতের অনুসারীরা কাশফের উপর গুরুত্ব প্রদান করলেও মহানবী (দ.)'র বাতেনী এলেম সম্পর্কে স্বীকার করেন না। অন্যদিকে নিম্নস্বরে জিকির, আল্লাহ্ সম্পর্কে তত্ত্বজ্ঞান অর্জন, ধ্যান করা, এবং ইশ্কে ইলাহীর উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করাকে আধ্যাত্মিকতা বলে অপর পক্ষ অভিমত প্রকাশ করে থাকেন। বস্তুতঃ পক্ষে উভয় মতামতের সমন্বিত রূপই হচ্ছে আধ্যাত্মিকতার সত্যিকার পথ।

শরীয়ত যথাযথ পালন করার মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিকতার শুরু এবং পরবর্তীতে পীর প্রদত্ত ওজিফা পাঠ, জিকির-আজকার মোরাকাবা-মোশাহেদা এবং এলমে মারেফাত আয়ত্ত্ব করে খোদার নৈকট্য অর্জনের পথে অগ্রসর হওয়া হচ্ছে আধ্যাত্মিকতার মধ্যম ধাপ এবং খোদাকে পেয়ে খোদার রঙ্গে রঞ্জিত হয়ে নিজের অস্তিত্ব বিসর্জন দিয়ে খোদার অস্তিত্বে নিজেকে বিলীন করে দেয়া হচ্ছে আধ্যাত্মিকতার চূড়ান্ত ধাপ। ইলম বা জ্ঞান ছাড়া আধ্যাত্মিকতার পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। তাত্ত্বিক জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান (কাশ্ফ শক্তি) উভয়ই এ পথের আলোক বর্তিকা। এ উভয় প্রকার জ্ঞানকে আমলের মাধ্যমে বাস্তব রূপ দিয়ে মানব কল্যাণে, সৃষ্টির কল্যাণে নিজেকে করতে হবে চরম আত্মত্যাগ–শুধুমাত্র স্রষ্টার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে। এর জন্যে প্রয়োজন প্রেমের (ইশ্ক)। প্রেম ব্যতিত আল্লাহ্র দিদার লাভ সম্ভবপর নয়। ইসলামের এ ফানা ও বাকা তত্ত্বই ইসলামী মরমী দর্শন আধ্যাত্মিকতা তথা তাসাওউফকে বিশিষ্ট ও স্বকীয় মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। মহিমান্বিত মিরাজ শরীফ ও এর হেকমতি প্রতিফলন নামায প্রকৃত পক্ষে এই দুই তত্ত্বেরই প্রতীক ও প্রতিবিম্ব। এ প্রসঙ্গে এটা বলা প্রয়োজন যে, ওয়াহ্দাতুল অজুদ ও ওয়াহ্দাতুশ্ শহুদ – এ দু'মতের মধ্যে পার্থক্য মূলতঃ বাহ্যিক। প্রকৃত পক্ষে দুই মতই একই অনুভূতির (কাশ্ফ) দু'টি অত্যন্ত সূক্ষ্ম স্তর। এক-কে দর্শন করা ও এক অজুদ জানার মধ্যে যেমন পার্থক্য সামান্য, তেমনি এ দু'য়ের মধ্যেও পার্থক্য নাই বললেও চলে।

আজকের মুসলিম জগতে বস্তু ও মনের নিরপেক্ষ ও সাযুজ্যপূর্ণ মিলনের অভাব বড়ই প্রকট। সামগ্রিক মিলনের মাধ্যমে শান্তির বাস্তব নিশ্চয়তা বিধান ইসলামের প্রকৃত উদ্দেশ্য হলেও রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক তথা বস্তুগত প্রয়োজনের বাহ্যিক দিকের উপর মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব প্রদান ও তৎসজ্জাত মনোভাবকে আঁকড়ে ধরে থাকার ফলে জীবনের বিজ্ঞানসম্মত বাস্তবতা হচ্ছে প্রতিনিয়ত প্রায় উপেক্ষিত। ফলশ্রুতিতে প্রকৃত মুমিনের অভাব সারা বিশ্বে বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে।

ইসলামী জীবনধারণের পরিপূর্ণ ও সঠিক রূপ প্রতিষ্ঠা ও পুনরুজ্জীবন সম্ভব শুধু মাত্র বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীন উভয় দিকের সামঞ্জস্যপূর্ণ সুসমন্বয়ের মাধ্যমে। তাই দেহতত্ত্ব, মনস্তত্ব ও বাস্তব অভিজ্ঞতা ও আধ্যাত্মিক চিন্তা, চর্চা ও সাধনাকে ইসলাম উৎসাহিত করেছে। বলাবাহুল্য, ধর্মীয় এ সকল অনুভূতি ও বাস্তবমুখিতা একমাত্র সুফি সাধক তথা ওলী আল্লাহ্‌দের জীবনেই অধিকতর পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

ইসলাম জীবনঘনিষ্ঠ ও জীবনানুগ বিধান। জীবন থেকে পলায়নপরতা নয়, বরং জীবনেরই মধ্যেই খুঁজতে হবে আধ্যাত্মিকতার যথার্থ উর্বর ক্ষেত্র। এ সত্যকে সামনে রেখে যদি আজকের সুফি-সাধক, ওলী-বুজুর্গ সুফিভক্ত, মুরীদ শিষ্য, পীর-মাশায়েখগণ সযত্ন প্রয়াসে সম্মুখে অগ্রসর হন, তাহলে তাঁরা আধ্যাত্মিকতার চরম উৎকর্ষ সাধনে শ্রেষ্ঠত্ব ও পূর্ণত্বের অবদান রেখে যেতে পারবেন এবং একমাত্র তাঁরাই পারবেন অনীহা, অবিশ্বাস, হতাশাগ্রস্ত, বস্তুনির্ভর, সমস্যাসঙ্কুল নগর কেন্দ্রিক তথাকথিত সভ্য সমাজে ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে নবতর কাঙ্ক্ষিত মিলন ঘটাতে।

উপর্যুক্ত প্রেক্ষাপটে পীর-ভক্ত, ওলীভক্ত, সুফি ভক্ত সমস্যাজর্জরিত মানবতার সঠিক মুক্তির জন্য ওলী আল্লাহ্‌দের জীবনকে একটি মডেল হিসেবে অনুসরণের অভিপ্রায়ে এবং তাদের মাঝে আধ্যাত্মিকতার সত্যিকার বিকাশের লক্ষ্যে ওলী-আল্লাহ্‌দের জীবন সাধনাকে আধ্যাত্মিকতার নিরীখে মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণ করা একান্ত জরুরী।

আল্লাহ্‌র ওলীগণের জীবন ইতিহাস শুনা ও জানার জন্য প্রত্যেক মুমিন মুসলমান সতত উদ্‌গ্রীব। কারণ আল্লাহ্‌র ওলীগণ হলেন নায়েবে রসূল বা ওয়ারেছাতুল আম্বিয়া। হযরত রসূলে করিম (দ.)'র পরে আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রতিষ্ঠায় অবদান রেখে চলেছেন আল্লাহ্‌র ওলীগণ। আল্লাহ্‌র ওলীদের অনুসরণ করলে সত্যিকারের দ্বীনের সন্ধান পাওয়া যায়, খোদার নৈকট্য লাভ হয়। আমাদের উপমহাদেশে অনেক প্রখ্যাত ওলী জন্ম গ্রহণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে হযরত শেখ নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.) অন্যতম। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, আমাদের দেশে "ডাকাত থেকে ওলী" হয়েছেন বলে যে জনশ্রুতি আছে ইনি সেই নিজাম উদ্দিন নন। সেই নিজাম উদ্দিনের পরিচতি খুবই

সীমিত। আধ্যাত্মিকতা ও বাস্তবতার অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে তাঁর জীবনাচরণে। তাঁর জীবনকে মাইজভাণ্ডারী দর্শনের একটি অন্যতম প্রয়োগিক মডেল বললে অত্যুক্তি হবেনা। আমরা যারা মাইজভাণ্ডারী দর্শনকে মনে প্রাণে লালন করি তাঁদের জন্য হযরত নিজাম উদ্দিন (র.)'র জীবন থেকে শিক্ষার অনেক কিছু আছে। জীবনের এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র নেই, যেখানে তিনি বিচরণ করেননি। তাঁর বাণী বচন, চাল-চলন, কথন-বলন, ব্যবহার-শিষ্টাচার, ত্যাগ তিতিক্ষা, প্রেম-ভালবাসা, মানবতা, স্রষ্টার প্রতি অনুরাগ, পীরে ভক্তি, মুরীদ-শিষ্যের প্রতি আচরণ, সাধনা প্রত্যেক কিছুই আমাদের মত সকল ত্বরিকত পন্থীদের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। তিনি সামা মাহফিলের প্রতি বিশেষভাবে অনুরক্ত ছিলেন। তাঁর দরবারে হিন্দু-মুসলিম, বৌদ্ধ-খ্রিস্টান এরূপ কোন ভেদাভেদ ছিলনা। ক্ষমতার লোভ, সম্পদের লোভ তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। তিনি বলতেন, "খোদার নৈকট্য পেতে হলে রাজনীতি ও শাসন ক্ষমতা থেকে দূরে থাকতে হবে। কারণ রাজনীতি ও ক্ষমতা মানুষকে দুর্নীতি ও অন্যায়ের পথে পরিচালিত করে।"

মাইজভাণ্ডারী দর্শনের অনুসারীদের সাথে তাঁর জীবনের যথেষ্ট মিল খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁর জীবন সাধনাকে আধ্যাত্মিকতার আলোকে বিশ্লেষণ করলে সকল ত্বরিকতপন্থী ভাই-বোন, পীর-মুরিদ উপকৃত হবেন– এ বিশ্বাস থেকে তাঁর জীবন-সাধনাকে নুতন আঙ্গিকে উপস্থাপন করার মানসে এ গ্রন্থটি লেখার কাজে হাত দিয়েছি। উল্লেখ্য যে, এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকায় যে সকল ওলী-বুজুর্গদের নিয়ে সবচেয়ে বেশী গবেষণা, লেখালেখি ও প্রকাশনা হয়েছে তাঁদের মধ্যে হযরত শেখ নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (রা.)'র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থটি লেখার জন্য দেশে-বিদেশে ইংরেজীতে প্রকাশিত তাঁর বহু জীবনী গ্রন্থ, জার্নাল ও প্রবন্ধের সাহায্য নিয়েছি। তবে সবচেয়ে বেশী নির্ভর করেছি Oxford University Press, New Dellhi, India থেকে ২০০৭ সালে প্রকাশিত ও Khaliq Ahmad Nizami কর্তৃক রচিত "The Life and Times of Shaikh Nizam-Ud-Din Auliya" শীর্ষক গ্রন্থটির উপর। যাঁদের লেখা অবলম্বনে বর্তমান গ্রন্থটি লিখিত হয়েছে আমি তাঁদের সকলের নিকট ঋণী হয়ে থাকলাম। এটি আমার কোন মৌলিক গ্রন্থ নয়; সংকলন গ্রন্থ বলা চলে। তবে বেশীর ভাগ হুবহু অনুবাদ করা হয়নি; মর্মার্থ গ্রহণ করা হয়েছে। বিভিন্ন বইতে প্রদত্ত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণগুলোর আলোকে প্রতিটি অধ্যায়ে বর্ণিত প্রাসঙ্গিক ঘটনা সম্পর্কে আধ্যাত্মিক তাৎপর্য তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। গ্রন্থটি পাঠে সর্বস্তরের পাঠকের আত্মিক পরিশুদ্ধি অর্জিত হলে এবং আধ্যাত্মিকতা তথা তাসাওউফের স্বরূপ সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাওয়া গেলে আমার শ্রম সার্থক মনে করব।

শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) ট্রাস্ট'র গবেষণা ও প্রকাশনা পর্ষদ প্রকাশনার জন্য গ্রহণ করে এবং আলোকধারা বুক্‌স গ্রন্থটি পুনঃপ্রকাশ করে আমাকে ধন্য করেছে। এজন্য আমি পর্ষদের কাছে কৃতজ্ঞ। শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) ট্রাস্ট এর সম্মানিত সভাপতি আলহাজ্ব সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান (ম.জি.আ.) উপর্যুক্ত পর্ষদগুলো প্রতিষ্ঠা করে আধ্যাত্মিক বিষয়ে গবেষণা ও প্রকাশনার সুযোগ করে দিয়েছেন। এজন্য তাঁর মহান অবদানকে কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। বিশিষ্ট মাইজভাণ্ডারী গবেষক ও ফিনল্যান্ডের ফিনিশ একাডেমীর রিসার্চ ফেলো ড. সেলিম জাহাঙ্গীর গ্রন্থটির একটি অনবদ্য মুখবন্ধ (Foreword) লিখে দিয়েছেন তাঁর শত ব্যস্ততার মাঝেও। তাঁর প্রতি রইল আমার আন্তরিক ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা। বিশিষ্ট গবেষক, ইসলামী চিন্তাবিদ ও ঐতিহাসিক জনাব এ এন এম এ মোমিন, বিশিষ্ট লেখক জনাব ওহীদুল আলম, মাওলানা শায়েস্তা খান আজহারী, ড. এনায়েতুর রহমান, এ গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য উৎসাহ যুগিয়েছেন। ট্রাস্ট এর গবেষণা ও প্রকাশনা পরিষদের সুযোগ্য প্রাক্তন সভাপতি, বিশিষ্ট লেখক, গবেষক, ও সাংবাদিক জনাব মাহবুব উল আলম গ্রন্থটি প্রকাশের ক্ষেত্রে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছেন। তাঁর প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ থাকলাম। গ্রন্থটি প্রথম মুদ্রণের সাথে জড়িত জনাব রোকনুজ্জামান টুটুল, মঈনুদ্দীন মুহাম্মদ মামুনুর রশীদ, সৈয়দ আবু আহমদ, আশরাফ, মেজবাহ সহ ট্রাস্ট ও একাডেমীর সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদের সহযোগিতা ভুলবার নয়। যিনি প্রচ্ছদ করেছেন, যে প্রেসে বইটি ছাপা হয়েছে তাদের অবদানও অনস্বীকার্য। পরিশেষে বইটিতে শত সতর্কতা সত্ত্বেও মুদ্রণ জনিত ভুল-ত্রুটি থাকা অসম্ভব নয়। ভুলত্রুটি গুলোকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাই। গ্রন্থটির গুণগত উন্নয়নের জন্য যে কোন বিজ্ঞ পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

তাং ১৯ অক্টোবর, ২০১৮ ইং
চট্টগ্রাম।

নিবেদক
ড. মু. আব্দুল মান্নান চৌধুরী

মুখবন্ধ

'তাকওয়া' শব্দটি তাসাওউফ জগতের এক অনন্য অপরিহার্য অনুষঙ্গ হিসেবে আধ্যাত্মিক সাধকদের জীবনে উপস্থিত। স্রষ্টা ও সৃষ্টির হেকমতি চিরায়ত রহস্যের প্রবাহমান ধারায় যার বর্ণনা ও রেশ কখনো হয়না শেষ। পবিত্র কুরআনের একাধিক সূরায় মহান রাব্বুল আলামিন এ তাকওয়া বিষয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত করেছেন বিভিন্নভাবে। সূরা নমল, বনি ইসরাঈল, হুদ, জুমার, শুরা, নাহল, ইব্রাহিম, মূলক, আনফাল, আল ই ইমরান, আহজাব, মুজাদালা, তাগাবুন, মায়িদা ও সুরা তওবা সহ ন্যূনতম ১৫টি সূরায় তাকওয়া বা আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরতার প্রসঙ্গটি উল্লিখিত হয়েছে। পবিত্র কুরআনের সর্বমোট ১১৪টি সূরার মধ্যে ন্যূনতম ১৫টি সূরায় তাকওয়া বিষয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বর্ণনা সত্যিই প্রণিধানযোগ্য। এর মধ্যে সূরা আনফাল, আল ই ইমরান, আহজাব ও সূরা মুজাদালায় তাকওয়ার চুম্বকসার সারাংশ ফুটে উঠেছে বহুলাংশে। যেমন:

(ক) হে নবী! তোমার জন্য এবং তোমার অনুসারী বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। (আনফাল: ৬৪)

(খ) ... আর তুমি কোন সংকল্প করলে আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করবে। আল্লাহ্ নির্ভরশীলদের ভালোবাসেন। (আল ই ইমরান: ১৫৯)

(গ) তুমি আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর কর। কর্ম বিধানে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। (আহজাব: ৩)

(ঘ) বিশ্বাসীদের কর্তব্য আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করা। (মুজাদালা: ১০)

পবিত্র কুরআন মজিদের পাশাপাশি তাকওয়ার বিষয়টি গুরুত্বসহকারে উঠে এসেছে বিভিন্ন হাদিসেও। এর মধ্যে ইবনে মাজাহ ও তিরমিজী শরীফে উল্লিখিত একটি হাদিসে বিষয়টির তাৎপর্য প্রতিনিধিত্বমূলকভাবে বহুলাংশে পরিস্ফুটিত। হযরত আবু যর গিফারী (রা.) থেকে বর্ণিত, হুজুরে করিম (দ.) ইরশাদ করেছেন, "কুরআনুল করিমের এরূপ একটি আয়াত আমি জানি; মানুষ যেটার উপর আমল করলে সেটাই তাদের জন্য যথেষ্ট হতো। এ আয়াতটি হলো: "যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভয় করে চলে, তিনি তার মুক্তির ব্যবস্থা করে দেন এবং তাকে এমন স্থান থেকে জীবিকার ব্যবস্থা করে দেন, যা সে কল্পনাও করতে পারে না।" (হাদিস নং ৫০৭৫)

প্রফেসর ড. মুহম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী তাঁর এ গবেষণামূলক গ্রন্থে তাকওয়ার আলোকে শেখ নিজাম উদ্দিন আওলিয়ার জীবন-কর্ম ও মর্মের যে তাত্ত্বিক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট,

পারিবারিক মানস গঠন, সর্বোপরি তাঁর নিজের জীবনে ফল্গুধারার মতো এর নান্দনিক মাধুর্যপূর্ণ প্রতিফলনের তত্ত্ব ও তথ্যভিত্তিক যে যৌক্তিক ও যোগসূত্রিক বর্ননা উপস্থাপন করেছেন, গাঁথুনীর মুন্সিয়ানার গুণে তা সাধারণ থেকে অসাধারণ যে কোন শ্রেণীর মননশীল পাঠককে আকর্ষণ করবে অতি সহজেই।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এ উপমহাদেশের ভূ-রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে শেখ নিজাম উদ্দিন আওলিয়ার পূর্বপুরুষসূত্রে ঘটনাচক্রে যে তাকওয়ার মনোজগতের সৃজনশীল বিকাশ ঘটেছিল, যা তাঁর মায়ের মাধ্যমে বিকশিত, সর্বোপরি পীরের সান্নিধ্যে পরিপূর্ণমাত্রায় পরিস্ফুটিত হয়ে উঠেছিল, সে তাকওয়া ছিল সতত তাঁর মাথার মুকুট, সারা জীবনের অলংকার স্বরূপ।

এখানে বিশেষভাবে স্মরণীয় তাঁর জীবন সায়াহ্নে তদীয় পীর শেখ ফরিদ (র.) তাঁর কাছে জানতে চেয়েছিলেন, আল্লাহ্‌র নিকট থেকে তিনি শেখ নিজামের জন্য কোন এরাদা পূরণের দোয়া করবেন? তাঁর উত্তর ছিল 'আমি যেন তাসাওউফের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারি।' বলাবাহুল্য, এও হলো 'তাকওয়ার' প্রলম্বিত প্রতিফলন মাত্র।

১৫ অধ্যায়ে বিভক্ত ১৫৮পৃষ্ঠার এ গ্রন্থে শেখ নিজাম উদ্দীন আওলিয়ার জীবন-কর্ম ও মর্মের যে শ্বাশ্বত বাণী, যে জীবনঘনিষ্ঠ বর্ণনা তুলে ধরেছেন সংক্ষেপে তাকে নিম্নোক্ত ২৪টি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন:

১. তাঁর পূর্ব পুরুষের জন্মস্থান রাশিয়ার ঐতিহাসিক বোখারা শহর ত্যাগ এবং উত্তর ভারতের বাদাউনে হিযরতের বর্ণনা।
২. উত্তর ভারতের বাদাউন ভূখণ্ডের বিশেষত্ব বর্ণনা।
৩. তদীয় পিতা-মাতার বিশেষত্ব।
৪. পীর শেখ ফরিদ উদ্দীন গঞ্জেশকরের সান্নিধ্যের বর্ণনা।
৫. তাঁর উপলব্ধিতে প্রকৃত আধ্যাত্মিক জীবনের সংজ্ঞা।
৬. মধ্যযুগের সুফিদের জীবনাচরণের 'স্বতন্ত্র সংস্কৃতি' গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান।
৭. ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চলে চিশ্‌তিয়া ত্বরিকার সৃজনশীল বিকাশে তাঁর ভূমিকা।
৮. তাঁর জীবনঘনিষ্ঠ খোতবার বিশেষত্ব।
৯. নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ।
১০. একান্ত মানবিক বিশেষত্ব।
১১. তাঁর জীবনদর্শনের বিশেষত্ব : সামা ও আধ্যাত্মিক আলোচনা।
১২. তাঁর দৃষ্টিতে সামার বিশেষত্ব।
১৩. তাঁর খানকাহ্‌ জীবনের বিশেষত্ব।
১৪. তাঁর খেলাফত প্রদানের বিশেষত্ব।
১৫. সঙ্গীতজ্ঞ আমির খসরুর জীবনে তাঁর প্রভাব।
১৬. তাঁর সম্পর্কে ড. আল্লামা ইকবাল ও আমির খসরুর মন্তব্য।

১৭. শাসক, শাসনকার্য, রাষ্ট্র সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি
১৮. সুলতানদের সাথে চিশ্‌তিয়া খান্দানের দ্বন্দ্বের চালচিত্র।
১৯. সুফিসাধনার ১০০ স্তর, ওলেমা ও দরবেশের পার্থক্য বর্ণনা।
২০. তাঁর ওফাত, দাফন, পীরের খেরকা প্রদান।
২১. সুফি সাধক হিসেবে তাঁর অনন্য বিশেষত্ব : ৩ ধারার সমন্বয়।
২২. কিরমানী পরিবারের সাথে তাঁর সম্পর্ক : তাঁর অনবদ্য জীবনী রচনার ঘটনা।
২৩. বিভিন্ন সিলসিলার অলীদের শ্রদ্ধা।
২৪. তাঁর জীবন কর্ম ও মর্মের সামগ্রিক মূল্যায়ন।

১. পূর্ব পুরুষের বর্ণনাঃ চেঙ্গিস খানের আক্রমনে শেখ নিজাম উদ্দীন আওলিয়ার পূর্ব পুরুষের আদি নিবাস, রাশিয়ার উজবেকিস্তানের ইসলামী ঐতিহ্যের 'বোখারা' নগরীর ধ্বংসের চিত্র লেখকের বর্ণনায় প্রায় দৃশ্য কাব্যের মতো ফুটে উঠেছে এভাবে–

মঙ্গোলীয়দের আক্রমনের কারণে তিনি এবং তাঁর পরিবারবর্গ তাঁদের পৈত্রিক ভূমি ছাড়তে বাধ্য হন। চেঙ্গিস খান জরফসান নদীর তীরে অবস্থিত বোখারার মতো একটি সমৃদ্ধশালী নগরীকে ধুলোয় মিশিয়ে দেন। ত্রিশ হাজারেরও অধিক মানুষকে ফাঁসি দেয়া হয় এবং অশীতিপর বৃদ্ধ লোকদেরকে ক্রীতদাস বানিয়ে রাখা হয়। ব্যক্তির পদমর্যাদাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে তাঁদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালানো হয়। ফলশ্রুতিতে জ্ঞান-বিজ্ঞান, চারুকলা, শিষ্টাচার প্রভৃতি ক্ষেত্রে সমৃদ্ধ বোখারা নগরীকে একটি মৃত্যুপুরীতে পরিণত করা হয়। কিন্তু স্বল্পসংখ্যক ভাগ্যবান ব্যক্তি এ ধ্বংসলীলা থেকে পালিয়ে আসতে সক্ষম হন। তাঁদেরই কয়েকজন হলেন শেখ নিজাম উদ্দীন আওলিয়া (র.) এর পিতা এবং পিতামহ। তাঁরা ভারতবর্ষে পালিয়ে এসে কপর্দকহীন 'মুহাজির' হয়ে উত্তর ভারতের বাদাউনে বসতি স্থাপন করেন"। (পৃ.২৫) [এতে খোদার প্রতি তাঁদের বিশ্বাসের মাত্রা বহুগুণে বেড়ে যায়।]

২. বাদাউনের বর্ণনাঃ 'বাদাউন' হল একটি শান্ত ও নিরিবিলি জায়গা, যেখানকার লোকজন রাজনৈতিক সংগ্রাম থেকে দূরত্বে থাকতে এবং একই সাথে কোন প্রকার সরকারী চাকুরী না নিয়ে রাজধানীর হৈ চৈ থেকেও দূরে থাকতে পছন্দ করত। (পৃ. ২৫) [বলাবাহুল্য, বাদাউনের এ বিশেষত্ব হিযরতকারীদের তাকওয়া ভিত্তিক জীবনাচরণের জন্য ছিল খুবই সহায়ক।]

৩. তদীয় পিতা-মাতার বিশেষত্বঃ এককালের 'বোখারা'র মান-মর্যাদায় শীর্ষে অবস্থানকারী হযরত শেখ নিজামের পূর্ব পুরুষ, বিশেষত পিতা মাতা এ চরম দুঃসময়েও পুত্র নিজামের সর্বোচ্চ 'উত্তম শিক্ষা' প্রদানে সচেষ্ট ছিলেন পরিপূর্ণমাত্রায়। পিতার অকাল মৃত্যুতে মায়ের কোলে লালিত শিশুর উত্তম শিক্ষার দায়িত্ব পালন করেছিলেন মূলতঃ মাতাই। এ অধ্যায় তাঁর মাতার একটি ছোট্ট আপ্ত বাক্য, এ পরিবারের 'তাকওয়ার' বিষয়টি ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হবে পাঠকের অন্তরে। প্রায়শঃ শিশু নিজাম উদ্দিন যখন ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে স্কুল থেকে ফিরতেন, তখন

তাঁর বিধবা মাতা বলতেন, 'আমরা আজ আল্লাহ্‌র মেহমান।" (পৃ. ৩৭) এর অর্থ হলো আজ ঘরে খাবার কিছুই নেই; ভরসা একমাত্র আল্লাহ্‌।

৪. পীরের সান্নিধ্যে: ছাত্রাবস্থায় রাজধানী দিল্লীতে গিয়ে প্রখ্যাত জ্ঞানী ব্যক্তিদের সান্নিধ্যের আশায় 'মা'কে নিয়ে একমাত্র আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে বাদাউন ত্যাগ করেন। এখানে পড়াশুনা সমাপ্তের পর সমকালীন সুপ্রসিদ্ধ আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব গঞ্জেশকর (র.) প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে তৎকালীন অজোধনে (বর্তমান: পাকপত্তন) গিয়ে নব্বই বছর বয়সী পীর শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জেশকর (র.) এর হাতে বায়াত গ্রহণ করেন (পৃ. ৪৪)। লক্ষনীয় বিষয় হলো সে সময়ে বায়াত গ্রহণকালে মুরিদের মাথার চুল ফেলে দেওয়ার রেওয়াজ ছিল, কিন্তু পীরের ইঙ্গিতে শেখ নিজামের আকর্ষণীয় কোকড়ানো লম্বা চুলসহ তাঁকে বায়াত করানো হয়। (পৃ. ৪৫) অতঃপর বাবা ফরিদ শেখ নিজামকে আধ্যাত্মিকতার শ্রেষ্ঠ মোকামে (স্তর) পৌঁছানোর জন্য তরিকার কিছু একান্ত মৌলিক নীতিমালা শিক্ষা দেন। ফলে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যে, মাত্র ২৩ বছর বয়সে তিনি বাবা ফরিদের প্রধান খলীফার পদে অভিষিক্ত হন। (পৃ. ৪৬) শুধু তাই নয়, বাবা ফরিদ তাঁর আধ্যাত্মিক রাজমুকুট সম জায়নামায, আলখেল্লা, আশা (লাঠি)ও তাঁকে দান করেন। শেখ নিজাম উদ্দীনের আধ্যাত্মিক সাধনা; সর্বোপরি পীরের প্রতি তুঙ্গীয় ভক্তি শ্রদ্ধায় প্রীত হয়ে তদীয় পীর তাঁকে স্বীয় পুত্র হিসেবেও বরণ করে নিয়েছিলেন সগৌরবে। (পৃ.৫৪) বলাবাহুল্য, শেখ নিজাম উদ্দীনের ওফাতের পর পীর প্রদত্ত খিরকা দিয়ে তাঁর সমগ্র দেহ মোবারক এবং জায়নামায দ্বারা মাথা মোবারক আবৃত করেই তাঁকে দাফন করা হয়। (পৃ. ৮০)

৫. তাঁর উপলব্ধিতে প্রকৃত আধ্যাত্মিক জীবনের সংজ্ঞা: সুফি সাধনায় সমকালীন সমাজ জীবনের সাথে পারস্পরিক সম্পর্কের উপলব্ধির বর্ণনাটি লিপি করা হয়েছে এভাবে– "অতীতে কত পণ্ডিত ও বিদ্বান ব্যক্তি, মণীষী তাঁদের সাফল্যের উচ্চ শিখরে আরোহন করেছিলেন, অথচ কেউ কি মনে রেখেছে তাঁরা কে ছিলেন? এবং কোথায় তাঁরা বাস করতেন। যেটা স্থায়ী হয় সেটা হল জনগণের সাথে সুখে শান্তিতে বাস করার স্মৃতি। প্রকৃত আধ্যাত্মিক জীবন হচ্ছে এটাই।" (পৃ. ২৪) শেখ নিজাম উদ্দীন আওলিয়ার আজীবনের সাধনা মিশ্রিত সংগ্রাম ছিল মানুষকে আল্লাহ্‌কে পাওয়ার রাস্তা দেখিয়ে দেয়া এবং একই সাথে মানবতার কল্যাণে নিবেদিত হতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার সংগ্রাম (পৃ. ২৪) তিনি তাঁর শিষ্যদের বলতেন, গরীব এবং নিঃস্ব লোকদের যত্ন নেয়া ধর্মের আনুষ্ঠানিকতা পালনের চেয়ে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। (পৃ. ২৪) তিনি আরো বলতেন, "যদিও বালুকণার মতো আল্লাহ্‌কে পাওয়ার বহু রাস্তা রয়েছে, কিন্তু মানুষের অন্তরে সুখ আনাটাই হচ্ছে সর্বাধিক ফলপ্রসু ও কার্যকরী পথ। যে কেউ আল্লাহ্‌কে পেতে চায়, তাকে অবশ্যই আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকে সেবা করার মাধ্যমেই আল্লাহ্‌র কৃপা দৃষ্টি লাভ করতে হবে। (পৃ. ২৪) তিনি কেবলমাত্র দর্শনার্থীর দুঃখ দুর্দশা লাঘবেই সাহায্য করতেন না, তিনি তাঁর মধ্যে আত্মবিশ্বাস এবং শৃঙ্খলাবোধ জাগিয়ে তোলার জন্যও প্রচেষ্টা চালাতেন। ফলে তাদের মধ্যে জীবনের মর্যাদা ও নৈতিক মূল্যবোধও বৃদ্ধি পেত। (পৃ. ২৫)

৬. মধ্যযুগীয় সুফিদের জীবনধারা পুনঃনির্মাণে তাঁর অবদানঃ ঐ সময়কালে এ কাজটা অত সহজসাধ্য ছিলনা। কারণ বাস্তবতা ও কল্পনা, সত্য ও অসত্য এতবেশী মিশ্রিত হয়ে গিয়েছিল যে, সুফিদের জীবনধারাকে প্রকৃত সত্যের দিকে নিয়ে যাবার জন্য কঠোর আত্ম সমালোচনা ও দৃঢ় নীতিমালা প্রয়োগের প্রয়োজন ছিল। শেখ নিজাম উদ্দীন আওলিয়া যুগপৎ আত্ম সমালোচনার ধারা এবং দৃঢ় নীতিমালা প্রণয়নের সৃজনশীল একটা নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেন। (পৃ. ২৮)

৭. চিশ্‌তিয়া ত্বরিকার সৃজনশীল বিকাশে তাঁর ভূমিকাঃ পীর কর্তৃক মাত্র ২৩ বৎসর বয়সে হযরত শেখ নিজাম উদ্দীন আওলিয়া (র.) কে উত্তরাধিকার খলীফা নিয়োগ করে দিল্লীতে বসতি স্থাপন করে সেখান থেকে সিলসিলাহ্ বিকাশের কাজে আত্মনিয়োগের নির্দেশটি ছিল ঐ সময়ের প্রেক্ষাপটে একটা বিরাট চ্যালেঞ্জের বিষয়। কেননা, রাজধানী দিল্লী থেকে দূর দূরান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা চিশ্‌তিয়া ত্বরিকার অনুসারীদের একসূত্রে গ্রথিত করা ছিল প্রায় দুরুহ। বলাবাহুল্য, তিনি পীরের এ সুমহান দায়িত্ব মাথা পেতে নিয়ে সে দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করেছিলেন মর্যাদাপূর্ণ ও দৃষ্টিগ্রাহ্যভাবে। এ ক্ষেত্রে সঙ্গীতজ্ঞ আমির খসরুর মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্যঃ "হযরত নিজাম উদ্দিন (র.) বাবা ফরিদ (র.)'র জপমালা (তসবিহ) সংগ্রহ করে এক সুতোয় গেঁথেছেন। সে জন্যই তাঁর নাম হয়েছে নিজাম (মুক্তার মালা)।" তাঁর বিরামহীন চেষ্টার ফলে সমগ্র ভারতের আনাচে-কানাচে চিশ্‌তিয়া খানকাহ্ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মোহাম্মদ ঘোথী সত্তারীর বর্ণনা মতে, "ত্বরিকার বিকাশের প্রয়োজনে শেখ নিজাম উদ্দিন (র.) প্রায় সাতশত সিনিয়র সদস্যকে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন।" তিনি একইসাথে ত্বরিকার অনুসারীদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য পরিকল্পিতভাবে ব্যাপক কর্মসূচী ও উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। উচ্চমার্গীয়দের নৈতিকতার শুদ্ধতার বিষয় অক্ষুণ্ন রেখে তিনি একইসাথে বায়াত প্রদানের বিষয়টি আম জনতার জন্যও অবারিত করে দিয়েছিলেন। (পৃ. ৫৫)

৮. তাঁর খুত্‌বার বিশেষত্বঃ তিনি প্রায়শঃ আরবিতে একটি খুত্‌বা পাঠ করতেন, যা ভারতের বিভিন্ন মসজিদে জুমার খুত্‌বা হিসেবেও পাঠ করা হতো। লেখার নিপূনতা ও মুন্সিয়ানা, বর্ণনায় ওজস্বিতা, বিষয়বস্তু, সর্বোপরি এশক মহব্বতের খুশবোর গুণে এটি ছিল এক অনন্য-অসাধারণ খুত্‌বা। (পৃ. ২৮)

৯. নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার পারস্পরিক সম্পর্কঃ স্রষ্টার সহায়তায় ইনসানকে ইনসানে কামিলে উন্নীত করে পূর্ণতা দানই হচ্ছে একজন যথার্থ সুফি সাধকের চিরন্তন সাধনা। এ লক্ষ্যে শেখ নিজাম (র.) এর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা যে তিনটি মৌলিক আদর্শকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়েছিল সেগুলো ছিল নিম্নরূপঃ

(ক) বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রভুর প্রতি আনুগত্যের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক তাৎপর্য সম্পর্কে শিক্ষা দেয়া।

(খ) দুনিয়ার সীমাহীন দুর্দশাপন্ন ও সংগ্রামী জীবনের মাঝে মানব অন্তরে শান্তি আনায়ন করা।

(গ) পাপ-কাজ হ্রাস করা এবং নৈতিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার মানসিকতা সৃষ্টি করা। (পৃ. ৮১)

তিনি গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন যে, দুঃখী ও নিঃস্ব, নিপীড়িত, বঞ্চিত ও লাঞ্ছিত মানুষের অন্তরে শান্তি দেয়া, তাদের দুঃখ লাঘবের চেষ্টা করা ও বিপদে-আপদে সাহায্য করা আধ্যাত্মিক সাধনা, নামায-কালাম, মোরাকাবা-মোশাহেদা প্রভৃতি ইবাদতের চাইতে আল্লাহ্‌র কাছে অনেক বেশী মূল্যবান। (পৃ. ৮১) বলাবাহুল্য, এগুলো একজন সুফিসাধকের কর্তব্য বহির্ভূত বিষয়ও নয়। (পৃ. ৮১) শেখ নিজাম বলতেন, আল্লাহ্‌র প্রতি একাগ্রতা দু' প্রকার:

(ক) লাজমী (অকর্মক) এবং (খ) 'মুতাআদ্দী (সকর্মক)

(ক) 'লাজমীর' মধ্যে আছে নামায, রোজা, হজ্ব, তসবিহ-তাহলিল ইত্যাদি। এবং এর উপকার কেবলমাত্র স্রষ্টানুরাগীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

(খ) 'মুতাআদ্দীর' মধ্যে রয়েছে দান-সদকা, দয়া-দাক্ষিন্য, দুঃখী মানুষের সেবা। এটার উপকার ও আনন্দ অন্যান্যদের মধ্যে সঞ্চালিত হয় এবং এর পুরস্কার সীমাহীন। ধর্মের এ 'বৈপ্লবিক দর্শন' শেখ নিজাম উদ্দীন আওলিয়ার ত্বরিকার চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে এবং এহেন মানবিক কর্মকাণ্ডের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তদীয় শিষ্যদের মাঝেও আকর্ষণীয় হয়ে উঠে। (পৃ. ৮২)

তিনি বলতেন, দুনিয়াকে বিসর্জন দেয়ার অর্থ এ নয় যে, একজন ব্যক্তি তার সকল কাপড় চোপড় খুলে ফেলবে, খাদি কাপড় পরবে এবং অলসভাবে বসে থাকবে। বরঞ্চ দুনিয়াকে পরিত্যাগের অর্থ হল ভাল পরবে এবং খাবার খাবে, না চাইলেও যদি তার কাছে কোন জিনিষ আসে তা গ্রহণ করবে, কিন্তু মওজুদ করবেনা। সে কোন জিনিষের প্রতি লোভ করবেনা কিংবা কোন জিনিষের প্রতি মোহাবিষ্ট হয়ে স্রষ্টাকে ভুলে যাবেনা। কেবলমাত্র এটাই হচ্ছে দুনিয়াকে বিসর্জন। (পৃ. ৮৪)

১০. একান্ত মানবিক বিশেষত্ব: একদা শেখ নিজাম (র.) যমুনা নদীর তীরে হাঁটছিলেন। তিনি দেখলেন, একটি কূপ থেকে একজন মহিলা পানি তুলছে। তিনি মহিলাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'পাশে যমুনা নদী' থেকে পানি না নিয়ে সে কূপ থেকে কেন পানি নিচ্ছে?' মহিলা উত্তর দিল, আমি ও আমার স্বামী খুবই দরিদ্র। যমুনা নদীর পানি মানুষের ক্ষুধা বাড়ায়। সে জন্য আমি কূপের পানি নিচ্ছি। মহিলার কথা শুনে শেখ নিজাম (র.) বিমোহিত হয়ে গেলেন। তিনি তাঁর খাদেম ইকবালকে ডেকে বললেন, "আমাদের গিয়াসপুরে একজন মহিলা আছে, যে কখনো ক্ষুধার ভয়ে যমুনা নদী থেকে পানি নেয়না। যাও, এ মহিলাকে জিজ্ঞাসা কর তার দৈনন্দিন খরচের জন্য কত টাকা প্রয়োজন? প্রত্যেক মাসে মহিলার জন্য কোন প্রকার অবহেলা ছাড়া ঐ পরিমাণ টাকা নিয়মিত পাঠিয়ে দেবে।" (পৃ. ৭৬)

১১. তাঁর জীবনদর্শনের বিশেষত্ব: সামা ও আধ্যাত্মিক আলোচনা: হযরত শেখ নিজাম (র.) প্রায়শ: বলতেন, "আমি দুটো কাজে আনন্দ পাই। এক. যখন আমি সামা মাহফিলে যোগদান

করি এবং দুই. যখন কেউ আমার সাথে দেখা করতে এসে আধ্যাত্মিক বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করে।” (পৃ. ৭২)

শেখ নিজাম (র.) এর পবিত্র চেহারা মোবারক ও চাহনির মধ্যে একটা ধ্যানমগ্ন আবেশ লক্ষ্য করা যেত। তিনি সারাক্ষণ নফল নামায এবং কুরআন তিলওয়াত করতেন না, একটা নির্ধারিত সময়ে করতেন। একবার এক দর্শনার্থী সাহস করে জিজ্ঞাসা করে বসলেন, “আপনি প্রতিদিন কতটুকু কুরআন পড়েন? তিনি উত্তর দিলেন, “এক পারা।” শিষ্য আমির খসরুর বর্ণনায়, “তিনি [শেখ নিজাম (র.)] প্রত্যেকদিন এশার নামাযের পর দরুদ শরিফ পড়তেন এক হাজার বার এবং সূরা ফাতেহা পড়তেন এক হাজার বার। প্রত্যেক দিন ইমাম গাজ্জালী প্রণীত ‘জাওয়াহিরুল কুরআন’ এবং ‘হিরজ-ই ঈয়ামানী’ ও ‘হিরজ-ই ক্বাফি’ কিতাব থেকে কিছু অংশ তিলওয়াত করতেন।” (পৃ. ৭৫)

১২. তাঁর দৃষ্টিতে সামা’র বিশেষত্ব: আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে শেখ নিজাম (র.) সামার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। শিষ্যদের ভক্তি-আপ্লুত চিত্তে গাওয়া মরমী (কাওয়ালী) সঙ্গীতের তালে তালে, পেশাদার বাদক দলের বাদ্যযন্ত্রের মূহুর্মূহু ধ্বনিতে খানকাহ্ মুখরিত থাকত। শুধু তাই নয়; কারা কারা সামা মাহফিলে অংশ গ্রহণ করবে, কোন বাদ্যযন্ত্র বাজাবে এবং কখন মাহফিল অনুষ্ঠিত হবে এতদ্‌বিষয়েও তিনি কড়া নিয়ম আরোপ করতেন। (পৃ. ৬৮)

তিনি কোন কোন সময় শেখ সাদী (র.) রচিত ফার্সী গজল শুনে ভাবাবেগে এতবেশী আপ্লুত হতেন যে, ধ্যানমগ্ন অবস্থায় সারাদিন উচ্ছ্বসিত ও উল্লসিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন ছন্দোময় নৃত্যের ভঙ্গিতে। (পৃ. ৬৮) একদা সামা মাহফিলে এতবেশী তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন যে, তিনি জামাত খানার ছাদ থেকে নীচে পড়ে গিয়ে পায়ের হাড় ভেঙ্গে ফেলেন, যে কারণে প্রায় খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাটতেন। (পৃ. ৭৫) একদা তাঁর আধ্যাত্মিক গুরু শেখ ফরিদ (র.) শেখ নিজাম (র.)কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, “আল্লাহ্‌র নিকট থেকে তোমার কোন্ ‘এরাদা’ পুরনের জন্য আমি প্রার্থনা (দোয়া) করব?” তিনি বলেছিলেন, “আমি যেন তাসাওউফের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারি।” অবশ্য পরবর্তীতে তিনি দুঃখভরে অনুশোচনা করে বলেছিলেন, “আমি যেন ‘সামা’ বা আধ্যাত্মিক সঙ্গীত শুনতে শুনতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে পারি, সে জন্য দোয়া করার নিমিত্তে কেন আমি আমার দীক্ষাগুরু শেখ ফরিদ (র.)কে বললাম না! (পৃ. ৮০)

১৩. তাঁর খানকাহ্ জীবনের বিশেষত্ব: আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে হেদায়ত এবং প্রাগ্রসর জনদের ইনসান থেকে ইনসানে কামিলে উন্নীত করার ক্ষেত্রে অহোরাত্র কর্ম সাধনার মধ্যে থাকতে গিয়ে চারিত্রিক বিশেষত্বের দিক থেকে তাঁরা খুবই মানবিক এবং দয়ালু চরিত্রের অধিকারী হয়ে থাকেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে খানকার কাজ পরিচালনায় তাঁদের আধ্যাত্মিক দায়িত্ব পালনের প্রশ্নে তাঁরা কঠোর-কঠিনও হতেন

প্রয়োজনে। কোমল ও কঠোরের এই দ্বৈত চারিত্রিক বিশেষত্বের বহিঃপ্রকাশ তাঁর মধ্যে দৃষ্টিগ্রাহ্যভাবেই লক্ষ্য করা যেত।

হযরত শেখ নিজাম উদ্দীন আওলিয়ার খানকাহ্‌র অবস্থান ছিল মুক্ত ও স্নিগ্ধ বাতাসে ভরপুর যমুনা নদীর তীরে। মোগল বাদশা হুমায়ুনের কবরের পাশে এ খানকাহ্‌র ভগ্নাবশেষ আজও বিদ্যমান। (পৃ. ৫৭) খানকাহ্‌র সকল কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি কঠোর নিয়ম মেনে চলতেন। শত ব্যস্ততার মাঝেও তিনি ছাদের উপর থেকে খানকাহ্‌র তদারকি করতে ভুলতেন না। এ ক্ষেত্রে তাঁর কথাই ছিল আইন, এবং এ আইন থেকে বিচ্যুতি ছিল অকল্পনীয়। (পৃ. ৫৮) তাঁর খানকাহ্‌য় রাজা ও ভিক্ষুকের মধ্যে কোন তফাৎ ছিলনা। দর্শনার্থীদের সাথে নরম ও ভদ্র ব্যবহার করার জন্য তিনি খানকার লোকদের নির্দেশ দিতেন। পবিত্র ঈদুল আজহার পরবর্তী তিনদিন খানকাতে প্রচুর দর্শনার্থীর সমাগম হত। বৈষম্যহীন আচরণে বিরামহীনভাবে দর্শনার্থীদের খাবার পরিবেশন করা হতো। (পৃ. ৫৮) এ খানকাহ্‌ই ছিল আধ্যাত্মিক সাধনার প্রাণকেন্দ্র। তিনি খানকাহ্‌তে শিষ্যদের সাধনার স্তর অনুযায়ী বিভিন্ন ছোট ছোট দলে তাদেরকে বিভক্ত করে প্রতিটি দলের জন্য একজন প্রশিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেয়ার দায়িত্ব দিতেন। প্রাথমিক স্তরের শিষ্যদের জন্য অপেক্ষাকৃত কম অভিজ্ঞতা সম্পন্ন, মাধ্যমিক স্তরের জন্য আর একটু বেশী অভিজ্ঞ এবং উচ্চ স্তরের জন্য বেশ সিনিয়র প্রশিক্ষকদেরকে প্রশিক্ষণ বা তালিম দেয়ার দায়িত্ব দিতেন। ফলে প্রশিক্ষণার্থীরা একটা বিধিবদ্ধ শৃঙ্খলের আওতায় তাদের ব্যক্তিগত জীবন, সামাজিক জীবন, সর্বোপরি ধর্মীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে পেত এবং স্রষ্টার নৈকট্য লাভের সুযোগ লাভ করত। এককথায়, তাঁর পবিত্র খানকাহ্‌ ছিল আধ্যাত্মিক সাধনা ও ত্বরিকত চর্চার এক অনুপম প্রাণ কেন্দ্র। (পৃ. ৪২)

১৪. তাঁর খেলাফত প্রদানের বিশেষত্বঃ খানকাহ্‌ পরিচালনার ন্যায় খেলাফত প্রদান তথা আধ্যাত্মিক প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রেও শেখ নিজাম (র.) ছিলেন খুবই সতর্ক এবং কঠোর-কঠিন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য তাঁর সময়কালটা ছিল শাসক-শাসনকার্য এবং রাজনৈতিক যুগ সন্ধিক্ষনের এক মহাসংকটকাল। গভীর সম্পর্ক এবং চরম বৈরীতা এ দুইয়ের দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার (Interaction) কারণে তাঁর খেলাফত প্রদানের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রযন্ত্রের সাথে সম্পর্ক বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে বিভিন্নভাবে।

তিনি তাঁর সিনিয়র শিষ্যদের যে খেলাফত নামা দিতেন তাতে লিখা থাকত– “তুমি রাজ দরবারে যাবেনা এবং রাজা-বাদশাহ্‌দের কাছ থেকে কোন উপহার-উপঢৌকন কিংবা পুরষ্কার নেবে না। (পৃ. ৯০) বলাবাহুল্য, নির্বাচিত হওয়ার পর কোন খলীফার মধ্যে এ প্রশ্নে কোন বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে তিনি তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থাও গ্রহণ করতেন সাথে সাথে। (পৃ. ৯০) আওয়াধের অধিবাসী কাজী মহিউদ্দীন কাসানীকে শেখ নিজাম (র.) যে খেলাফত নামা প্রদান করেছিলেন তাতে লেখা ছিল– “দুনিয়া এবং দুনিয়ার যশ-সম্মানকে পরিত্যাগ কর এবং আল্লাহ্‌র রাস্তা ধর। দুনিয়ার দিকে এবং পার্থিব দুনিয়ার জন্য পাগল মানুষের দিকে মনোযোগ দিওনা। জায়গীরদারী কিংবা রাজার দান গ্রহণ করো না। যদি মুসাফির তোমার কাছে আসে

এবং তাদেরকে দেওয়ার মতো তোমার যদি কিছু না থাকে, তবে সেটাকে আল্লাহ্‌র আশীর্বাদ মনে করো। তুমি যদি এভাবে চল, তা হলে তুমি আমার খলীফা। (পৃ. ৯০) এ প্রসঙ্গে সমকালীন মর্যাদাপূর্ণ বিচারক (কাজী) পরিবারের স্বনামধন্য বিচারক মুহিউদ্দীন কাসানীর খেলাফত নামা ফিরিয়ে নেয়া এবং ন্যূনতম এক বছর সময়কাল ধরে তা স্থগিত করে রাখার বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য। সুলতান আলাউদ্দীন খলজি কাজী পরিবারের সদস্য মুহিউদ্দীন কাসানীকে আওয়াধের কাজী পদে নিয়োগ করার জন্য এবং একইসাথে তাঁকে কিছু জায়গীর-ভূমিও উপহার প্রদানের নিমিত্তে একটি রাজকীয় ফরমান পাঠান। মুহিউদ্দীন কাসানী ফরমানটি নিয়ে পীর শেখ নিজাম (র.) এর কাছে পরামর্শের জন্য যাওয়ার পর পীর সাহেব অসন্তুষ্ট ও বিমর্ষ হয়ে পড়েন এবং সাথে সাথেই মুহিউদ্দীন কাসানীকে প্রদত্ত খেলাফত নামা ফিরিয়ে নেন এবং এক বছরের জন্য তা স্থগিত করে দেন। (পৃ. ৫৭)

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শেখ নিজাম (র.) এর শিষ্যদের মধ্যে অলি, বিশিষ্ট পণ্ডিত, স্বনামধন্য বুদ্ধিজীবী, কবি, গায়ক, গীতিকার, ঐতিহাসিক ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের অপূর্ব সমাহার ছিল। এঁদের মধ্যে ঐতিহাসিক বারণী এবং ফার্সি কবি আমির খসরুর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। শেখ নিজাম (র.) এঁদের অত্যধিক স্নেহ করতেন কিন্তু চলমান সমাজ জীবনে তাঁদের স্বীয় মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানকে সম্মান জানিয়ে তিনি তাঁদের আধ্যাত্মিক দায়িত্ব পালনে টেনে আনতে আগ্রহী ছিলেন না। শেখ নিজাম (র.) তাঁদেরকে রাজদরবারের সাথে সংশ্রব ত্যাগ করতেও কখনো বলেননি, আবার খেলাফতও প্রদান করেননি। (পৃ. ১৩৩) বলাবাহুল্য, তাঁর এ হেকমতী কৌশল খেলাফত প্রদান বিষয় সমকালীন পীরদেরও গভীরভাবে অনুধাবনের জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করবে অনেকাংশে।

১৫. ফার্সি কবি, সঙ্গীতজ্ঞ আমির খসরুর জীবনে তাঁর প্রভাবঃ এই কিংবদন্তি সঙ্গীতজ্ঞের জীবনে শেখ নিজাম (র.) এর বহুমাত্রিক প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। একদা আমির খসরু তাঁর কণ্ঠ ও সুরের আকর্ষনীয়তা ও মোহনীয়তার জন্য পরম শ্রদ্ধেয় শেখ নিজাম (র.) কে আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করতে অনুরোধ করলে শেখ নিজাম (র.) তাঁকে এক প্লেট চিনি আনতে বললেন এবং চিনিগুলো তাঁর খাটের নীচে রেখে দিতে বললেন। অতঃপর চিনিগুলো মাথার উপরে বৃত্তাকারে গড়াতে বললেন এবং ঐ চিনিগুলো থেকে নিজেকে খেতেও বললেন। বলাবাহুল্য, এতে আমির খসরুর কণ্ঠ ও সুরের আকর্ষণ ও মোহনীয়তা বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। (পৃ. ৬৪)

শেখ নিজাম (র.) কখনো ব্যক্তি সত্তার প্রকৃতিগত প্রবৃত্তিকে অবদমনের চেষ্টা করেননি। বরঞ্চ স্রষ্টা অনুরাগের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টির মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে বস্তুগত আকাঙ্ক্ষাকে গুরুত্বহীন করার জন্য শিষ্যদের উদ্বুদ্ধ করতেন। (পৃ. ১২৭) এরই এক ঐতিহাসিক দৃষ্টি আকর্ষণীয় উদাহরণ, একান্ত ভক্ত-অনুরক্ত শিষ্য সঙ্গীতজ্ঞ আমির খসরুর ঘটনা। আমির খসরু ছোট বেলা থেকেই প্রকৃতিগতভাবে রোমান্টিক ছন্দোময় নান্দনিক কবিতার অনুরাগী ছিলেন। শেখ নিজাম (র) এর কাছে বায়াত গ্রহণের পর তিনি স্বেচ্ছায়-সজ্ঞানে কবিতার বক্তব্য ও সুর বদলানোর একান্ত

আকাঙ্ক্ষার কথা প্রকাশ করলে তদীয় পীর শেখ নিজাম (র.) আমির খসরুকে তাঁর কবিতার স্বাভাবিক ছন্দ ও রীতি পরিবর্তন করতে বারণ করেন। অবশ্য কালক্রমে পীরের ফয়েজ-বরকতের প্রভাবে আমির খসরু নিজেই তাঁর কবিতার রোমান্টিক ধারাকে ক্রমান্বয়ে মরমী ধারায় রূপান্তরিত করে নেন। (পৃ. ৮৪) শেখ নিজাম (র.) সঙ্গীতজ্ঞ আমির খসরুকে অত্যধিক স্নেহ করতেন, আমির খসরুও প্রায় সময় শেখ নিজাম (র.) এর একান্ত সান্নিধ্যে সময় কাটাতেন। এ সম্পর্কের মাত্রা ও প্রভাব যে কত গভীর এবং তাৎপর্যমণ্ডিত ছিল শেখ নিজাম (র.) এর একটি উক্তি থেকেই তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। শেখ নিজাম প্রায়শঃ বলতেন– 'কোন কোন সময় এমন মুহূর্ত আসে, যখন আমি নিজেকে নিয়ে বিরক্ত বোধ করি। কিন্তু আমির খসরুকে নিয়ে আমি কোনদিন বিরক্ত বোধ করিনি।' (পৃ. ১৩৩)

১৬. তাঁর সম্পর্কে মহাকবি আল্লামা ড. ইকবাল এবং আমির খসরুর মন্তব্যঃ আল্লামা ইকবাল বলেন, "তোমার মাযারে আসলে মানুষের অন্তর জীবিত হয়। তোমার অবস্থান হযরত ঈসা (আ.) এবং খিজির (আ.) এর উপরে। -(পৃ. ৭৪) কবি আমির খসরুর মন্তব্যঃ

(ক) শেখ নিজাম (র.) এর দেহ পানি ও মাটি দিয়ে তৈরী হয়নি। হযরত ঈসা (আ.) এবং খিজির (আ.) এর জীবনের সংমিশ্রনে তা তৈরী। (পৃ. ১৪১)

(খ) উচ্চমার্গীয় আধ্যাত্মিকতার পাশাপাশি জীবন-ঘনিষ্ঠভাবে তাঁর মাহাত্ম্যও ফুটে উঠেছে সুন্দরভাবে– "যেখানেই শেখ নিজাম (র.) এর নিঃশ্বাস পৌঁছেছে, সেখানেই হাজার হাজার দুঃখের পর্বত বরফের মতো গলে গিয়েছে।" (পৃ. ১৪২)

১৭. শাসক, শাসনকার্য ও রাষ্ট্র সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিঃ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে খোলাফায়ে রাশেদীনের পর থেকে সুলতানী আমল পর্যন্ত যত রাজনৈতিক সংগঠন ও ক্রিয়াকলাপ সে গুলোর বেশীর ভাগই তথাকথিত ধর্ম-নিরপেক্ষ, প্রকৃত ইসলামিক ধর্মীয় আদর্শের সাথে সাংঘর্ষিক। (পৃ. ৯১) চিশ্‌তিয়া খান্দানের ওলীদের বর্ণনায় এর বাস্তব ভিত্তিক, আইনগত এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও বর্ণিত হয়েছে এভাবেঃ (ক) চিশ্‌তিয়া ওলীরা মনে করতেন যে, একজন আধ্যাত্মিক সাধকের উৎকর্ষ অর্জনের পথে সরকারী সাহায্য বা অনুদান এবং রাজনীতি বড় অন্তরায়। প্রকারান্তরে এটি আধ্যাত্মিক 'মৃত্যু পরোয়ানারই' নামান্তর।" (পৃ. ৮৯) (খ) সরকারী সেবা এখন আর 'ধর্ম-সেবা' রূপে বিদ্যমান না থেকে গোত্র বা শ্রেণী স্বার্থ সেবায় পরিণত। (গ) হযরত ইমাম গাজ্জালী (র.) এর ভাষায়, "রাজা-বাদশাদের প্রায় সম্পূর্ণ আয় হচ্ছে 'হারাম' উৎস থেকে।" অর্থাৎ শরিয়ত সম্মত নয় এমন সব উৎস থেকে। ফলে এ সকল উৎস থেকে প্রাপ্ত আয়ের যে সেবা তাও শরিয়ত-বিরুদ্ধ-পরিত্যাজ্য। (পৃ. ৮৯) (ঘ) এমতাবস্থায় একজন সুফি যদি জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে শাসক শ্রেণী বা আমলাদের সাথে কোন না কোন ভাবে জড়িয়ে পড়েন, তা হলে তিনি প্রায় নিজের অজান্তেই ক্রমান্বয়ে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবেন সম্পূর্ণরূপে। এমতাবস্থায় তিনি আর সুফি দলভুক্ত থাকতে পারেননা। (পৃ. ৮৯) (ঙ) শাসক গোষ্ঠীর 'অপব্যায় ও বিলাসিতার সংস্কৃতি'র প্রভাব এবং প্রাচুর্যের

দুর্নিবার আকর্ষণের কারণে ঐ সুফি তাঁর নিজের পবিত্র আত্মাকে আর নিজের আত্মা বলে মনে করতে পারবেননা। (পৃ. ৮৯)

শেখ নিজাম উদ্দীন আওলিয়া (র.) পূর্বসূরীদের এ সমস্ত নির্দেশনা তাঁর জীবনাদর্শে, কথায়, কাজে ও চিন্তায় অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন এবং একইসাথে বিভিন্ন গল্প ও উদাহরণের মাধ্যমে স্থান-কাল-পাত্রভেদে একান্ত জীবনঘনিষ্ঠভাবে উল্লিখিত কারন ও ব্যাখ্যার যৌক্তিকতা বর্ণনা করে তাঁর শিষ্যদেরও তা প্রতিপালনে উপদেশ দিতেন। (পৃ. ১১৬) ব্যক্তিগত জীবনে তিনি সুলতান জালালউদ্দীন খলজি কর্তৃক খানকাহ্‌র জন্য জায়গীরের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান (পৃ. ৯১) এবং সিলিসিলার শিষ্যদের ক্ষেত্রে, বিশেষত খেলাফত নামার লিখিতভাবে সুস্পষ্টভাষায় রাজা-বাদশাদের সংশ্রব-মুক্ত থাকার নির্দেশনা (পৃ. ৮৯, ১২৭) সর্বোপরি সরকার-সংশ্লিষ্টতার কারণে খলীফা মুহিউদ্দীন কাসানীর খেলাফত নামা ফিরিয়ে নেওয়ার ঘটনা (পৃ. ৯১) তাঁর এ অনন্য বিশিষ্টতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় বারংবার।

১৮. সমকালীন সুলতানদের সাথে চিশ্‌তিয়া খান্দানের দ্বন্দ্বের চাল-চিত্র: মুহাম্মদ বিন তুঘলকের শাসনামলে তিনি কিছু কিছু অভিযানের ক্ষেত্রে শেখ নিজাম (র.) এর রূহানী সাহায্য ও দোয়া কামনা করেন (পৃ. ১০৪) অথচ বিস্ময়কর ব্যাপার হলো শেখ নিজাম (র.) এর কোন কোন সিনিয়র সদস্য ঐ সুলতানের হাতেই যাতনা ভোগ করেন (পৃ. ১০৪)। এর মূল কারণ হলো আদর্শগত দ্বন্দ্বের প্রক্রিয়া মাত্র। সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক ইবনে তাইমিয়ার আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে রাষ্ট্রও ধর্মের পারস্পরিক সম্পর্ককে 'যমজ সন্তান' তুল্য মনে করতেন এবং এ মানসিকতা বশত প্রত্যাশা করতেন যে, সুফিরা সুলতানের নিয়ন্ত্রনাধীন থাকুক, সরকারী চাকুরীও করুক। (পৃ. ১০৪) কিন্তু নীতিগত কারণে সুফিরা এ মনোভাব মেনে নিতে পারেনি বলে সরকারের সাথে সুফিদের দ্বন্দ্ব ও দূরত্ব অনিবার্য হয়ে পড়ে। (পৃ. ১০৪) এ প্রসঙ্গে সুফিদের মনোভাবের চিত্র ফুটে উঠেছে সুলতান জালাল উদ্দীন খলজির উদ্দেশ্যে আমির খসরুর কিংবদন্তিতুল্য সেই ঐতিহাসিক মন্তব্যে: "আপনাকে অমান্য করলে আমার মস্তক হারাবার আশংকা আছে, কিন্তু আমি যদি আমার আধ্যাত্মিক গুরুর (শেখ নিজামের) প্রতি অশ্রদ্ধা পোষণ করি, তাহলে আমার ঈমান হারাব; যা হারাবার জন্য আমি কখনো প্রস্তুত নই। আমার কাছে আমার মুর্শিদই বড়।" (পৃ. ১০৪)

১৯. সুফিদের ১০০ স্তর, কেরামত প্রদর্শনের স্তর ১৭ এর ব্যাখ্যা এবং ওলেমা ও দরবেশের পার্থক্য বিশ্লেষণ: শেখ নিজাম (র.) এর মতে, আধ্যাত্মিক সিলসিলায় অলৌকিকতা বা কারামত প্রদর্শন গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাঁর ফাওয়ায়িদ উল ফুয়াদ গ্রন্থে কোন কারামতের বর্ণনা পাওয়া যায়না। (পৃ. ১১৭) এই গ্রন্থে তিনি সুফিবাদের স্তর বিন্যাস এবং কারামত প্রদর্শনের স্তর এবং এর সীমাবদ্ধতার বর্ননা দেন এভাবে– সুফিবাদের একশটি স্তর আছে, তম্মধ্যে কারামত প্রদর্শনের ক্ষমতার স্তর হলো সপ্তদশ স্তর। এ স্তরে থেমে গেলে একজন সুফি সাধক আরও ৮৩টি স্তর অতিক্রম করবে কীভাবে? (পৃ. ১১৮) তিনি ওলেমা ও দরবেশের মধ্যে পদ্ধতিগত পার্থক্য নির্ধারণ করেছেন এভাবে: "ওলামারা উপদেশ এবং পরামর্শ দিয়ে ক্ষান্ত হন

কিন্তু দরবেশরা শুধু উপদেশ দিয়ে ক্ষান্ত হননা। দরবেশগণ যে কোন কিছু উদাহরণ দিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে এবং কাজে প্রয়োগ করে তা বাস্তবে দেখিয়ে দিয়ে মানুষকে পরিশুদ্ধ করেন। (পৃ. ১১৭)

২০. তাঁর ওফাত, দাফন, পীরের খেরকা প্রদান প্রসঙ্গঃ শেখ নিজাম উদ্দীন আওলিয়া ৮২ বছর বয়সে ১৩২৫ খ্রিস্টাব্দের ৩ এপ্রিল (১৮ রবিউসসানী ৭২৫ হিজরী) সকালে তাঁর খানকাহ্‌তেই ইন্‌তিকাল করেন। তদীয় পীর কর্তৃক প্রদত্ত পবিত্র খিরকা দিয়ে তাঁর সর্বাঙ্গ ঢেকে এবং তাঁর ব্যবহৃত জায়নামায মাথা মোবারকের উপর রেখে শেখ রুকুনুদ্দীন (র.) এর ইমামতিতে নামাযে জানাযা শেষে খানকা সংলগ্ন বাগানের যে কমলা গাছটির নীচে তিনি প্রায়শ বিশ্রাম নিতেন, সেখানেই খোলা আকাশের নীচে উন্মুক্ত স্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়। (পৃ. ৭৯)

২১. সুফি সাধক হিসেবে তাঁর অনন্য বিশেষত্ব, তিন ধারার সমন্বয়ঃ সুফিবাদের আদর্শ ও ঐতিহ্যকে সুসমন্বিত করে এর সৃজনশীল বিকাশে শেখ নিজাম (র.) গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন ঐতিহাসিক ভাবেই। তিনি ত্রয়োদশ শতাব্দীর ইসলামী সুফিবাদের পুরোধা শেখ শিহাব উদ্দীন সোহ্‌রাওয়ার্দী (র.), শেখ মহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী (র.) এবং মাওলানা জালাল উদ্দীন রুমর (র.) এর আদর্শকে একীভূত করে একটি কার্যকর চালিকা শক্তিতে রূপান্তরিত করেন। (পৃ. ১১৫) প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বাবা ফরিদ (র.) সুফি আন্দোলনকে এক গণ আন্দোলনে রূপান্তরিত করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন, শেখ নিজাম উদ্দীন আওলিয়া তাঁকে পরিপূর্ণতা দান করেন সফলতার সাথে। (পৃ. ১১৫) সুফিবাদের বার্তাটি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ও বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার প্রয়োজনে সুফি কাঠামোর আওতায় এই গণ আন্দোলনের কৌশল হিসেবে তিনি সারা ভারতে শত শত খানকাহ্‌ এবং হাজার হাজার শিষ্যকে এ কাজে নিয়োগ করেন। (পৃ. ১১৭) উল্লেখ্য, তাঁর আমল থেকেই খেলাফত নামায় সজরার (সিলসিলার ক্রমসূত্র) রেওয়াজ চালু হয়। (পৃ. ১১৫) বলাবাহুল্য, তাসাওউফ পরিমন্ডলে সিলসিলার যুক্তিগ্রাহ্য ধারাবাহিকতা, সর্বোপরি পীরের বা শেখের প্রশ্নাতীত শুদ্ধতা ও বস্তুনিষ্ঠতা যাচাই-বাছাইয়ের প্রশ্নে এ সজরার গুরুত্ব অপরিহার্য। প্রণিধানযোগ্য বিষয় হলো ঃ যত দিন যাচ্ছে, পরিসর বড় হচ্ছে তত বেশী এর গুরুত্বও বাড়ছে প্রতিদিন-প্রতিনিয়ত।

২২. কিরমানী পরিবারের সাথে তাঁর সম্পর্ক; তাঁর অনবদ্য জীবনী রচনার ঘটনাঃ আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে, স্বনামধন্য শেখ হিসেবে তাঁর জীবন সাধনার শুরু থেকে যাঁদের সাথে উঠা বসা ছিল তার মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো কিরমানী পরিবার। শেখ নিজাম (র.) এর সাথে কিরমানী পরিবারের এ একান্ত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের প্রত্যক্ষ ফসল হিসেবেই আমির খুর্‌রম দ্বারা রচিত হয় তাঁর বিখ্যাত জীবনী গ্রন্থ 'সিয়ার উল আওলিয়া'। (পৃ. ১২৮)

২৩. বিভিন্ন সিলসিলার অলীদের শ্রদ্ধাঃ বিভিন্ন সিলসিলার অলিগণ শেখ নিজাম (র.) কে গভীর শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। মুলতানের বিখ্যাত সোহরাওয়ার্দী ত্বরিকার অলি শেখ

রুকুনুদ্দীন আবুল ফতেহ্ তাঁকে ‘ধর্মের রাজা’ নামেই সম্বোধন করতেন (পৃ. ১৪৩)। পণ্ডিত, কবি, দার্শনিক, বিদ্বান ব্যক্তিসহ বিভিন্ন ত্বরিকার সর্বস্তরের জনসাধারণ বিপুল সংখ্যায় তাঁর মাজারে জিয়ারত করতে আসতেন ফয়েজ লাভের উদ্দেশ্যে। উচ্চ শিক্ষার্থে ইউরোপ যাবার প্রাক্কালে মহাকবি ইকবাল তাঁর শিক্ষা জীবনের উৎকর্ষ লাভের প্রত্যাশায় শেখ নিজাম উদ্দীন আওলিয়ার মাজার জিয়ারত করে যান। (পৃ. ১৪৩)

২৪. তাঁর জীবন-কর্ম ও মর্মের সামগ্রিক মূল্যায়নঃ শেখ নিজাম উদ্দীন আওলিয়া ছিলেন দক্ষিণ এশিয়ার একজন অত্যন্ত আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। ধর্মীয় বিজ্ঞান, বিশেষ করে কুরআন ও হাদিসে তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল অসাধারণ। (পৃ. ১৩৪) অভ্যন্তরীন জীবনে তিনি ছিলেন হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (র.) এর মতো এবং ধর্মের বাহ্যিক চর্চার ক্ষেত্রে ছিলেন হযরত আবু হানিফা (র.) এর মতো। (পৃ. ১৩৪)

দক্ষিণ এশিয়ার মানুষকে শেখ নিজাম (র.) পাঁচ দশকেরও অধিককাল ধরে আধ্যাত্মিক নির্দেশনা ও আশ্রয় দিয়েছেন। তিনটি রাজ বংশের এক ডজনেরও অধিক শাসকবর্গ তাঁর আধ্যাত্মিক শাসনামলে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহন করেছেন এবং বুদবুদের মতো বিদায়ও নিয়েছেন। কিন্তু শেখ নিজাম (র.)কে কোন রাজনৈতিক পরিবর্তন তাঁর অবস্থান থেকে টলাতে পারেন নি। সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন হয়েছে, কিন্তু কোন রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে তাঁর নৈতিক শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক চর্চা এবং সাধনা থেমে থাকেনি। (পৃ. ১৪১)

তাঁর জীবন সাধনা ছিল মানুষের ভালবাসায় নিবেদিত ও সহমর্মিতায় সিক্ত, যা মধ্যযুগীয় রাজদরবারের বিলাসিতা ও যুদ্ধ বিগ্রহের উম্মাদনা থেকে মুক্ত একটি মানব দরবী ও কল্যাণকামী সমাজ প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে এবং মানুষের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক চিন্তা-চেতনায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দিয়েছে। হযরত শেখ নিজাম উদ্দীন আওলিয়া (র.) এর এ ঐতিহাসিক কালজয়ী অবদান চিরস্মরণীয়, চির বরণীয় ও চিরভাস্বর হয়ে থাকবে কালের প্রবহমান ধারায়। (পৃ. ১৪৪)

প্রফেসর ড. আব্দুল মান্নান চৌধুরীর কয়েকটি দৃষ্টি আকর্ষণীয় ব্যতিক্রমধর্মী বিশেষত্বের কারণে তাঁর মরমীধারার লেখনী সমূহ তাসাওউফ জগতের আগ্রহী পাঠকদের আকর্ষণ করে বেশী মাত্রায়। যুগপৎ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত সাধারণ থেকে অসাধারণ সকল শ্রেণীর মননশীল সচেতন পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণেও সমর্থ হয় অবলীলাক্রমে। যেমন: (১) তাঁর পারিবারিক সূত্রে বাল্যজীবন থেকে ১৯৬২ সালে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রাবস্থায় দরবারী তথা তাসাওউফ জগতের সাথে তাঁর যে মর্যাদাপূর্ণ যোগসূত্র সেই ধারাকে তিনি পীরের বরকতে নিজের জীবনের মহামূল্যবান তোহ্ফা হিসেবে, নান্দনিক অলংকার হিসেবেই বিবেচনা করে একে সযতনে, সচেতনে ধারণ, লালন ও প্রতিপালন করে চলেছেন জীবনের এ স্তর পর্যন্ত।

১৯৬২ সালে যে ধারার শুরু, নিরবচ্ছিন্নভাবে বর্তমান সময়কাল (২০১৫) সুদীর্ঘ অর্ধ শতাব্দীকালেরও উর্ধ্বে, আক্ষরিক অর্থে ৫৪ বছর সময় কাল নিরবচ্ছিন্নভাবে এ ধারাকে ধারণ, লালন ও প্রতিপালনে, সর্বোপরি প্রায় প্রতিনিয়ত একে হালনাগাদ উন্নীত করার

প্রবহমান প্রক্রিয়ার একান্ত মননশীল সাধনায়ও তিনি উত্তীর্ণ হয়েছেন সফলতার সাথে। কথায়, কাজে ও চিন্তায়, মেধায়-মননে সতত: তাসাওউফ জগতের আলোকে আলোকিত ও উদ্ভাসিত বলে তাঁর পাঠক-বান্ধব লেখনীতে এ জগতের মাধুর্য ও খুশবো সততঃ সুস্পষ্ট।

(২) জাগতিকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতার মর্যাদাপূর্ণ পেশায় আত্মনিয়োগ করে ডক্টরাল ও পোস্ট ডক্টরাল গবেষণার মাধ্যমে স্বীয় শিক্ষা ও শিক্ষকতার পরিমন্ডলকে করেছেন মজবুত ও মর্যাদাপূর্ণ। সুদীর্ঘ ৪২ বছরের শিক্ষকতা জীবনের পাশাপাশি ৭ জন মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীর পি এইচ ডি গবেষণার তত্ত্বাবধায়কের (সুপারভাইজারের) দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন তাঁর উঁচু মার্গের মেধা মননেরই পরিচায়ক। ছাত্র-নন্দিত এক জন সফল শিক্ষক ও উচ্চতর গবেষণার গবেষণা-নির্দেশক হিসেবে তাঁর লেখনীগুলো বিদ্বৎ সমাজেও সমানতালে সমাদৃত। এ ক্ষেত্রে এ কারণে তাঁর তাসাওউফ বিষয়ক লেখনীগুলোও তাঁরা গ্রহণ করেন একান্ত ভক্তি, শ্রদ্ধা ও বিশ্বস্ততার সাথে। এখানেও ড. মান্নানের আর একটি বিশেষত্ব নিহীত।

জীবন-যৌবন, প্রাতিষ্ঠানিক উচ্চতর গবেষণা, শিক্ষকতা, তাসাওউফ-ভিত্তিক জীবনদর্শন, সুদীর্ঘ অর্ধ শতাব্দীকালের নিরবচ্ছিন্ন ধারায় সবগুলো তাঁর মধ্যে একীভূত থেকে একাকারে পরিণত হয়ে উঠেছে আশ্চর্য রকমভাবে, যা এক বিরল ঘটনাও বটে। এ কারণে তাঁর সাধারণ লেখা ও জাগতিক, আধ্যাত্মিক সকল শ্রেণীর পাঠকের কাছে একটা ব্যতিক্রধর্মী বিশেষ আবেদন নিয়ে উপস্থিত হয়। বলাবাহুল্য, তাঁর ব্যক্তিজীবনের সহজ-সরল, সাবলীল গতিধারার মতো তাঁর লেখনী গুলোও সহজ-সরল, অথচ খুবই আবেদন সৃষ্টিকারীও জীবনঘনিষ্ঠ।

বিভিন্ন কারণে আমাদের সমাজ জীবনে আলোকিত শ্রদ্ধেয় ও আদর্শিক মানুষের বড় অভাব। বলাবাহুল্য, আধুনিক সর্বোচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত জনের সৃজনশীল মেধা-মননের সাথে আধ্যাত্মিক জগতের সুসমন্বয়ক সুধীজনের অভাব আরো বেশী। এ ক্ষেত্রে প্রফেসর ড. আব্দুল মান্নান চৌধুরী রীতিমতো একজন ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব। তাঁকে দেখিয়ে আমরা প্রফুল্লচিত্তে আনন্দসহকারে বলতে পারি, এ একজন সব্যসাচী গবেষক, যাঁকে অনুকরণ ও অনুসরণ করা যায় আদর্শ হিসেবে, দ্বিধাহীনচিত্তে।

জাগতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষাকে প্রায় সমান্তরাল ধারায় নিজের মধ্যে ধারণ, লালন ও প্রতিপালন করে সমকাল ও নতুন প্রজন্মের কাছে একে সমন্বিত ধারায় উপস্থাপনের 'নান্দনিক সংস্কৃতি' সৃষ্টিতেও তিনি অনন্য। এককথায়, এতদঞ্চলে এ ধারায় তিনি রীতিমতো আদর্শিক পথিক ও পথিকৃৎ।

আমার মাঝে মধ্যে মনে হয় ড. মান্নান চৌধুরীর জন্মটাই যেন তাসাওউফ ও মাইজভাণ্ডারী দর্শনের বিকাশের প্রয়োজনে। এ ধারায় তাঁর জীবনাচরণের প্রায় অলিখিত ও অজানিত বেশ কিছু তাৎপর্যপূর্ণ বিশেষত্ব আমাকে রীতিমতো মোহিত করেছে। যেমন:

১. ১৯৭৪ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগে শিক্ষকতার শুরু থেকে আজ অবধি (২০১৫) সুদীর্ঘ ৪২ বছর সময়কাল ধরে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, মুখ্য বা গৌণভাবে, উজান কিংবা ভাটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকর্মী শিক্ষক, গবেষক, বুদ্ধিজীবী মহলে 'মাইজভাণ্ডারী সংস্কৃতি'কে তাত্ত্বিকভাবে উপস্থাপনের একটা 'নতুন ধারার সংস্কৃতি' গড়ে তুলেছেন নিরবচ্ছিন্ন ধারায়, সম্পূর্ণ একক প্রচেষ্টায়।

২. পরিপূর্ণমাত্রায় আত্মনিবেদনের পাশাপাশি নিজের মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানের প্রেক্ষিতে শিক্ষক সমাজের গবেষণামুখী ও গবেষণায়-উৎসাহী শিক্ষক সমাজকে 'মাইজভাণ্ডারী-সংস্কৃতি' মুখী করার পাশাপাশি কয়েক ডজন শিক্ষক-গবেষককে এ ধারায় আত্ম নিয়োগেও উৎসাহিত করেছেন।

৩. শুধু তাই নয়, এঁদের অনেককে তিনি প্রত্যক্ষভাবে মাইজভাণ্ডারী পরিমণ্ডলে প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার অবকাঠামোতেও সংশ্লিষ্ট করে নিয়েছেন মর্যাদাপূর্ণভাবে।

৪. বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা, একাডেমিক দায়িত্ব, পি-এইচ-ডি গবেষকদের গবেষণা-নির্দেশকের দায়িত্ব ইত্যাদি মেধা-মননের সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি তাসাওউফ-কেন্দ্রিক উল্লেখযোগ্য লেখালেখি ও প্রকাশনা তাঁকে নতুন মাত্রিকতা দান করেছে। এ ধারায় তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা হলোঃ (ক) মাইজভাণ্ডারী দর্শন ঃ উৎপত্তি, বিকাশ ও বিশেষত্ব (২০০২)। (খ) কাওকাবুদ দুররী বা জীবনের ধ্রুবতারা (২০০৭) (গ) জবল-এ-নূর বা আলোর পাহাড় (২০১০) (ঘ) Light upon Light (২০১২). এর পাশাপাশি ২০০৫ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় একুশে পুরষ্কার প্রাপ্ত গবেষণাগ্রন্থ ঃ ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা ঃ তত্ত্ব ও প্রয়োগ এ ধারায় এক অনবদ্য সংযোজন।

শুধু এ পরিমণ্ডলেই সীমাবদ্ধ নয়; চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে, বিশ্ববিদ্যালয়ের আশে-পাশের অঞ্চলে, এমনকি চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলে (প্রত্যন্ত অঞ্চলেও) তাসাওউফ ও মাইজভাণ্ডার বিষয়ক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় প্রকাশনাও সমৃদ্ধ হয়েছে তাঁর অবিরাম নিত্য-নতুন লেখালেখির মাধ্যমে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আমি ব্যক্তিগতভাবে বিগত প্রায় দু'দশক ধরে বাংলাদেশের বাংলা একাডেমী এবং ফিনল্যান্ডের ফিনিস একাডেমীতে মাইজভাণ্ডার বিষয়ে উচ্চতর প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার প্রয়োজনে মাইজভাণ্ডারী ঘরানাতে নিবিড় ফিল্ড ওয়ার্ক করতে গিয়ে ড. মান্নান চৌধুরীর এহেন নিরবচ্ছিন্ন নীরব-নিভৃত সৃজনশীল বিচিত্র ও বহুমাত্রিক কর্মকাণ্ডের চালচিত্র পর্যবেক্ষণ করেছি অতি কাছে থেকে, বিস্মিত হয়েছি, সাধারণ্যে প্রায় অদৃশ্য, প্রচারহীন এহেন নিরবচ্ছিন্ন অবদানের এ কালজয়ী পুরুষের বিরামহীন অদম্য উৎসাহ দেখে।

বলাবাহুল্য, শিক্ষকতা, সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের শত ব্যস্ততার মাঝেও তাসাওউফ ও মাইজভাণ্ডার বিষয়ক বড়-ছোট যে কোন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, মূল প্রবন্ধকার, মুখ্য আলোচক কিংবা সভাপতিত্বের পাশাপাশি স্মরণিকার জন্য লেখা প্রদানের প্রস্তাবকে তিনি অবনতচিত্তে শ্রদ্ধার সাথেই গ্রহণ করে থাকেন একান্ত প্রফুল্লচিত্তে।

এক কথায়, বিগত ৩০ বছর ধরে সৃষ্ট তাঁর এই একক ঐতিহ্য আমাদের বিস্মিত করে। মনে হয়, এ ধরণের যে কোন প্রস্তাব সানন্দে গ্রহনের মধ্যেই তাঁর অপার আনন্দ। এ ক্ষেত্রে তাঁর ব্যক্তিগত অভিধানে 'না' শব্দটির কোন উল্লেখই পাওয়া যায়না। এ এক বিরল বিশেষত্ব। আমার বিবেচনায়, 'মাইজভাণ্ডারী সংস্কৃতির' ইতিহাসে এ একটি কারণেও তিনি স্মরণীয়-বরণীয় হয়ে থাকবেন চিরায়ত ধারায় এবং এ জননন্দিত ও ব্যাপক জনগোষ্ঠীর হৃদয়-ছোঁয়া আকর্ষণীয় বিশেষত্বের কারণে তিনি এতদঞ্চলে তাসাওউফ ভিত্তিক সংস্কৃতির একটা মননশীল পাঠক-শ্রেণীও গড়ে তোলতে সক্ষম হয়েছেন। তাই ড. মান্নান চৌধুরীর এ ঘরাণার লেখালেখি মানেই আলগোছে সচেতন পাঠক-শ্রেণীর বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ।

মুসলিম শিক্ষা-সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে আমাদের এ উপমহাদেশে প্রায় ঘরে ঘরে হযরত শেখ নিজামউদ্দীন আওলিয়ার নাম সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে উচ্চারিত। লেখকের উচ্চতর গবেষণার কারণে তত্ত্ব ও তথ্য সমৃদ্ধ এবং একইসাথে তাসাওউফ-সংস্কৃতির সু সমন্বয়ে স্মরণীয়-বরণীয় এ মহান আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের জীবন কর্ম ও মর্ম বিষয়ক এ অনন্য গ্রন্থটি হয়ে উঠেছে একইসাথে তাত্ত্বিক তথ্য সমৃদ্ধ ও সুখপাঠ্য। এককথায়, শাশ্বত আবেদনের বিষয়বস্তু এবং একইসাথে এতদ্ববিষয়ে লেখকের হৃদয়স্পর্শী লেখনীর সু সমন্বয়ে সামগ্রিক বিষয়টি হয়ে উঠেছে 'সোনায়-সোহাগা'। বর্ণনার মুন্সিয়ানা এবং একান্ত আন্তরিকতার সু সমন্বয়ে লেখক অতি সহজে যে কোন শ্রেণীর পাঠকের মন জয় করে, পাঠককে যেন সম্মোহিত করে সাথে নিয়ে অগ্রসর হয়ে চলেন শেষ অবধি। সাধারণের আবরণ ও আভরণে এটি এ গ্রন্থের এক অসাধারণ বিশেষত্ব।

শুধু তাই নয়, আমার বিবেচনায় এ অনন্য গ্রন্থটি লেখকের জাগতিক জীবনে সওয়াবের পাশাপাশি জীবনাবসানের পরও 'সদকায়ে জারিয়া' হিসেবে অব্যাহত থাকবে প্রবহমান ধারায় অনন্তকাল ধরে।

ড. সেলিম জাহাঙ্গীর
রিসার্চ ফেলো, ফিনিস একাডেমী
হেলসিংকী, ফিনল্যান্ড।

পীরবাড়ী
ফৌজদারহাট
চট্টগ্রাম।
dr.salimjahangir1955@gmail.com

প্রথম অধ্যায়

সূচনা বক্তব্য

ভূমিকাঃ একদা হযরত শেখ নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.) তাঁর শিষ্যদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, "অতীতে কত পণ্ডিত ও বিদ্বান ব্যক্তি, মনীষী তাঁদের সাফল্যের উচ্চ শিখরে আরোহন করেছিলেন, অথচ কেউ কি মনে রেখেছে তাঁরা কে ছিলেন এবং কোথায় তাঁরা বাস করতেন? যেটা স্থায়ী হয় সেটা হল জনগণের সাথে সুখে শান্তিতে বাস করার স্মৃতি। প্রকৃত আধ্যাত্মিক জীবন হচ্ছে এটাই।" (ফুয়াইদ উল ফুয়াদ, পৃ: ৬৪)। হযরত শেখ নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.)'র নিজের জীবনই হচ্ছে এ বাণীর জ্বলন্ত উদাহরণ।

হযরত শেখ নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.)'র স্মৃতি মানুষের অন্তরে খোদিত হয়ে আছে এবং তাঁর মানব প্রেম, শুভেচ্ছা ও সহনশীলতার বার্তা কালের গণ্ডি পেরিয়ে প্রতিনিয়ত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। দিল্লীতে তাঁর জীবন ছিল সৃষ্টির আধ্যাত্মিক বা স্বর্গীয় উদ্দেশ্য (তাঁর বিবেচনায়) পূরণের জন্য অবিরত সংগ্রাম। মানুষকে আল্লাহ্‌কে পাওয়ার রাস্তা দেখিয়ে দেয়া এবং মানবতার কল্যাণে নিবেদিত হতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার সংগ্রাম। তিনি ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের সাথে মানবতার সেবাকে যুক্ত করে ধর্মীয় কর্মকাণ্ডকে একটি যুগান্তকারী ব্যাপ্তি দান করেন। তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে বলতেন, 'গরীব এবং নিঃস্ব লোকদের যত্ন নেয়া ধর্মের আনুষ্ঠানিকতা পালনের চাইতে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। (ফুয়াইদ উল ফুয়াদ, পৃ: ১৩-১৪)। তাঁর সময়কার একজন সুফি সাধক মন্তব্য করেছেন, 'প্রত্যেক সুফিদের একটি সাধারণ (Common) ক্ষমতা বা শক্তি আছে এবং তা' হল আল্লাহ্‌কে আরাধনা করার ক্ষমতা। কিন্তু হযরত শেখ নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.) কে আল্লাহ্‌তালা দু'টো ক্ষমতা দিয়েছেন : (১) খোদার আরাধনা করার ক্ষমতা এবং (২) মানুষকে সেবা করার বোঝা বইবার ক্ষমতা।' (শেখ আহমদ মগরিবী (র.) কৃত তোহ্‌ফাতুল মজলিশ কিতাব দ্রষ্টব্য)। সুতরাং, স্রষ্টা এবং মানবতা–এ দু'টো বিষয় তাঁর গতিশীল সামাজিক মূলবোধের ভিত্ রচনা করেছিল। জে.এস. ব্ল্যাকি (J.S. Blackie) বলেন, 'সকল মহৎ নৈতিকতার উৎস বা প্রস্রবণ হচ্ছে মনের ঋণের থেকে উৎসারিত নৈতিক উদ্দীপনা বা অনুপ্রেরণা এবং ঐ উৎস বা প্রস্রবণের যোগানদাতা হচ্ছে স্বয়ং আল্লাহ্‌তায়ালা'। (J.S.Blackie, Self-Culture, Edinburg, ১৮৮৬, পৃ: ৬১)। হযরত শেখ নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.) বলেছেন, 'যদিও বালুকণার মত আল্লাহ্‌কে পাওয়ার বহু রাস্তা রয়েছে, কিন্তু মানুষের অন্তরে সুখ আনাটাই হচ্ছে সর্বাধিক ফলপ্রসূ ও কার্যকরী পথ। যে কেউ আল্লাহ্‌কে পেতে চায়, তাকে অবশ্যই আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকে সেবা করার

মাধ্যমেই আল্লাহ্‌র কৃপাদৃষ্টি লাভ করতে হবে।' (Siyar-ul Awliya, pp. 411, 558-9; Durari-Nazami)।

হযরত শেখ নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.)'র জীবনের এটাই ছিল চূড়ান্ত ঘোষণা বা আহ্বান। অসংখ্য মানুষ তাঁর সমীপে তাদের দুঃখ দুর্দশার কথা জানাতে আসত। তিনি আল্লাহ্‌তালার নিকট দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তাদের জন্য দোয়া করতেন, ফরিয়াদ রাখতেন। (Khair-ul-Majalis, pp. 104-5)। তিনি কেবলমাত্র দর্শনার্থীর দুঃখ-দুর্দশা লাঘবে সাহায্যই করতেন না, তিনি তাদের মধ্যে আত্ম-বিশ্বাস ও শৃঙ্খলাবোধ জাগিয়ে তোলার জন্যও প্রচেষ্টা চালাতেন। ফলে তাদের জীবনের মর্যাদা ও নৈতিক মূল্যবোধ বৃদ্ধি পেত। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, আল্লাহ্‌র প্রতি অকৃত্রিম আস্থা এবং নৈতিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা বস্তুগত ও পার্থিব মোহ থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে পারে। যে সমাজ নৈতিক মূল্যবোধ ও নীতিগত আদর্শকে বিসর্জন দেয়, সে সমাজের ধ্বংস অবিনার্য।

হযরত শেখ নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.)'র আদি নিবাস ছিল বোখারায়। মঙ্গোলীয়দের আক্রমণের কারণে তিনি এবং তাঁর পরিবারবর্গ তাঁদের পৈতৃক ভূমি ছাড়তে বাধ্য হন। চেঙ্গিস খান জরফসান নদীর তীরে অবস্থিত বোখারার মত একটি সমৃদ্ধশালী নগরীকে ধুলোয় মিশিয়ে দেন। ত্রিশ হাজারেরও অধিক মানুষকে ফাঁসি দেয়া হয় এবং অশীতিপর বৃদ্ধ লোকদেরকে ক্রীতদাস বানিয়ে রাখা হয়। কোন ব্যক্তির পদমর্যাদাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে তাদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালানো হয়। ফলশ্রুতিতে জ্ঞান-বিজ্ঞান, চারুকলা, শিষ্টাচার প্রভৃতি ক্ষেত্রে সমৃদ্ধ বোখারা নগরীকে একটি মৃতপুরীতে পরিণত করা হয়। কিন্তু স্বল্পসংখ্যক ভাগ্যবান ব্যক্তি এ ধ্বংসলীলা থেকে পালিয়ে আসতে সক্ষম হন। তাঁদেরই কয়েকজন হলেন হযরত শেখ নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.)'র পিতা এবং পিতামহ। ইবনে আতির বলেন, 'সেদিনটি ছিল বড়ই ভয়ানক দিন। স্বামী-স্ত্রী ও শিশুদের কান্না ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছিল না।' (Arminius Vambery, History of Bukhara (London, 1873) p. 130)। পৈত্রিক ভূমি ও পরিবারের বন্ধন ত্যাগ করে হযরত শেখ নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.)'র পূর্ব পুরুষগণ ভারতবর্ষে পালিয়ে আসেন এবং অবশেষে বাদাউনে বসতি স্থাপন করেন। বাদাউন হল একটি শান্ত ও নিরিবিলি জায়গা যেখানকার লোকজন রাজনৈতিক সংগ্রাম থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকতে এবং কোন প্রকার সরকারী চাকুরী না নিয়ে রাজধানীর হৈ চৈ থেকে দূরে থাকতে পছন্দ করত। এক কালের বোখারায় মান-মর্যাদায় শীর্ষে অবস্থানকারী হযরত শেখ নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.)'র পূর্ব পুরুষগণ কপর্দকহীন মুহাজির হয়ে বাদাউনে আশ্রয় নিলেন। এতে খোদার প্রতি তাঁদের বিশ্বাসের মাত্রা বহুগুণে বেড়ে যায়। মোহ-মায়া ত্যাগ করে খোদার ইচ্ছায় সন্তুষ্ট থাকার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। তাঁর পিতার অকাল মৃত্যুর পর তার মাতার কোলেই তিনি লালিত-পালিত হন। তাঁর মাতা ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক ও ধৈর্য্যধারণকারী মহিলা। তিনি তাঁর ছেলে হযরত শেখ নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.) কে তৎকালীন বাদাউনে বিদ্যমান সর্বোচ্চ উত্তম শিক্ষা প্রদানে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান। সে যুগে ধার্মিক ও নিবেদিত প্রাণ শিক্ষকবৃন্দ শিক্ষাদানকে একটি পবিত্র দায়িত্ব মনে করে কোন

প্রকার পারিশ্রমিক ছাড়া শিক্ষা দানে আগ্রহী ছিলেন বিধায় হযরত শেখ নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.) প্রাপ্ত সুযোগের সর্বাধিক ব্যবহার সুনিশ্চিত করতে সর্বাধিক প্রচেষ্টা চালালেন। একাগ্রচিত্তে তিনি লেখা পড়ায় মনোনিবেশ করলেন। প্রায়শঃ শিশু নিজাম উদ্দিন (র.) যখন ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে স্কুল থেকে ফিরতেন, তখন তাঁর বিধবা মাতা বলতেন, 'আমরা আজ আল্লাহ্‌র মেহমান।' এর অর্থ হল আজ ঘরে খাবার কিছুই নেই। কিছুকাল পর হযরত শেখ নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.) তাঁর মাকে তাঁর সাথে দিল্লী যাবার জন্য রাজী করালেন এবং দিল্লীতে গিয়ে তিনি রাজধানীর প্রখ্যাত জ্ঞানী ব্যক্তিদের সান্নিধ্য লাভ করে তাঁর পড়াশুনা সমাপ্ত করতে সক্ষম হন। দিল্লীতে অবস্থানকালে প্রথম ভাগে তিনি বিভিন্ন অসুবিধার সম্মুখীন হন। দিল্লীতে তখন একমণ তরমুজ দুই জিতাল দরে বিক্রি হোত, কিন্তু হযরত শেখ নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.)'র আর্থিক অবস্থা এত খারাপ ছিল যে এক টুকরা তরমুজ খাবারও সামর্থ্য তাঁর ছিল না। হযরত শেখ নিজাম উদ্দিন আওলিয়া গঞ্জেশকর (র.) [১১৭৫-১২৬৫] এর আধ্যাত্মিক সুনামের কথা শুনে আকৃষ্ট হন এবং অজোধান (যা' বর্তমানে পাকপত্তন নামে পরিচিত) যেতে মনস্থ করেন এবং তাঁর ত্বরিকায় দীক্ষা নেন। শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জেশকর (র.)-এর বয়স তখন প্রায় নব্বই বৎসর। তিনি বালক নিজাম উদ্দিনকে সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন, কেননা তিনি বালক নিজাম উদ্দিনের মাঝে ভবিষ্যতে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ লাভের বিপুল সম্ভাবনা দেখতে পান। শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জেশকর (র.) তার সিলসিলার কাজকে এগিয়ে নেবার জন্য বালক নিজাম উদ্দিনকে যোগ্য আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব বলে সাব্যস্ত করেন। কিছুদিন প্রশিক্ষণ দেবার পর বালক নিজাম উদ্দিনকে শেখ গঞ্জেশকর (র.) তাঁর খলীফা মনোনীত করেন এবং তাঁর আধ্যাত্মিকতার যোগ্য উত্তরসূরী হিসেবে ত্বরিকা বিকাশের দায়িত্ব অর্পণ করেন। প্রাথমিক অবস্থায় তিনি বাসস্থান ও খাবারের অভাবে নিদারুণ কষ্ট ভোগ করেন। পরবর্তীকালে তাঁর জীবনের অবস্থা পরিবর্তন হতে শুরু করে। গিয়াসপুরে তিনি খানকাহ্ প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁর খানকাহ্‌য় রাজধানী থেকে অনেক দূরে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও দূর-দূরান্ত থেকে শত শত দর্শনার্থী ও শিষ্যরা এসে ভীড় করতে থাকে। তাঁর দরজার সামনে দিয়ে যমুনা নদীর স্রোত যেভাবে প্রবাহিত হচ্ছিল, ঠিক তদ্রূপ তাঁর কাছে দর্শনার্থীদের আনীত উপহার সামগ্রী (তোহ্‌ফা বা ফুতু)'র ঢল ফল্গুধারার মত প্রবাহিত হতে শুরু করে। সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত নিকটতম রাস্তায় মেলায় আসা জনতার মত দর্শনার্থীদেরকে খাবার পরিবেশন করা হতে লাগল। শেখ নিজাম উদ্দিন (র.) সারাদিন রোজা রাখতেন। সেহ্‌রী খাবার সময় তিনি যখন দেখতে পান যে দিল্লীতে কিছু কিছু লোক না খেয়ে ঘুমোচ্ছেন, তখন তাঁর সেহ্‌রী খাওয়া তাঁর কাছে গলায় কাঁটা বিঁধে থাকার মত মনে হোত। তিনি সেহ্‌রী খেতেন না। তাঁর এ অবস্থা দেখে যারা উপোস থাকত তারা আধ্যাত্মিক শান্তনা খুঁজে পেত। হযরত রাসূলে করিম (দঃ)'র মহান হাদীস "সকল প্রাণী হচ্ছে আল্লাহ্‌র পরিবার এবং যারা আল্লাহ্‌র প্রাণীদের বেশী সেবা করবে, তারা আল্লাহ্‌র কাছে সবচেয়ে প্রিয় হবে।" এর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তারা শেখ নিজাম উদ্দিনকে 'মাহবুবে ইলাহী' বা 'আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দা' বলে অভিহিত করত।

হযরত শেখ নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.) ছিলেন একজন সর্বোৎকৃষ্ট শিক্ষক। তিনি নিছক কথার ফুলঝুরিতে বিশ্বাস করতেন না, তিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞানকে নিজের জীবনে বিকশিত করাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন। তাঁর কথায় এমন আন্তরিকতা ও সম্মোহনী শক্তি ছিল যে, কেউ তাঁকে এক নজর দেখা মাত্র ভাল কিছু করার জন্য অনুপ্রেরণা লাভ করত। দিল্লীর একজন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ শাহ্ আবদুল আজিজ প্রায়শঃ বলতেন যে, শেখ নিজাম উদ্দিন (র.)'র ব্যক্তিত্বের প্রভাব এত গভীর ছিল যে, যে কোন দর্শনার্থী গিয়াসপুরে এসে তাঁকে এক নজর দেখামাত্র তার অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যেত। (মলফুজাতে শাহ্ আবদুল আজিজ, পৃঃ ৩৪৩-৪৪)।

হযরত শেখ নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.) ছিলেন অহিংসার প্রবর্তক এবং তিনি প্রতিশোধ গ্রহণের রীতিকে জংলী আইন নামে অভিহিত করতেন। তিনি তাঁর অনুসারীদেরকে তাদের শত্রুদের প্রতিও ভাল ব্যবহার করার/উপকার করার উপদেশ দিতেন। তিনি শেখ আবু সাঈদ আবুল খায়েরের কিছু পংক্তি প্রায়শঃ আবৃত্তি করতেন এবং এ পংক্তিগুলো ছিল তাঁর জীবনের দর্শন। পংক্তির ভাবার্থ নিম্নরূপঃ

'যে আমার বন্ধু নয়, আল্লাহ্ যেন তার বন্ধু হয়।
যে আমার সমালোচনা করে, তার আনন্দ যেন বাড়ে।
যে আমার পথে শত্রুতাবশতঃ কাঁটা দেয়,
তার জীবন যেন কন্টকমুক্ত ফুলের বাগান হয়।'

তাঁর জন্ম হয়েছিল সুলতান আলাউদ্দিন মাসুদ (১২৪২-১২৪৬ খৃঃ) এর শাসনামলে, কিন্তু তিনি ওফাতপ্রাপ্ত হন মোহাম্মদ বিন তুঘলকের সিংহাসনে আরোহন করার সময় (অর্থাৎ ১৩২৫ খৃঃ)। এ সময়ে (১২৪২-১৩২৫) তের জন শাসক দিল্লীর মসনদে বসেন। কিন্তু তিনি কোনদিন রাজ দরবারে যাননি এবং কোন বৃত্তি, ভোগ, কিংবা জায়গীর (গ্রাম) গ্রহণ করেননি। রাজনৈতিক ক্ষমতার জৌলুস তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। ছাত্র জীবনে তিনি একবার কাজীর চাকুরী নিতে চেয়েছিলেন, তিনি শেষ পর্যন্ত সে ধারণা পরিত্যাগ করেন। তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল অতি উচ্চ স্তরের এবং মহৎ। তাঁর পূর্ব পুরুষরা যখন বোখারা ছেড়ে আসেন, তখন ইরান এবং কেন্দ্রীয় এশিয়ার (Central Asia) সামগ্রিক সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থা ছিল মঙ্গোলীয়দের আক্রমণে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন। তিনি যখন দিল্লীতে আসেন তখন দিল্লীর সুলতানী আমল নতুন আশা ও আস্থা নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল। এ সময়ে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ জাগ্রত করা জরুরী ছিল। মনীষী ইকবালের কবিতায় উদ্বেলিত হয়ে তিনি বলতে পেরেছিলেন,

'আমার দারিদ্য প্রপীড়িত জীবন আলেকজান্ডারের রাজকীয় জীবনের চাইতে শ্রেয়। আমার কাজ হল মানুষ তৈরী করা। তিনি (আলেকজান্ডার) কেবল তাঁর প্রতিচ্ছবি নির্মাণে ব্যস্ত।'

বহু বছর ধরে শেখ নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.) দিল্লীতেই বসবাস করতে থাকেন, কিন্তু তাঁর শত শত প্রবীণ শিষ্য বা খলীফাদের মাধ্যমে তিনি তাঁর প্রেম ও আশার বাণী নির্যাতিত ও নিপীড়িত মানুষের কাছে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পৌঁছিয়ে দেন। মানুষ যাতে মহৎ ও উন্নত আদর্শের কাছে অহমিকাকে পদানত করে একটি সুন্দর ও নিরাপদ সামাজিক ব্যবস্থা কায়েম করতে পারে তাহাই ছিল এ বাণী প্রেরণের মূল উদ্দেশ্য।

মধ্যযুগীয় সুফিদের (Medieval mystic) জীবনধারা পুনঃনির্মাণ করা খুব একটা সহজসাধ্য ছিল না। কারণ বাস্তবতা ও কল্পনা, সত্য ও অসত্য এত বেশি মিশ্রিত হয়ে গিয়েছিল যে সুফিদের জীবনধারাকে প্রকৃত সত্যের দিকে নিয়ে যাবার জন্য কঠোর সমালোচনা এবং দৃঢ় নীতিমালা প্রয়োগের প্রয়োজন ছিল। হযরত নিজাম উদ্দিন (র.) আরবীতে একটি খুত্‌বা প্রায়শ পাঠ করতেন যা বিভিন্ন ভারতীয় মসজিদে জুমার খুত্‌বা হিসেবে পাঠ করা হয়।

এম.জি. জোনায়েদ আহমদ (Contribution of India to Arabic Literature, PP. 184-5) খুত্‌বাটি লেখার রীতি, ভাষণ, বিষয়বস্তু এবং খুত্‌বায় বিবৃত এশ্‌ক-মহব্বতের নিদর্শন প্রভৃতির ভূয়শী প্রশংসা করেন। তিনি খুত্‌বাটি ইংরেজীতে অনুবাদ করেন যার মর্মার্থ নিম্নরূপঃ

"সকল প্রশংসা তাঁর (আল্লাহ্‌র) জন্য, যাঁর দৃষ্টিশক্তির কাছে আমাদের দৃষ্টিশক্তি অতীব ক্ষুদ্র এবং যাঁর নৈকট্য লাভে সমর্থ হয়েছেন এমন লোকদের কল্পনাও যাঁর সম্পর্কে বর্ণনা করতে হয়েছে ব্যর্থ। তিনি তাঁর (আল্লাহ্‌র) ক্ষমতাবলে প্রাণীকুলকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর (আল্লাহ্‌র) ইচ্ছা শক্তির প্রভাবে চরম অস্তিত্বহীনতা থেকে তাদেরকে অস্তিত্বসম্পন্ন করেছেন। তিনি স্বর্গীয় প্রশংসাকারীদের জিহ্বাকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' উচ্চারণের শক্তি দিয়েছেন এবং জ্ঞানীদের বক্ষে আলোর চাবি জমা করেছেন যা' আল্লাহ্ ছাড়া কারো জানা নেই। যারা স্বর্গীয় দর্শনের জন্য আকাঙ্ক্ষা করেন, আল্লাহ্‌তায়ালা তাদের আত্মাকে উজ্জীবিত করেন। স্রষ্টার নৈকট্য লাভের জন্য মহান আল্লাহ্‌তায়ালার তরবারী হাতে যারা খোদা প্রেমে বিভোর হয়ে রক্ত ঝরিয়েছেন (অর্থাৎ জেহাদ করেছেন) এবং যারা খোদা প্রেমে নিজেদের অন্তরকে প্রজ্জ্বলিত করেছেন, আল্লাহ্‌তায়ালা তাদের অন্তরকে জীবনীশক্তিতে প্রবলতর করবেন এবং সাক্ষাৎ দান করবেন। তিনি (আল্লাহ্‌তায়ালা) বিশ্বাসী বা ঈমানদারদের জন্য বেহেশ্‌ত এবং কাফেরদের জন্য দোযখ সৃষ্টি করেছেন যাতে করে পূণ্যবানরা তাদের নেক আমলের পুরস্কার পায় এবং দোষীরা শাস্তি লাভ করে। বলাবাহুল্য, খোদার সৌন্দর্য দর্শন ছাড়া, খোদার নৈকট্য লাভ ছাড়া বেহেশ্‌ত প্রাপ্তি অর্থহীন।"

আমির হাসান সিজ্‌জী (Amir Hasan Sijzi) কর্তৃক সংকলিত ফুয়াইদ উল ফুয়াদ, আমির খুর্‌দ কর্তৃক প্রণীত সিয়ার-উল-আওলিয়া, আলী জান্দার প্রণীত দুরার-ই-নিজামী, খাজা শাম্‌ছ উদ্‌ দীন বিহারী কর্তৃক প্রণীত মালফুজাত, খাজা মোহাম্মদ কর্তৃক প্রণীত আনওয়ার-উল-মাজালিশ, জিয়াউদ্দীন বারানী কর্তৃক প্রণীত হাসারাত নামাহ্, খাজা আজিজ উদ্দীন সুফি কর্তৃক প্রণীত তোহ্‌ফাতুল আবরার ওয়া কারামতুল আখিয়ার, মোহাম্মদ জামাল কিয়াম উদ্দীন

কর্তৃক প্রণীত কিয়াম-উল-আকায়েদ, হামিদ কলন্দর কর্তৃক সংকলিত খায়ের-উল-মাজালিশ, সৈয়দ মোহাম্মদ হোসাইনী কর্তৃক সংকলিত জাওয়ামী-উল-কালিম (গুলবার্গের সৈয়দ মোহাম্মদ গিসু দারাজের সাথে শেখ নিজাম উদ্দীন আওলিয়ার কথোপকথন), আবুল ফয়েজ মিনাল্লাহ্ কর্তৃক সংকলিত জমিলুল জুমানদার সামাইলুল কুমল, হামিদ বিন ফজলুল্লাহ্ কর্তৃক প্রণীত সিয়ার-উল-আরেফীন, শেখ আবদুল হক মোহাদ্দেস দেহ্লভী কর্তৃক প্রণীত আকবর-উল-আখিয়ার, মোহাম্মদ যোথী সাত্তারী কর্তৃক সংকলিত গুলজার-ই-আবরার, আবদুচ ছামাদ বিন আফজাল মোহাম্মদ কর্তৃক প্রণীত আকবর-উল-আসফিয়া, আবদুর রহমান চিশ্তী কর্তৃক প্রণীত মিরাট-উল-আসরার, মীর আলী আকবর হোসাইনী আরদিস্তানী কর্তৃক প্রণীত মাজমা-উল-আওলিয়া, আল্লাহ্ দিয়া চিশ্তী কর্তৃক প্রণীত সিয়ার-উল-আকতাব, দারাসিকো কর্তৃক প্রণীত সফিনাতুল আওলিয়া, গোলাম মুঈনুদ্দীন আবদুল্লাহ্ কর্তৃক প্রণীত মায়িজ-উল-ওলায়াত, মোহাম্মদ বুলখ চিশ্তী কর্তৃক প্রণীত মত্লুব-উত্-তালিবীন এবং রওজা-ই-আকতাব প্রভৃতি গ্রন্থে হযরত নিজাম উদ্দীন আওলিয়া (রহঃ)'র হেদায়েত প্রকৃতি ও আধ্যাত্মিক দর্শন সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

হযরত নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.)'র আধ্যাত্মিক বিকাশে তাঁর জন্মস্থান বাদাউনের প্রভাব

মঙ্গোলিয় ও গজ (Ghuzz) দের আক্রমণের ফলে অনেক বিখ্যাত পরিবার তাদের মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত হয়। অনুরূপভাবে, চেঙ্গিস খানের সেনাবাহিনী যখন বোখারা আক্রমণ করে, তখন হযরত শেখ নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (রহঃ)'র দাদা (পিতামহ) এবং নানা (মাতামহ) মরহুম খাজা আলী ও খাজা আরব বোখারার বসতবাড়ি ছাড়তে বাধ্য হন। বোখারা ছিল সেন্ট্রাল এশিয়ার তৎকালীন একটি সমৃদ্ধশালী শহর। এটা ছিল একটি বিখ্যাত সাংস্কৃতিক কেন্দ্র যেখানে নক্‌শবন্দী ত্বরিকার প্রবক্তা সিলসিলাহ্-ই-খাওয়াজগান বহু খানকাহ্ ও আস্তানা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

সম্ভবতঃ খাওয়াজগানের সাথে সম্পৃক্ততার কারণেই হযরত নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (রহঃ)'র দাদা এবং নানা উভয়ের নামের সাথে খাজা নামটি যুক্ত হয়। খাজা আরব অত্যন্ত ঐশ্বর্য এবং সম্পদশালী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর অনেক ক্রীতদাস ছিল। হযরত নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (রহঃ)'র দাদা ও নানা প্রথমে লাহোরে আসেন এবং পরবর্তীতে তাঁরা বাদাউনে চলে আসেন। বেশিরভাগ রাজনীতিবিদ ও সরকারি কর্মকর্তা বাস্তুহারা হয়ে এই বাদাউনেই বসতি স্থাপন করেন। বাদাউনে এসে খাজা আরব তাঁর কন্যা জোলায়খা-কে খাজা আলীর পুত্র খাজা আহমদের সাথে বিয়ে দেন। খাজা আহমদ এবং বিবি জোলায়খার ঔরশে হযরত নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (রহঃ) জন্মলাভ করেন। হযরত নিজাম উদ্দীন আওলিয়া (রহঃ)'র মাতাপিতা বৈষয়িক সম্পদ ও সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হওয়ার দরুণ পার্থিব লোভ-লালসা থেকে বিমুক্ত হয়ে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেন এবং তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি তাঁদের সন্তান হযরত নিজাম উদ্দিন (রহঃ)'র মধ্যেও সংক্রমিত হয়।

ঘোরিদ সেনাবাহিনী (Ghurid Armies)

বাদাউনে অনুপ্রবেশের পূর্ব থেকেই উত্তর ভারতের মুসলিম অধ্যুষিত শহরগুলোর মধ্যে বাদাউন ছিল অন্যতম। তারাঈন যুদ্ধের দশ বৎসর পূর্বে মাওলানা রাজি উদ্দিন হাসান সাঘানী (Saghani) বাদাউনে জন্মগ্রহণ করেন। মাওলানা রাজি উদ্দীন হাসান সাঘানী হলেন বিখ্যাত গ্রন্থ 'মাশারিক-উল-আনওয়ার'-এর লেখক। হযরত নিজাম উদ্দিন তাঁকে অতিশয় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করতেন। বাদাউনে বিভিন্ন পণ্ডিত, কবি, ওলী, সাহিত্যিকগণ

মঙ্গোলিয়া আক্রমণের ফলে কেন্দ্রিয় এশিয়া থেকে বিতাড়িত হয়ে বসতি স্থাপন করেন। ফলে দিল্লীর পরই বাদাউন রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিকভাবে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হয়ে উঠে।

শেখ নিজাম উদ্দিন (রহঃ) সফর মাসের শেষ বুধবার ১২৪৪ সালে (?) (Circa 642/1244?) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম রাখা হয় মোহাম্মদ। কিন্তু তিনি নিজাম উদ্দিন নামেই সুপরিচিত হন।

মোহাম্মদ জামাল কিয়াম উদ্দিনের মতে, হযরত নিজাম উদ্দিন (রহঃ)'র ভূমিষ্ঠ হবার পূর্বে তাঁর বাবা মারা যান। কিন্তু এ বর্ণনাটির কোন সমর্থন পাওয়া যায় না। আলী জাণ্ডারের মতে, হযরত নিজাম উদ্দিন (র.) যখন মায়ের দুধ খেয়ে বেড়ে উঠছিলেন, তখনি তাঁর বাবা মারা যান। হযরত শেখ নিজাম উদ্দিন (র.)'র বর্ণনা থেকে এর সত্যতা প্রতীয়মান হয়। হযরত শেখ নিজাম উদ্দিন (র.) বলেন, "আমার বড় বোন থেকে শুনেছি যে, মা জোলায়খা একদিন স্বপ্নে দেখলেন, কোন এক ব্যক্তি তাঁকে ডেকে বলছেন, তোমার স্বামী কিংবা ছেলে এ দুয়ের মধ্যে যে কোন একজনকে মরতে হবে। তুমি কোন্টা চাও? তোমার ছেলে মারা যাক, নাকি তোমার স্বামী মারা যাক? বিবি জোলায়খা বললেন, আমার ছেলে বেঁচে থাকুক।" এ স্বপ্ন দেখার কিছুদিন পর হযরত নিজাম উদ্দিন (রহঃ)'র পিতা খাজা আহমদ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং মারা যান (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)।

বাদাউনে সাগর দিঘীর নিকটে তাঁকে সমাহিত করা হয়। স্থানটি পবিত্র তীর্থস্থান হিসেবে শতাব্দী ধরে সমাদৃত হয়ে আসছে। হাফিজ রহমত খান স্থানটিতে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন এবং স্থানটির চতুর্দিকে একটি ঘেরা তৈরী করে দেন। শিশু নিজাম উদ্দিন (রহঃ) পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়ে মাতার কোলে লালিত পালিত হন। তাঁর মাতা ছিলেন একজন ধর্মপ্রাণা আধ্যাত্মিক মনোবলে বলীয়ান মহিলা এবং তাঁর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ, ত্যাগী ও সহনশীল মনোভাব এবং অনুপম চরিত্র তাঁর ছেলে শেখ নিজাম উদ্দিন (রহঃ)'র মাঝে সংক্রমিত হয়। স্রষ্টা, মানুষ এবং সমাজ প্রভৃতি সম্পর্কে হযরত নিজাম উদ্দিন (রহঃ)'র গভীর উপলব্ধি জন্মে বাদাউনের সুফিবাদী পরিবেশ থেকে। বাদাউন তাঁর জীবনে গভীর রেখাপাত করে। তিনি প্রায়শঃ বাদাউনের স্মৃতি রোমন্থন করতেন এবং বাদাউন সম্পর্কে কারো সাথে আলাপ কালে অশ্রুসিক্ত হয়ে যেতেন। তিনি বাদাউনের প্রতিটি গাছ-পালা, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ, মানুষ, ভাষা-সংস্কৃতি প্রভৃতিকে গভীরভাবে ভালবাসতেন। নিম্নের কয়েকটি উদাহরণ থেকে তাঁর আধ্যাত্মিকতার বিকাশে বাদাউনের প্রভাব সম্পর্কে কিঞ্চিৎ ধারণা পাওয়া যাবেঃ

(ক) নাসির নামক বাদাউনের এক যুবক একদা নিজাম উদ্দিন (রহঃ)কে বললেন, 'আমার পিতা একজন আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন এবং রহস্যজনকভাবে বিদায় নিলেন।' হযরত নিজাম উদ্দিন (রহঃ) তাঁর বাবার মৃত্যুর সাথে বালকটির পিতার মৃত্যুর মিল খুঁজে পান এবং এর আধ্যাত্মিক যোগসূত্র উপলব্ধি করেন।

(খ) বাদাউনে আহমদ নামক এক ব্যক্তি তাঁর বন্ধু ছিলেন। আহমদ অত্যন্ত ধার্মিক লোক ছিলেন। তিনি (আহমদ) অশিক্ষিত লোক হলেও ধর্ম সম্পর্কে জানার আগ্রহ ছিল তাঁর প্রবল। হযরত নিজাম উদ্দিন (রহঃ)'র মাতার মৃত্যুর খবর শুনে তিনি অঝোর ধারায় কেঁদেছিলেন। হযরত নিজাম উদ্দিন (রহঃ)'র মাতার প্রতি লোকটির অকৃত্রিম ভালবাসা দেখে মুগ্ধ হন এবং এর মাঝে আধ্যাত্মিক পবিত্রতা খুঁজে পান।

(গ) বাদাউনে একজন ধর্ম প্রচারক ছিলেন। তিনি বক্তৃতা দেবার সময় ভাবাবেগে তাড়িত হয়ে মিম্বর থেকে ঘরের কার্নিস পর্যন্ত লাফ দিয়ে উঠতেন। হযরত নিজাম উদ্দিন (রহঃ) তন্ময় হয়ে ভাবতেন, এ ধরণের ভাবাবেগ শ্রোতার উপর কোন স্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারে কী?

(ঘ) একদিন শেখ নিজাম উদ্দিন (রহঃ) দেখতে পেলেন যে, তাঁর কতক শ্রোতা ছায়াতে বসে আছে। তিনি বললেন, 'আমার গা পুড়ে যাচ্ছে।' এ অবস্থায় তাঁর মন চলে গেল বাদাউন ও শেখ সাহে মুইতাব (Shaikh Shahay Muitab) এর প্রতি। শেখ সাহে মুইতাব একদা তাঁর বন্ধুদের সাথে বনভোজনে গিয়েছিলেন এবং দুধ ও চাল দিয়ে মিষ্টি খাবার তৈরি করেছিলেন। শেখ সাহে মুইতাব যখন খেতে বসলেন, তখন অনুভব করলেন যে খাবার থেকে কিছু একটা গায়েব করা হয়েছে। তাঁকে বলা হল যে, দুধ যখন সিদ্ধ হচ্ছিল, তখন উপচে না পড়ার জন্য কিছু দুধ অন্যত্র সরিয়ে নেয়া হয়েছে। শেখ সাহে সন্তুষ্ট হলেন না। তিনি তাঁর সাথীদেরকে রোদে দাঁড়িয়ে থাকতে বললেন যতক্ষণ পর্যন্ত না শরীর থেকে ঘর্ম প্রবাহিত হয়। তাঁর সাথীদের শরীর থেকে যতটুকু ঘাম বের হল, ঠিক সে পরিমাণ রক্ত তাঁর শরীর থেকে নেয়ার জন্য একজন নাপিতকে আদেশ দিলেন। শেখ সাহে মুইতাবের ন্যায় বিচার দেখে হযরত নিজাম উদ্দিন (রহঃ) অভিভুত হয়ে গেলেন। শেখ সাহে যখনি কোন স্থানে যেতেন, জনতা তাঁর চতুর্দিকে জমায়েত হয়ে যেত। হযরত নিজাম উদ্দিন (রহঃ)'র ব্যক্তিত্বে এ ঘটনাটি গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল।

(ঙ) হযরত নিজাম উদ্দিন (রহঃ) মাওলানা রাজী উদ্দিন হাসান সাঘানীকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন। মাওলানা সাঘানী বাদাউন থেকে আলীগড় আসলেন এবং মুশরিফের (Mushrif) সহকারীর দায়িত্ব পেলেন। একদিন মুশরিফ মাওলানা সাঘানীর সাথে দূর্ব্যবহার করলেন, কিন্তু মাওলানা রাগান্বিত না হয়ে মৃদু হাসলেন। এতে মুশরিফের রাগ বেড়ে গেল। মুশরিফ মাওলানার প্রতি কালির দোয়াত ছুঁড়ে মারলেন। দোয়াতটি মাওলানার গায়ে পড়লনা বটে, কিন্তু মাওলানা এতে দারুনভাবে অপমানিত বোধ করলেন। মাওলানা বললেন, 'এ সকল অশিক্ষিত ও অসভ্য লোকদেরকে নিয়ে আমাদের কিছুই করার নেই।' তিনি চাকুরী ছেড়ে দিলেন। অতঃপর মাসিক একশত তন্‌কা (Taka) বেতনের বিনিময়ে আলীগড়ের এক ওলীর ছেলেকে প্রাইভেট পড়াবার কাজ নিলেন। সেখান থেকে তিনি হজ্বে গেলেন এবং হজ্ব সমাপনান্তে বাগদাদ হয়ে দিল্লীতে আসলেন। তখনকার দিনে দিল্লীতে অনেক বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও পণ্ডিত ব্যক্তি বিদ্যমান থাকলেও মাওলানার মত হাদীস বিশারদ কেউ ছিলনা।

মাওলানা সরকারী কর্মকর্তার সাথে দেখা-সাক্ষাতে অনীহা প্রকাশ করতেন। হযরত নিজাম উদ্দিন (রহঃ)-এর আধ্যাত্মিক জীবনাচরণে মাওলানার দর্শন ও জীবনবোধ দারুণ প্রভাব ফেলেছিল।

(চ) একদা মাওলানা আলাউদ্দিন উসূলী এবং হযরত নিজাম উদ্দিন (র.) যৌথভাবে একটি পাভুলিপির মর্মার্থ উদ্ধার করার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু পাভুলিপির মধ্যে এমন একটি ছত্র পেলেন যার মর্মার্থ বুঝা যাচ্ছিলনা। এমন সময় মাওলানা মালিক এয়ার সেখানে আসলেন। মালিক ইয়ার খুব একটা বিদ্ধান ছিলেন না। মাওলানা উসূলী মালিক ইয়ারের কাছে ছত্রটির মর্ম জানতে চাইলেন। মালিক ইয়ার ছত্রটি শুদ্ধভাবে আবৃত্তি করলেন যার ফলে এর অর্থ পরিস্কার হয়ে গেল। মাওলানা উসূলী বললেন, 'মালিক ইয়ারের কাব্যিক প্রেরণা ছিল বলেই এটা সম্ভব হয়েছে।' সেদিন থেকে হযরত নিজাম উদ্দিন (রহঃ) বুঝলেন, কাব্যিক প্রেরণা কাকে বলে। মালিক ইয়ার যখন বাদাউনে জুমা মসজিদের ইমাম নিযুক্ত হলেন তখন অনেকে তাঁর বিদ্যা-শিক্ষা কম এ অজুহাতে আপত্তি জানাল। মাওলানা উসূলী এটা শুনে বললেন, মালিক ইয়ারকে যদি বাগদাদের জুমা মসজিদের ইমামও বানানো হয়, তাও তাঁর আধ্যাত্মিক ক্ষমতার তুলনায় পর্যাপ্ত হবেনা। হযরত নিজাম উদ্দিন (রহঃ) এ মন্তব্য থেকে বুঝতে পারলেন যে, আধ্যাত্মিক শিক্ষার কাছে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা অতি নগন্য।

(ছ) বাদাউনে থাকাকালীন সময়ে শেখ নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.) কাজী হামিদ উদ্দিন নাগোরীর প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠেন। বাদাউনের বেশীরভাগ লোক ও কাজী হামিদ উদ্দিন নাগোরীকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। খাজা সাহে মুইতাব তাঁর শিষ্যত্ব বরণ করেন এবং কাজী হামিদউদ্দিন নাগোরী তাঁকে তাঁর 'খিরকাহ্' (খেলাফত প্রদানের আধ্যাত্মিক নিদর্শন) প্রদান করেন। আজিজ বশীর নামক অন্য একজন ওলী দিল্লীতে গমন করেন এবং কাজী হামিদ উদ্দিন নাগোরীর পুত্র মাওলানা নাসাহ্ উদ্দিনের নিকট থেকে 'খিরকাহ্' এর জন্য আবেদন করেন। কিন্তু মাওলানা নাসাহ্ উদ্দিন তাঁকে 'খিরকাহ্' প্রদান কনেননি, যেহেতু আজিজ বশীর আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে অতিরঞ্জিত বক্তব্য রাখতেন্য। হযরত নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.) এ দৃষ্টান্ত থেকে উপলদ্ধি করলেন যে, আধ্যাত্মিকতায় অতিরঞ্জনের স্থান নেই। সকল প্রকার বাহুল্য বর্জনীয়।

(জ) বাদাউনের কোতোয়াল খাজা আজিজ ওলী-দরবেশদেরকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। একদা তিনি তাঁর সম্মুখে একটি টেবিলের কাপড় (table cloth) বিছিয়ে একটি ফলের বাগানে বসেছিলেন। ঘটনাক্রমে হযরত নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.) ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। কোতোয়াল খাজা আজিজ দূর থেকে তাঁকে দেখলেন এবং হযরত নিজাম উদ্দিন (র.) কে তাঁর পাশে বসে একসাথে খাবার খেতে অনুরোধ করলেন। কোতোয়াল তাঁকে তাঁর (কোতোয়ালের) পাশে বসালেন এবং খুবই সম্মান করলেন। হযরত নিজাম উদ্দিন (র.) উপলদ্ধি করলেন যে, দেশ পরিচালনায় আসীন কর্তৃপক্ষকে দয়ালু এবং ভদ্র হতে হবে। তারা গুণী ব্যক্তিদেরকে শ্রদ্ধার চোখে দেখবে।

(ঝ) বাদাউনের এক বাসিন্দা নিয়মিতভাবে রোজা রাখতেন। ইফতারের সময় তিনি তাঁর ঘরের দরজায় বসে থাকতেন এবং পথচারীদেরকে তাঁর সাথে ইফতার করতে আমন্ত্রণ জানাতেন। হযরত নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.)'র জীবনাচরণে এ বিষয়টির প্রভাব ছিল অপরিসীম।

(ঞ) বাদাউনের ঐতিহ্যে ইলতুত্‌মিশ তাঁর ধর্মীয় চিন্তা ও ব্যক্তিত্বের নিদর্শন রেখে গেছেন। হযরত নিজাম উদ্দিন (র.) সুলতান ইলতুত্‌মিশের বহু ঘটনা সম্পর্কে জানতেন এবং তিনি সেগুলো তাঁর ভক্তদেরকে বর্ণনা করতেন। ইনতুত্‌মিশের রহস্যপূর্ণ বাণী, শেখ শিহাব উদ্দিন সোহ্‌রাওয়ার্দী ও শেখ আছাদ উদ্দিন কিরমানীর প্রতি ইলতুত্‌মিশের শ্রদ্ধা, আমের প্রতি তাঁর আসক্তি প্রভৃতি সম্পর্কে হযরত নিজাম উদ্দিন (র.) বিশদ বর্ণনা করতেন। একদা ইলতুত্‌মিশ চৌগান (পলো খেলার আদিরূপ) খেলতে বের হলেন। পথিমধ্যে একজন বৃদ্ধ ভিক্ষুক ভিক্ষার জন্য তাঁর কাছে হাত পাতলেন। তিনি তাকে ভিক্ষা দিলেন না। অতঃপর ইলতুত্‌মিশ একজন শক্ত-সমর্থ যুবকের মুখোমুখি হলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁর থলে থেকে একটি স্বর্ণের টুকরা বের করে যুবককে দিলেন। তারপর তিনি তাঁর সঙ্গীদের কাছে আসলেন এবং প্রশ্ন করলেন, "তোমরা কি জান কেন আমি বৃদ্ধ ভিক্ষুককে কোন ভিক্ষা দিলামনা এবং যুবকটিকে না চাইতে একটি স্বর্ণের টুকরা দিলাম?" সঙ্গীরা এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারলনা। তখন সুলতান ইলতুত্‌মিশ বললেন, "যদি এটা আমার ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়া হতো, তা'হলে আমি বৃদ্ধ ভিক্ষুককেই স্বর্ণের টুকরাটি দিতাম। কিন্তু এটা আমার ইচ্ছাধীন ছিলনা। আল্লাহ্‌র ইচ্ছাতেই আমি তা' করেছি। আমার কোন হাত ছিলনা। আমি অসহায়।" হযরত নিজামউদ্দিন (র.) কে এ বক্তব্য দারুনভাবে প্রভাবিত করেছিল। "স্বর্গীয় কাজে বিশ্বাস" শীর্ষক আলোচনা সভায় তিনি প্রায়শ: শিষ্যদেরকে এ ঘটনাটি বর্ণনা করতেন।

(ট) বাদাউনের বাসিন্দা মাওলানা সিরাজ উদ্দিন তিরমিজি মক্কা শরীফে গেলেন এ আশা নিয়ে যে, জীবনের শেষ কয়টা দিন তিনি মক্কা শরীফেই কাটাবেন এবং মৃত্যুর পর তিনি যেন মক্কা শরীফেই সমাহিত হন। এক রাত্রে তিনি স্বপ্নে দেখলেন যে, যে সকল মৃতদেহ পবিত্র মক্কা নগরীতে কবরস্থ হওয়ার যোগ্য নয় সেগুলো তাদের কবর থেকে উঠিয়ে দেয়া হচ্ছে এবং যারা অন্যত্র মারা গেছেন, অথচ আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে উন্নত তাঁদের মৃতদেহকে ঐ কবরগুলোতে দাফন করা হচ্ছে। এ স্বপ্ন দেখে তিনি বাদাউনে চলে আসলেন। হযরত নিজাম উদ্দিন (র.) বুঝতে পারলেন যে, যিনি পুণ্যবান ও নেক আমলের অধিকারী, তিনি যে কোন স্থানে এবং যে কোন সময়ে মৃত্যুবরণ করুননা কেন, খোদাতালা তাঁকে পুরষ্কৃত করবেনই।

(ঠ) বাদাউনের একটি আলভী পরিবারে এমন সময়ে একটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হল যে সময়টাকে সাধারণত: অলক্ষুণে বিবেচনা করা হয়। তাঁর মা-বাবা তাকে একজন ঝাড়ুদার মহিলার হাতে দিয়ে দিলেন। চার-পাঁচ বৎসর পর ঐ মহিলা সন্তানটি নিয়ে বাদাউনে আসলেন। ছেলেটি দেখতে খুবই সুদর্শন এবং আকর্ষণীয় মনে হল। তার মা-বাবা ছেলেটিকে ফেরত নিলেন এবং তার জন্য যথাযথ শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন। পরবর্তীকালে এ ছেলে এত বড় পন্ডিত হয়েছিলেন যে, বাদাউনের বেশীরভাগ লোক তাঁর কাছে নতজানু হয়ে জ্ঞান অর্জনে ব্রতী হয়েছিল।

হযরত নিজাম উদ্দিন (র.) তাঁকে স্বচক্ষে দেখেছিলেন এবং উপলব্ধি করলেন যে, কুসংস্কার ও গোঁড়ামী পরিত্যাজ্য।

(ড) একদা হযরত নিজাম উদ্দিন (র.) কে তাঁর ভক্তরা গান-বাজনা বা সেমা মাহফিল সম্পর্কে তাঁর মতামত জানতে চাইলেন। তিনি উত্তর দিলেন, "চাল যখন পানিসহ জ্বলন্ত উনুনে রাখা হয়, তখন উহা টগ্‌বগ্‌ করে ফুটতে থাকে।"

(ঢ) বাদাউনের শহর থেকে বাইরে এক দরবেশ বাস করতেন। হযরত নিজাম উদ্দিন (র.) তাঁকে শহরের বাইরে বাস করার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। দরবেশ উত্তর দিলেন যে, তাঁর এক সফরসঙ্গী তাঁকে বলে গেছেন যে, সঙ্গীটি না আসা পর্যন্ত তিনি যেন তথায় অবস্থান করেন। সঙ্গীটি এ পর্যন্ত ফিরে আসেননি। তাই তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থে তথায় অবস্থান করছেন। এ ঘটনা থেকে হযরত নিজাম উদ্দিন (র.) উপলব্ধি করলেন যে, আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বরা প্রতিজ্ঞা বা ওয়াদা ভঙ্গ করেন না।

(ণ) শেখ জালালুদ্দিন তবরিজী (যিনি কিছুদিনের জন্য বাদাউনে ছিলেন এবং পাপীদের ও ভবঘুরের জীবনে আমূল পরিবর্তন সাধন করেছিলেন) এবং খাজা আজিজ কিরমানীর আধ্যাত্মিক জীবনাচরণ হযরত নিজাম উদ্দিন (র.) এর জীবনে বাদাউনে অবস্থানকালীন সময়ে দারুনভাবে প্রভাব ফেলেছিল।

শেখ নিজাম উদ্দিন (র.) প্রায় ষোল বৎসর যাবত বাদাউনে ছিলেন এবং তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা বাদাউনেই সমাপ্ত করেছিলেন। বাদাউনে তাঁর জীবন ছিল দারিদ্র্যক্লিষ্ট এবং সংগ্রামমুখর। তাঁর বিধবা মাতা আর্থিক কষ্টে জর্জরিত হলেও আধ্যাত্মিক শক্তিতে ছিলেন অপ্রতিরোধ্য। তিনি তাঁর সন্তানকে আত্মিক ও নৈতিক সমর্থন দিয়ে যাচ্ছিলেন অবিরত। তিনি দারিদ্র্যকে বিবেচনা করেছেন তাঁর অহংকার হিসেবে। আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের সাথে সামজস্যপূর্ণ নয় এমন কোন কাজে তাঁর সন্তান যাতে প্রবৃত্ত না হয় সে ব্যাপারে তিনি সদা সর্বদা তৎপর থাকতেন। শান্তভাবে এবং এক মন এক ধ্যানে হযরত নিজাম উদ্দিন (র.) জ্ঞান আহরণে তাঁর সমস্ত সময় ও শক্তি ব্যয় করেছিলেন। তাঁর পরিবারে তিনি ছাড়া তাঁর মাতা ও তাঁর একমাত্র বোন আধ্যাত্মিকতার বলে বলীয়ান হয়ে দারিদ্র্যের কষাঘাতকে সাহস ও দৃঢ়তার সাথে মোকাবেলা করেছিলেন। বাদাউনে হযরত নিজাম উদ্দিন (র.) যাঁদের কাছে শিক্ষা লাভ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে শাদী মুক্‌রী এবং মাওলানা আলাউদ্দিন উসূলীর নাম উল্লেখযোগ্য। এ দুই পন্ডিত ব্যক্তি তাঁদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে গভীর আধ্যাত্মিক জ্ঞানের স্বাক্ষর রেখেছিলেন। শাদী মুক্‌রী একজন হাফেজে কুরআন ছিলেন এবং কুরআন তেলাওয়াতের সাতটি পদ্ধতিতে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। তিনি তাঁর ছাত্রদেরকে কুরআন মুখস্থ করার জন্য অনুপ্রাণিত করতেন। তিনি একজন হিন্দুর ক্রীতদাস ছিলেন। ক্রীতদাস থেকে মুক্তি পাবার পর তিনি লাহোরের বিখ্যাত ওলী ও আধ্যাত্মিক পন্ডিত খাজা মুক্‌রীর ছাত্রত্ব বরণ করেন। সাধারণত: এটা মনে করা হতো যে, কেউ যদি শাদী মুক্‌রীর কাছে কুরআন তেলাওয়াতের প্রাথমিক নির্দেশনা পেত, সে পুরো কুরআন মুখস্থ করতে মোটেও বেগ পেতে হোতনা।

মাওলানা আলাউদ্দিন উসূলী ছিলেন একজন ব্যতিক্রমধর্মী আধ্যাত্মিক সাধক। তিনি দিনের পর দিন উপোশ করতেন। কিন্তু কাউকে এ ব্যাপারে জানাতেন না। এত কষ্টে দিনাতিপাত করেও তিনি পাঠদান থেকে পিছপা হননি। তিনি দান বা উপঢৌকন গ্রহণে অনিচ্ছুক ছিলেন। কেউ জোরজবরদস্তি করলে কেবলমাত্র ন্যূনতম প্রয়োজন মেচানোর জন্য যথেষ্ট হয় এরূপ পরিমাণ উপহার গ্রহণ করতেন। তিনি সেহ্‌রীর সময় অতি অল্প আহার করতেন। বেশীর ভাগ সময়ে ক্ষুধার কষ্টে কাতর হলেও কারো দান গ্রহণ করতেন না। একবার এক ধনী প্রতিবেশী তাঁর জন্য কিছু অর্থ, কিছু আটা ও কিছু মাখন পাঠালে তিনি তা' গ্রহণ না করে ফেরৎ দেন। হযরত নিজাম উদ্দিন (র.) তাঁর কাছ থেকে এ মহান ত্যাগের আদর্শ সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করেন যা' তাঁর পরবর্তী জীবনে দারুন প্রভাব বিস্তার করেছিল। বাদাউনে অবস্থান কালে হযরত নিজাম উদ্দিন (র.)'র প্রাথমিক শিক্ষা (কুদুরী) সমাপ্ত করেন এবং মাওলানা আলাউদ্দিন উসূলী থেকে দস্তারবন্দী পাগড়ী লাভ করেন। পাগড়ীর প্রতিটি পরত যখন মাওলানা উসূলী বৃত্তাকারে হযরত নিজাম উদ্দিন (র.) মাথায় বাঁধছিলেন, হযরত নিজাম উদ্দিন (র.) তখন বারবার উসূলীর প্রতি বিনয়ের নিদর্শন হিসেবে মস্তক অবনত করছিলেন। হযরত নিজাম উদ্দিন (র.)'র আড়ম্বরহীন দস্তারবন্দী অনুষ্ঠানে বাদাউনের বিখ্যাত ওলী আলী মওলা উপস্থিত ছিলেন। তিনি হযরত নিজাম উদ্দিন (র.)'র বিনয় ও ভদ্রতা দেখে বিমোহিত হয়ে যান এবং ভবিষ্যদ্বাণী করেন, হযরত নিজাম উদ্দিন (র.) উত্তরকালে একজন মহান ওলী হবেন।

হযরত নিজাম উদ্দিন (র.)'র শিক্ষক মাওলানা আলাউদ্দিন উসূলী যৌবনকালে একদা বাদাউনের পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। পথের ধারে একটি বাসায় শেখ জালাল উদ্দিন তাবরিজী অবস্থান করছিলেন। তিনি যুবক উসূলীকে দেখে বুঝতে পারলেন যে, এ যুবক ভবিষ্যতে একজন মস্ত বড় জ্ঞানী লোক হবেন। তিনি উসূলীর গায়ে নিজের পরিধেয় একটি কাপড় পরিয়ে দিলেন। এরপর থেকে উসূলী জ্ঞান অর্জনে বিশেষভাবে আগ্রহী হয়ে উঠেন এবং পরিণতঃ বয়সে বাদাউনের একজন বিশিষ্ট পন্ডিত ব্যক্তি হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। মাওলানা উসূলী সাধারণতঃ 'হিদায়া' এবং 'কুদুরী' কিতাব দু'টো থেকে হযরত নিজাম উদ্দিন (র.) কে পাঠদান করছিলেন। এমন সময় হযরত নিজাম উদ্দিন (র.) দেখতে পান যে, কতগুলো সোনালী সাপ গর্ত থেকে হিস্ হিস্ করে দৌড়ে আসছে। তিনি তাঁর পাগড়ীটি সাপগুলোর উপরে ছুঁড়ে মারলেন। তৎক্ষণাৎ সাপগুলো স্বর্ণমুদ্রার স্তূপে পরিণত হল। তিনি স্বর্ণমুদ্রাগুলো বর্জন করলেন। পরবর্তীকালে হযরত নিজাম উদ্দিন (র.) স্বপ্নে দেখলেন যে, এক অপরূপ সুন্দরী মহিলা তাঁর সামনে এসে উপস্থিত। তিনি মহিলাকে প্রত্যাখ্যান করলেন। এভাবে হযরত নিজাম উদ্দিন (র.) প্রাথমিক জীবনে সম্পদ ও লোভ-লালসাকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করলেন, যদিও তখন তাঁর পরিবার চরম দারিদ্র্যের মধ্যে নিপতিত ছিল। বলাবাহুল্য, বাদাউনে থাকাকালীন সময়ে এভাবে অতি অল্প বয়স থেকে বিভিন্ন ঘটনা ও আধ্যাত্মিক ব্যক্তিবর্গের প্রভাবে তাঁর জীবনে আধ্যাত্মিকতার বিকাশের সূচনা হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

দিল্লীতে প্রাথমিক পর্যায়ে অবস্থানকালে শেখ নিজাম (র.)'র জীবন সংগ্রাম ঃ শিক্ষাগত উৎকর্ষ সাধন ও দারিদ্র্যকে জয়

বাদাউনে ষোল বৎসর অতিবাহিত করার পর আয় ও বৃহত্তর সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন পরিবেশে উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য হযরত নিজাম উদ্দিন (র.) বাদাউন ত্যাগ করে দিল্লীতে আসার জন্য তাঁর মায়ের অনুমতি চাইলেন। তাঁর মা সহাস্য বদনে অনুমতি দিলেন এবং বাদাউনের সকল স্মৃতি মনে ধারণ করে কন্যা ও যুবক নিজাম উদ্দিন (র.)কে নিয়ে স্থায়ীভাবে দিল্লীতে চলে আসলেন। দিল্লীতে এসে বাদাউনের চাইতেও অধিকতর দরিদ্র অবস্থায় তাঁরা দিনাতিপাত করতে লাগলেন এবং দারিদ্র্যকে হাসিমুখে বরণ করে নিলেন। একস্থান থেকে অন্যস্থানে তাঁরা বাসা বদলাতে লাগলেন এবং চরম অস্থিতিশীলতা ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাঁরা কালাতিপাত করতে লাগলেন। কিন্তু যুবক নিজাম উদ্দিন (র.) হাল ছাড়লেন না। চরম প্রতিকূলতার মাঝেও দৃঢ় মনোবল ও ধৈর্য নিয়ে লেখাপড়া চালিয়ে যেতে লাগলেন। দিল্লীতে এসে প্রথমে 'সরাই নামাক' বা 'সরাই মিঞা বাজার' নামক সরাই খানায় তিনি তাঁর মা ও বোনকে বসবাসের ব্যবস্থা করলেন, যেহেতু তথায় পুরুষ থাকার ব্যবস্থা ছিলনা। যুবক নিজাম উদ্দিন (র.) সরাই খানার সামনে 'বারগাহ্-ই-কাওয়াজ' নামক স্থানে বসবাস শুরু করলেন। এ এলাকায় তিনি শেখ নজিব উদ্দিন মোতাওয়াক্কীল ও আমীর খসরুর সাক্ষাৎ পান – যাঁদের প্রথমোক্ত জন পরবর্তীকালে তাঁর উস্তাদ ও বন্ধু এবং শেষোক্ত জন তাঁর শিষ্য ও ভক্তে পরিণত: হন দিল্লীতে তখন দিনাতিপাত করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ছিল। সে সময়ে দুই সের আটার দাম ছিল এক জিতাল; কিন্তু এক জিতাল ও তাঁর হাতে বেশীরভাগ সময়ে থাকতনা। তাঁর মাতা ও বোন হাসিমুখে সকল কষ্ট বরণ করে নিলেন। যখন ঘরে কোন খাবার থাকতনা, তখন তাঁর মাতা বলতেন, 'আজ আমরা আল্লাহ্‌র মেহমান'। এ বাণীটি হযরত নিজাম উদ্দিন (র.)'র জীবনে দারুন প্রভাব ফেলেছিল। যখন খাবার কোন অভাব থাকতনা, তখন তিনি ঐ দিনটির অপেক্ষায় থাকতেন যখন তাঁর মা স্বর্গীয় শান্তনার বাণী শুনাবেন, 'নিজাম উদ্দিন! আমরা আল্লাহ্‌র মেহমান। হযরত নিজাম উদ্দিন (র.)'র কাছে তাঁর মায়ের এ বাণী অমিয় সুধা হিসেবে প্রতিভাত হোত। হযরত নিজাম উদ্দিন (র.)'র আধ্যাত্মিক রেয়াজত সাধনার ক্ষেত্রে তাঁর মাতাই ছিলেন অনুপ্রেরণার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

হযরত নিজাম উদ্দিন আওলিয় (র.)'র মাতা বিবি জোলায়খা এক অসাধারণ গুণবর্তী মহিলা ছিলেন। ছোটবেলায় প্রাচুর্যের মধ্যে বড় হয়ে বিবাহিত জীবনে বাস্তুহারা হয়ে বিদেশ-বিভূঁইয়ে এসে দারিদ্র্য পীড়িত অবস্থায় কঠোর ভোগান্তির মধ্যে কালাতিপাত করে ও তিনি এতটুকু বিচলিত ও ধৈর্যহারা হননি। অসীম সাহস ও ধৈর্য এবং খোদার উপর অগাধ আস্থা সহকারে তিনি সকল সমস্যার মোকাবেলা করেছেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল মাত্র একটাই– তাঁর একমাত্র ছেলে নিজামউদ্দিনকে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে। বস্তুতঃ হযরত নিজাম উদ্দিন (র.)'র নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ অর্জনের পশ্চাতে তাঁর মায়ের অবদান ছিল সবচেয়ে বেশী। একদা তাঁর মাতা বললেন, 'নিজাম উদ্দিন'! আমি তোমার মাঝে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি। একদিন তোমার কপাল ফিরবে। আল্লাহ্‌র হুকুমে তুমি মানুষের কপাল ফিরাবে। বালক নিজাম উদ্দিন জিজ্ঞাসা করলেন, 'সেটা কখন হবে?' বিবি জোলায়খা উত্তর দিলেন, 'যখন আমি থাকবনা'। বিবি জোলায়খা যখন প্রার্থনা করতেন, তখন তাঁর সাথে স্রষ্টার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপিত হয়ে যেত। একদা তাঁর ঝি-চাকর বাসা থেকে পালিয়ে যায়। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, 'ঝি-চাকর না আসা পর্যন্ত আমি আমার মাথায় দোপাট্টা পরবনা।' এ প্রতিজ্ঞা করার কিছুক্ষণ পর ঝি-চাকরটি ফিরে আসে। হযরত নিজাম উদ্দিন (র.) প্রায়শঃ বলতেন; তাঁর মাতা যখন খোদার কাছে কোন কিছু চাইতেন, সাথে সাথে তা' মঞ্জুর হয়ে যেত। প্রত্যেক চান্দ্রমাসের ১লা তারিখে নতুন চাঁদ দেখা মাত্র হযরত নিজাম উদ্দিন (র.) তাঁর মাতার পদ প্রান্তে মাথা রেখে অভিবাদন জানাতেন। এভাবে একদা অভিবাদন জানাবার সময় তাঁর মাতা হযরত নিজাম উদ্দিন (র.)কে বললেন, 'নিজাম উদ্দিন! আগামী মাস কার পদপ্রান্তে মাথা রেখে অভিবাদন জানাবে?' এ বাণী শুনার পর হযরত শেখ নিজাম উদ্দিন (র.) কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। অশ্রুসিক্ত নয়নে হযরত নিজাম উদ্দিন (র.) জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমাকে কার হেফাজতে রেখে যাবেন মা?' মাতা উত্তর দিলেন, 'আগামীকাল তোমার এ প্রশ্নের উত্তর দেব।' তাঁর মাতা তাঁকে চলে যেতে বললেন এবং শেখ নাজির উদ্দিনের বাসায় গিয়ে ঘুমোতে বললেন। প্রত্যুষে তাঁর মায়ের ঝি-চাকর দৌড়ে এসে হযরত নিজরম উদ্দিন (র.)কে খবর দিলেন যে, তাঁর মা তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছেন। হযরত নিজাম উদ্দিন (র.) তৎক্ষণাৎ কালবিলম্ব না করে তাঁর মায়ের কাছে গেলেন। তাঁর মুমূর্ষু মাতা বললেন, 'তোমার ডান হাত কোথায়?' হযরত নিজাম উদ্দিন (র.) তাঁর ডান হাত বাড়িয়ে দিলেন। তাঁর মাতা শেখ নিজাম উদ্দিন (র.) এর হাত তাঁর হাতে ধরলেন এবং বললেন, 'হে আল্লাহ্‌! আমি আমার ছেলেকে তোমার উপর ন্যস্ত করলাম।' এ কথা বলেই বিবি জোলায়খা শেষ নিঃশ্বস ত্যাগ করলেন । (ইন্না........রাজেউন)। হযরত নিজাম উদ্দিন (র.) প্রায়শঃ বলতেন, "আমার মাতা যদি সোনা এবং মণিমুক্তায় পরিপূর্ণ একটি ঘর আমাকে দিয়ে যেতেন আমি তাতে যতটুকু আনন্দ পেতাম, তার চাইতে অনেক বেশী আনন্দ পেয়েছি আমার শোকার্ত হৃদয়ে আমার মায়ের 'হে আল্লাহ্‌! আমি আমার পুত্রকে তোমার হাতে ন্যস্ত করলাম' –এই শান্তনা বাণী থেকে।" হযরত নিজাম উদ্দিন (র.) সারা জীবনব্যাপী অনুভব করেছেন যে, তিনি আল্লাহ্‌র তত্ত্বাবধানেই এবং সুরক্ষায় লালিত–পালিত হয়েছেন। কুতুব মিনার থেকে

এক মাইল দূরে উধ্চিনি (Udhchini) নামক ছোট্ট একটি গ্রামে বিবি জোলায়খা সমাহিত হন। যখনি হযরত নিজাম উদ্দিন (র.) কোনও সমস্যায় পড়তেন, তিনি তাঁর মায়ের সমাধি জেয়ারত করতেন এবং সমাধিতে বসে আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা জানাতেন। হযরত নিজাম উদ্দিন (র.) এর মাতার ইন্তিকালের পর পর তিনি বাসস্থানের সঙ্কটে পড়েন। এক দরবেশের পরামর্শে তিনি বিভিন্ন স্থানে (কখনও মসজিদে, কখনও সরাই খানায়, কখনও বন্ধুর বাসায়) বাসা বদলাতে থাকেন, কিন্তু কোথাও স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ পাননি বহুদিন। তিনি নদীর ধারে একটি নির্জন স্থানে বসবাসের প্রত্যাশী ছিলেন যাতে স্রষ্টার ধ্যানে নিজেকে মগ্ন রাখতে পারেন। তিনি হাউজে রাণী নামক একটি যায়গায় যান। সেখানে বাগ-ই-জাসরাত নামে একটি বাগান ছিল। বাগানের পাশে বসে তিনি স্রষ্টার কাছে ফরিয়াদ জানালেন, 'ওহে আমার প্রভূ! আমাকে অবশ্যই এই দিল্লী শহর ছাড়তে হবে। তবে সেটা আমার ইচ্ছায় নয়। তুমি যেখানে যেতে বল আমি সেখানেই যাব।' খোদার কাছে ফরিয়াদ জানাবার পর গায়েবী আওয়াজ আসল,' তুমি গিয়াসপুরে যাও।' সে সময়ে গিয়াসপুর ছিল একটি স্বল্প জন অধ্যূষিত অজপাড়াগাঁ। অবশ্য সুফি কায়কোবাদ যখন কিলুগড়ী (Kilugarhi)তে বসবাস শুরু করেন তখন গিয়াসপুরে জনসমাগম বৃদ্ধি পায়। জনতার ভিড় বেড়ে যাওয়ায় হযরত নিজাম উদ্দিন (র.) অপেক্ষাকৃত শান্ত পরিবেশে অন্যত্র বসতি স্থাপনের জন্য মনস্থ করেন। এ সময় তাঁর শিক্ষক মাওলানা আমিন উদ্দিন মারা যান এবং তাঁর জানাযায় অংশ গ্রহণের জন্য তিনি দিল্লী শহরে আসেন। তখন একজন হাল্কা-পাতলা গড়নের লোক (যাঁর চোখে মুখে স্বর্গীয় নুরানী আভা উদ্ভাসিত) তাঁর কাছে আসেন এবং সমাজ থেকে দূরে কোলাহলমুক্ত স্থানে হযরত নিজাম উদ্দিন (র.) এর উচ্ছার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। তিনি (ঐ ব্যক্তি) নিম্নোক্ত পংক্তিটি আবৃত্তি করেন:

'যেদিন তুমি চন্দ্রের মত আবির্ভূত
হয়েছিলে, তুমি কি জাননা যে
সেদিন এ ধরণী তোমার প্রতি
অঙ্গুলী নির্দেশ করেছিলো?'

আগন্তুক ব্যক্তিটি হযরত নিজাম উদ্দিন (র.)কে এমনভাবে আচরণ করতে বললেন যাতে শেষ বিচারের দিনে তাঁকে নবীজি (দ.) এর সম্মুখে লজ্জা পেতে না হয়। তিনি হযরত নিজাম উদ্দিন (র.)কে আল্লাহ্কে নিয়ে ব্যস্ত থাকার জন্য এবং আল্লাহ্র সৃষ্টিকে সেবা করার জন্য সাহসী হতে উৎসাহিত করেন। হযরত নিজাম উদ্দিন (র.) আগন্তক ব্যক্তিটির কথায় এত বেশী অনুপ্রাণিত হলেন যে, তিনি গিয়াসপুরে থেকে যাওয়াটাই সমীচিন মনে করলেন। তিনি আগন্তুক ব্যক্তিটির জন্য কিছু খাবার আনলেন, কিন্তু ব্যক্তিটি তা' স্পর্শ না করেই চলে গেলেন।

যখন ক্রমাগতভাবে বহুদিন ধরে বাধ্য হযরত নিজাম (র.) তিনি রোজা রাখতেন, তখন তাঁর ঘরের দরজায় একটি পেয়ালায় কিছু খাদ্য দ্রব্য রাখতেন। ইফতারের সময় পেয়ালাটি থেকে

খাবারগুলো নেয়া হোত এবং খাবার টেবিলে কাপড়ের উপর রাখা হোত। একদা এক ভিক্ষুক সে পথ দিয়ে যাচ্ছিল। টেবিলে খাবারগুলো দেখে সে সেগুলোকে উচ্ছিষ্ট খাবার মনে করল এবং সব খাবার তার থলেতে ভরে চলে গেল। হযরত নিজাম উদ্দিন (র.) মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসলেন এবং বললেন, 'আমার মনে হয় আমাদের কাজে এখনও অপূর্ণতা আছে এবং সে কারণেই আমরা ক্ষুধার্ত রয়ে গেছি।' প্রাথমিক অবস্থায় হযরত নিজাম উদ্দিন (র.) এর দু'জন শিষ্য তাঁর সেবায় নিয়োজিত ছিল। হযরত নিজাম উদ্দিন (র.)'র বাসার নিকটে একজন ধার্মিক মহিলা ছিল যে সূতা তৈরী করে (Spinning thread) তার জীবিকা নির্বাহ করত। সে যা' আয় করত তা' দিয়ে ময়দা কিনে নিত এবং ইফতারের সময় রুটি বানিয়ে খেত। একদা যখন পর পর চারদিন হযরত নিজাম উদ্দিন (র.) এবং তাঁর শিষ্যদ্বয় কোন কিছু না খেয়ে ছিলেন, তখন সে দেড় সের ময়দা পাঠিয়ে দিল। হযরত নিজাম উদ্দিন (র.) তাঁর শিষ্য কামাল উদ্দিনকে ময়দাগুলো পানির সাথে মিশিয়ে সিদ্ধ করতে বললেন। ময়দাগুলো পুরোপুরি সিদ্ধ হবার আগেই একজন দরবেশ তথায় আসলেন এবং চিৎকার দিয়ে বললেন, 'যদি তোমাদের কাছে কোন খাবার থাকে, তা' আমাকে দাও।' হযরত নিজাম উদ্দিন (র.) দরবেশকে ময়দাগুলো সিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বললেন, কিন্তু দরবেশের ধৈর্য মানেনা। হযরত নিজাম উদ্দিন (র.) তাঁর জামার হাত গুটিয়ে পাত্রে সিদ্ধ হতে থাকা ময়দাগুলো দরবেশের সামনে নিয়ে আসলেন। দরবেশ পাত্রটি উপরে তুলে ধরলেন এবং ময়দাসহ পাত্রটি মাটিতে উপুড় করে ফেলে দিয়ে বললেন, শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জেশকর (র.) হযরত শেখ নিজাম উদ্দিন (র.)কে আধ্যাত্মিক ফয়েজ দান করেছেন। আমি তাঁর বস্তুগত দুনিয়াবী দারিদ্র্যের পাত্র ভেঙ্গে দিলাম।' এ ঘটনার পর থেকে হযরত নিজাম উদ্দিন (র.) এর শিষ্য সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পায় এবং চতুর্দিক থেকে তাঁর জন্য হাদিয়া, মান্না-সালওয়া আসতে থাকে।

এ প্রসঙ্গে আমির খুরদ কর্তৃক বর্ণিত একটি ঘটনা উল্লেখ করা সমীচিন মনে করছি। কতক ব্যক্তি দিল্লীতে হযরত নিজাম উদ্দিন (র.)'র সাথে দেখা করার জন্য চান্দেরী থেকে রওয়ানা হল। পথে মাওলানা ওমর নামক এক ব্যক্তির সাথে তাদের দেখা হয়। মাওলানা তাদেরকে কোথায় যাওয়া হচ্ছে এবং কার কাছে যাওয়া হচ্ছে জিজ্ঞাসা করলেন। তারা উত্তর দিল যে, তারা দিল্লীতে হযরত নিজাম উদ্দিন (র.)'র সাথে দেখা করতে যাচ্ছেন। মাওলানা বললেন, ঐ গরীব লোকটির কাছে তোমাদেরকে দেয়ার মত কিছু আছে কি? আমার থেকে বারটি জিতাল (মুদ্রা) নিয়ে যাও। মুদ্রাগুলো তাঁকে দিও।'

এরপর থেকে হযরত নিজাম উদ্দিন (র.)'র কাছে হাদিয়া-নজরানা বিপুলভাবে আসতে থাকে। হাদিয়া-নজরানাগুলো তাঁর সমস্যার সমাধানের জন্য নয়, বরঞ্চ মানুষের সমস্যার সামাধানের জন্যই এ পর্যায়ে আসা শুরু করে যা' তাঁর আধ্যত্মিকতার শক্তিকে উত্তরোত্তর বাড়িয়ে দেয়। হযরত নিজাম উদ্দিন (র.) যখন দিল্লীতে আসলেন তখন সুলতান নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাসন ক্ষমতায় সমাসীন। সে সময়ে বিশিষ্ট পন্ডিতবর্গ, কবি, সুফি এবং

কারুশিল্পী মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে দিল্লীতে এসে আশ্রয় চেয়েছিলেন। ফলে তাঁদের সংস্পর্শে এসে হযরত নিজাম উদ্দিন (র.)'র জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বুৎপত্তি অর্জিত হয়।

হযরত নিজাম উদ্দিন (র.) বস্তুগত মোহ বা আসক্তিকে পছন্দ করতেন না। একদা তাঁর এক শিক্ষকের পুত্র কাজী পদে নিয়ুক্তি পাওয়ায় শিক্ষক প্রচন্ড খুশী হলেন এবং বললেন, 'হে খোদা! তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। এতদিন ধরে আমার যে কামনা ছিল তা' আজ পূর্ণ হল।' শিক্ষকের দুনিয়াবী লোভের প্রতি আসক্তি দেখে হযরত নিজাম উদ্দিন (র.) তৎক্ষণাৎ তার সঙ্গ ত্যাগ করলেন। অন্য আর একটি ঘটনা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। খাজা সাম্ছ-উল-মূল্ক তাঁর প্রিয় শিক্ষকদের অন্যতম ছিলেন। বলবন তাঁকে খাজাঞ্জী (Mustaufi-i-Mumalik) নিযুক্ত করেন। তিনি এ পদে থেকে প্রচুর স্বর্ণ মজুদ করতে সক্ষম হন। চাকুরীর শেষ দিকে তাঁর জন্য দূর্যোগ উপস্থিত হয়। সুলতান বলবন তাঁর সমস্ত সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার আদেশ দেন। সাম্ছ-উল-মুল্ক সম্পদ হারিয়ে হতাশ হলেন এবং আফসোস্ করতে লাগলেন। বস্তুগত সম্পদের প্রতি তাঁর শিক্ষকের এরূপ আসক্তিকে তিনি পছন্দ করতে পারলেন না। তিনি সাম্ছ-উল-মুল্কের এরূপ আচরণে ব্যথিত হলেন এবং তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করলেন।

হযরত নিজাম উদ্দিন (র.) ফিকাহ্ ও হাদীস শাস্ত্রে সুপন্ডিত ছিলেন। বাদাউনের মাওলানা আলাউদ্দিন উসূলী এবং দিল্লীর মাওলানা কামাল উদ্দিন জাহিদ এর নিকট থেকে তিনি যথাক্রমে, ফিকাহ্ ও হাদীস শাস্ত্রে বুৎপত্তি লাভ করেন এবং নিয়মিতভাবে সেমিনার, বিতর্ক ও আলোচনা সভার মাধ্যমে তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে এ দু'টি ক্ষেত্রে জ্ঞান দান করেন। উল্লেখ্য যে, তাঁর শিক্ষলদ্বয় যথাক্রমে, মাওলানা আলাউদ্দিন উসূলী ও মাওলানা কামাল উদ্দিন জাহিদ নির্লোভ ও ত্যাগী আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়

হযরত শেখ ফরিদ উদ্দিন গজ্ঞে শকর (র.)'র সান্নিধ্যে হযরত নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.)

বাদাউনে থাকাকালীন সময়ে হযরত নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.) হযরত শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জেশকর (র.) (১১৭৫-১২৬৫) এর নাম শুনতে পান যাঁর অজোধানে (Ajodhan) অবস্থিত 'জামাত খানা' মধ্যযুগীয় ভারতে আধ্যাত্মিক কর্মকান্ডের একটি প্রসিদ্ধ কেন্দ্র ছিল। যেহেতু অজোধান [পরবর্তীতে পাকপত্তন (Pakpattan) হিসেবে পরিচিত] ছিল বিভিন্ন দিক থেকে আসা রাস্তাসমূহের সংযোগস্থল বা জংশন, সেহেতু সর্বস্তরের মানুষ (যথাঃ রাজা, বিশিষ্ট উপাধিধারী ব্যক্তিবর্গ, সেনাসদস্য, পন্ডিত ব্যক্তি, বণিকদল প্রভৃতি) হযরত ফরিদ উদ্দিন গঞ্জেশকর (র.) এর দরবারে আসতেন এবং তাঁর দোয়া নিতেন। নিম্নোক্ত দু'টো ঘটনা থেকে শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জেশকর (র.) এর জনপ্রিয়তা ও মর্যাদা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ ধারণা পাওয়া যাবে ঃ-

প্রথমত: তিনি যখন তাঁর মুর্শিদ হযরত শেখ কুতুব উদ্দিন বখতিয়ার কাকী (র.) এর ওফাতের পর দিল্লীতে আসেন, তখন দর্শনার্থী ও শুভার্থীদের ভিড়ে তিনি অবরুদ্ধ হয়ে যান। সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত তিনি ভক্তদের আকুতি শুনেন এবং তাদের বাসায় খাবারের জন্য আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। তাঁকে শুক্রবারে জুমার নামায পড়ার জন্য খুব সকালে রওয়ানা হতে হোত, কেননা পথিমধ্যে ভক্তদের ভিড়ে যথাসময়ে মসজিদে যাওয়া কঠিন ঠিল। ঘর থেকে বের হওয়া মাত্রই লোকজন দৌড়ে তাঁর কাছে আসত, তাঁর হাত মোবারক চুম্বন করত এবং তাঁকে য়িরে ধরত। ফলে মসজিদে না পৌঁছা পর্যন্ত লোকদের আর্জি শুনতে শুনতে তিনি ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে যেতেন।

দ্বিতীয়ত: ১২৫১ সালের শাওয়াল মাসে সুলতান নাছির উদ্দিন মাহমুদ তাঁর সেনাবাহিনীকে উচ্ছ ও মুলতানের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করতে নির্দেশ দেন। পথিমধ্যে সৈন্যরা হযরত শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জেশকর (র.) এর নিকট থেকে দোয়া নেবার জন্য তাঁর দরবারে যেতে মনস্থ করে। সৈন্যরা যখন অজোধানের শহরে আসল, তখন শহরের সকল রাস্তা ও বাজার অবরুদ্ধ (blocked) হয়ে গেল। সবাই চেষ্টা করতে লাগল বাবা ফরিদ (র.) এর দর্শন পাবার জন্য। বাবা ফরিদ (র.) এর জামার একটি টুকরা বা অংশ উন্মুক্ত রাস্তায় টাঙ্গিয়ে দেয়া হল। জনসমূদ্র জামার অংশটি স্পর্শ করার জন্য সামনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। জামার

অংশটি জনতার হাতের স্পর্শে খন্ড বিখন্ড হয়ে গেল। বাবা ফরিদ (র.) অবস্থা বেগতিক দেখে তিনি তাঁর মুরিদদেরকে তাঁর চতুর্পাশে ঘিরে রাখতে বললেন যাতে জনতার ভিড়ে তিনি পিষ্ট হয়ে না যান।

বলাবাহুল্য, বিগত অর্ধ শতাব্দী ধরে বাবা ফরিদ (র.) এর আধ্যাত্মিক কর্মকান্ডের বিস্ময়কর ফলাফলই তাঁকে তখন জনপ্রিয়তার শীর্ষে এরূপ অবস্থায় নিয়ে গিয়েছিল। হযরত শেখ নিজামউদ্দিন (র.) এর বয়স যখন বার বৎসর তখন তিনি বাদাউনে থাকাকালীন সময়ে সর্ব প্রথম হযরত শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জেশকর (র.) এর নাম শুনেন। হযরত নিজাম উদ্দিনস (র.) যখন শব্দ কোষ অধ্যয়ন করছিলেন, তখন আবু বকর খাররাত নামক একজন বাদ্যযন্ত্র বাদক তাঁর শিক্ষককে দেখতে আসেন এবং মূলতান ও অজোধানে তার সফরের বর্ণনা দিতে আরম্ভ করেন। জনাব আবু বকর খাররাত শেখ বাহাউদ্দিন জাকারিয়ার ধর্মীয় অনুরাগ ও ধ্যান সম্পর্কে বর্ণনা করেন এবং বলেন, তাঁর খানকাহ্ আধ্যাত্মিকতায় এত বেশী ভরপুর থাকে যে, এমনকি তাঁর চাকরাণী ও ময়দা পিষতে পিষতে আল্লাহ্‌র জিকিরে রত থাকে। অত:পর লোকটি (আবু বকর খাররাত) হযরত শেখ ফরিদ গঞ্জেশকর (র.) এর খানকাহ্ সম্পর্কে বর্ণনা দিতে থাকেন। হযরত শেখ নিজাম উদ্দিন (র.) অত্যন্ত মনোযোগের সাথে তাঁর বর্ণনা শ্রবণ করেন এবং শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জেশকর (র.)'র প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যান। হযরত নিজাম উদ্দিন (র.)'র হৃদয়ে তাঁর (শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জেশকর) প্রতি এত প্রবল মহব্বত সৃষ্টি হয় যে, তিনি প্রতি ওয়াক্ত নামাযের পরে অন্তত: দশবার করে তাঁর নাম উচ্চারণ করে দোয়া করা বাধ্যতামূলক নিয়মে পরিণত: করেন। হযরত শেখ ফরিদ (র.) কে প্রতিনিয়ত স্মরণ করার মধ্যে হযরত নিজাম উদ্দিন (র.) অপূর্ব আধ্যাত্মিকতার ঘ্রাণ অনুভব করেন। শৈশবকালে বাবা ফরিদ (র.)'র জন্য তাঁর অন্তরে যে ভালবাসা জাগ্রত হয় সে ভালবাসাই পরবর্তীকালে তাঁকে আধ্যত্মিক সাফল্যের চরম শিখরে নিয়ে যায়। যখন শেখ নিজাম (র.) দিল্লীর পথে তাঁর আত্মীয় উজ্‌কে সাথে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন পথিমধ্যে ডাকাত বা বন্য প্রাণীর ভয়ে ভীত হয়ে উজ্ বলতে থাকল, 'ওহে মুরশিদ! আমাদেরকে আল্লাহ্‌র হুকুমে রক্ষা কর।' হযরত শেখ নিজাম (র.) তাঁর (উজ্ এর) পীর কে জানতে চাইলে উজ্ জানায় যে, তাঁর পীর হল শেখ ফরিদ (র.)। এর ফলে শেখ ফরিদ (র.)'র প্রতি হযরত শেখ নিজাম (র.)'র মহব্বত বা ভালবাসা আরও বৃদ্ধি পায়।

ভাগ্যের কি অপূর্ব লিখন! হযরত শেখ নিজাম (র.) যখন দিল্লীতে আসলেন, তিনি জানতে পারলেন যে, তাঁরই মহল্লায় শেখ নাজির উদ্দিন মোতাওয়াক্কিল নামক একজন অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ দরবেশ বাস করেন যিনি দারিদ্র্যকে আল্লাহ্‌র রহমত হিসেবে বরণ করে নিয়েছেন। বলা বাহুল্য, এই দরবেশ হলেন শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জেশকর (র.)'র ছোট ভাই। জীবনের প্রথমভাগে একজন তুর্কী পদস্থ কর্মচারী একটি মসজিদ নির্মাণ করে তাঁকে তা তদারকির দায়িত্ব প্রদান করেন এবং তাঁর বসবাসের জন্য একটি বাড়ী ও প্রদান করেন। এ তুর্কী কর্মকর্তার নাম হল ইৎমাত্। ইৎমাত্ তাঁর মেয়ের বিয়েতে আড়াই লাখ টংকা (তৎকালীন

ভারতে প্রচলিত মুদ্রা) খরচ করেন অত্যন্ত আড়ম্বরের সাথে। শেখ নাজির উদ্দিন ইৎমাতের এ অপব্যয়ের সমালোচনা করেন। ফলে শেখ নাজির উদ্দিনকে ইৎমাত্ উক্ত দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেন এবং পরিণামে তাঁকে অতিশয় দারিদ্র্য অবস্থায় কালাতিপাত করতে হয় জীবনের সত্তর বৎসর ধরে। তাঁর স্ত্রী ও দুই পুত্রকে নিয়ে একটি জীর্ণ কুচিরে তিনি দিল্লীতে জীবন অতিবাহিত করেন। এমনকি ঈদের দিনেও দর্শনার্থীদেরকে এক গ্লাস পানি ছাড়া আর কিছু খেতে দিতে পারতেন না। বিবি ফাতিমা শাম নামে একজন ধর্মপ্রাণ তাপসী মহিলা তাঁর ক্ষুধা ও উপবাসের যন্ত্রণা থেকে তাঁকে রেহাই দেয়ার জন্য সহায়তা করতেন। শেখ নাজির তাঁকে বোন বলে ডাকতেন, যে তাঁকে রুটি বানিয়ে খাওয়াতো। এ মহান দরবেশ শেখ নাজির উদ্দিনের সান্নিধ্য লাভ করে হযরত শেখ নিজাম উদ্দিন (র.) তাঁর জীবনকে আধ্যাত্মিক রঙ্গে রঞ্জিত করতে সমর্থ হন। হযরত শেখ নিজাম উদ্দিন (র.) দিল্লীতে তাঁর শিক্ষা সমাপনান্তে কাজী পদে নিযুক্তি পাওয়ার জন্য তাঁর অন্যতম শিক্ষাগুরু শেখ নাজির উদ্দিনের দোয়া প্রার্থনা করলেন। উল্লেখ্য, তৎকালে কাজী পদ প্রাপ্তিকে পন্ডিত ব্যক্তিরা সৌভাগ্যের বিষয় বলে মনে করতেন। শেখ নাজির উদ্দিন বললেন, 'কাজী হওয়া উচিৎ হবেনা। অন্য কিছু হবার জন্য চেষ্টা কর।' শেখ নাজির উদ্দিনের কথায় হযরত শেখ নিজাম উদ্দিন (র.) হতাশ হলেও পরবর্তীকালে তাঁর সম্মুখে বহুমুখী আধ্যাত্মিকতার সম্ভাবনাময় দ্বার উন্মুক্ত হওয়ায় তিনি শেখ নাজিরের 'না' বলার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে, আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ অর্জনের তুলনায় দুনিয়াবী সাফল্য ও সরকারী চাকুরী অতি তুচ্ছ। সুতরাং শেখ নিজাম উদ্দিন (র.) অজোধানে শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জেশকর (র.)'র খানকাহ্ শরীফে যাওয়াটাই সমীচিন মনে করলেন। তিনি অজোধানে যাবার জন্য হঠাৎ করে নাটকীয়ভাবে সিদ্ধান্ত নিলেন। এমন সময় একদা ভোর রাত্রে তিনি যখন দিল্লী জামে মসজিদে নামায পড়ছিলেন তখন মুয়াজ্জিন পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত আবৃত্তি করছিলেন যা' শেখ নিজাম (র.)'র অন্তরে খোদা প্রেমের ঝড় তোলে এবং মহব্বতের আগুন জ্বেলে দেয়। তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। কোন সহায়সম্বল জোগাড় না করে অনতি বিলম্বে অজোধান যাবার উদ্যোগ নিলেন। তাঁর অন্তরে পবিত্র কুরআনে যে আয়াতটি এরূপ জজ্‌বা সৃষ্টি করেছিল তা' নিম্নরূপ:

বিশ্বাসীদের কলব (অন্তর) অতি বিনম্র
চিত্তে আল্লাহ্‌র জিকিরে মশ্‌গুল থাকার
সময় কি আসে নাই?'
(আল কুরআন: ৫৭:১৬)।

শেখ নিজাম উদ্দিন (র.) যখন অজোধানে শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জেশকর(র.)'র জীর্ণ শীর্ণ কুটিরে পৌঁছলেন তখন দিনটি ছিল বুধবার এবং তাঁর বয়স হয়েছিল বিশ বৎসর। অন্যদিকে শেখ ফরিদ (র.)'র বয়স হয়েছিল প্রায় নব্বই বৎসর এবং তাঁর আধ্যাত্মিকতার খ্যাতি সারা

ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছিল। শেখ নিজাম (র.) চঞ্চল ও দিশেহারা হয়ে পড়লেন। শেখ ফরিদ (র.) তাঁকে নিম্নোক্ত বাক্যদ্বয় উচ্চারণ করে অভ্যর্থনা জানালেন:

“তোমার বিচ্ছেদের আগুন অনেক অন্তর দগ্ধ করেছে।
তোমার সাথে মিলিত হবার
উদগ্র বাসনা অনেক জীবনকে তছ্নছ্ করে দিয়েছে।”

অনেক সাহসে ভর করে শেখ নিজাম উদ্দিন (র.) বললেন, ‘আমি আপনার [শেখ ফরিদ (র.)]’র চরণে চুমু দিতে চাই।’ অশিতিপর বৃদ্ধ দরবেশ শেখ নিজামের দিকে তাকালেন এবং বললেন, ‘প্রত্যেক নবাগতই একটু চাঞ্চল্য বোধ করেন।’ তিনি শেখ নিজামকে শান্ত হতে বললেন। তিনি শেখ নিজামের জন্য একটি খাটের ব্যবস্থা করতে তাঁর খানকাহ্‌র ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত একজন সিনিয়র শিষ্যকে নির্দেশ দিলেন। হযরত নিজাম উদ্দিন (র.) দেখলেন যে, সকল সিনিয়র শিষ্য, ভক্ত ও দরবেশদের জন্য মাটিতে বিছানা পাতানো হয়েছে, অথচ তাঁকে খাটে শুইতে বলা হচ্ছে। এতে তিনি একটু বিব্রত বোধ করতে লাগলেন। যখন মাওলানা বদরুদ্দীন ইস্‌হাক বিষয়টি জানতে পারলেন, তখন তিনি শেখ নিজাম উদ্দিনকে নিম্নোক্তভাবে খবর পাঠালেন:

‘তুমি কি তোমার গুরুর (শেখ ফরিদ)
আদেশ মেনে চলবে?’

শেখ নিজাম (র.) আর কোন উচ্চবাচ্য না করে খাটে ঘুমিয়ে পড়লেন। হযরত শেখ ফরিদ (র.) সাধারণত: কাউকে বায়াত করানোর আগে তার মাথার চুল ফেলে দিতে বলতেন। কিন্তু শেখ নিজাম উদ্দিনের বেলায় এর ব্যতিক্রম ঘটালেন। তিনি শেখ নিজামকে মাথার চুল রাখা অবস্থায় বায়াত করালেন। শেখ নিজামের চুল ছিল লম্বা এবং কোঁকড়ানো। এ ধরণের চুলের প্রতি শেখ নিজামের আকর্ষণ থাকতে পারে। তাই সম্ভবত: তাঁকে শেখ ফরিদ (র.) চুল ফেলতে বলেননি। কিন্তু শেখ নিজাম যখন দেখলেন যে, তাঁর সহপাঠি অন্যান্য শিষ্যরা মাথার চুল মুন্ডন করেছেন, তখন তিনি নিজেকে অপরাধি মনে করলেন এবং শেখ ফরিদ (র.)’র নিকট মাথা মুন্ডনের জন্য অনুমতি চাইলেন। শেখ ফরিদ (র.) তাঁকে নির্দ্বিধায় অনুমতি দিলেন। পরবর্তীকালে শেখ নিজাম (র.) তিন বৎসরে মোট তিনবার তাঁর মুর্শিদের কাছে গিয়েছিলেন এবং প্রতিবার কয়েকমাস যাবত তাঁর মুর্শিদের সান্নিধ্যে থেকেছিলেন। এভাবে শেখ নিজাম (র.) তাঁর মুর্শিদের সান্নিধ্যে থেকে আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। বাবা ফরিদ (র.)’র সাথে শেখ নিজাম (র.)’র অনেক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা আছে। সব ঘটনা এখানে বিবৃত করা সম্ভব নয়। তবে কিছু কিছু ঘটনা বর্ণনা না করলেই নয়। কারণ এ সকল ঘটনার মনসস্তাত্ত্বিক ও নৈতিক তাৎপর্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

শেখ নিজাম (র.)'র মনে দু'টো বিষয় নিয়ে দ্বন্ধ দেখা দেয়– (১) তিনি কি লেখাপড়া চালিয়ে যাবেন, নাকি ছেড়ে দেবেন? এবং (২) তিনি কি সম্পূর্ণরূপে আত্মার পরিশুদ্ধি অর্জনের জন্য একাগ্রচিত্তে লেখাপড়ার পাশাপাশি সাধনা করবেন, নাকি লেখাপড়া বা ছাত্রত্ব বাদ দিয়ে কলবের সাধনায় মনোনিবেশ করবেন? বাবা ফরিদ (র.) তাঁকে বললেন, 'আমি' কখনও কাউকে লেখাপড়া ছেড়ে দিতে বলিনা। একজন দরবেশের জন্য জ্ঞানার্জন অবশ্যই প্রয়োজন। সুতরাং লেখাপড়া ও আধ্যাত্মিক সাধনা উভয়টি চালিয়ে যাও যতক্ষণ পর্যন্ত আধ্যাত্মিক সাধনা অধ্যয়ন বা লেখাপড়াকে অতিক্রম না করে।'

বাবা ফরিদ (র.) শেখ নিজাম উদ্দিনকে আধাত্মিকতার শ্রেষ্ঠ মোকাম অর্জনের জন্য তাঁর (বাবা ফরিদের) ত্বরিকার কিছু মৌলিক নীতিমালা শিক্ষা দিলেন এবং তাঁর জীবনাচরণের দৃষ্টান্তগুলো অনুসরণের জন্য উপদেশ দিলেন। দিল্লীতে থাকাকালীন শিক্ষাগত সনদ অর্জনের ফলে শেখ নিজামের অন্তরে যে গৌরবজনক মনোভাব সৃষ্টি হয়েছিল তা সম্পূর্ণরুপে বর্জনের মাধ্যমে সুফিদের পরিশুদ্ধ আত্মা লাভ করার জন্য তিনি শেখ নিজাম (র.)কে পরামর্শ দেন যাতে শেখ নিজাম (র.) মানবতার আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধনের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিতে পারেন। বলা বাহুল্য, শেখ নিজাম (র.) বাবা ফরিদের উপদেশ গুলো অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন। ফলে মাত্র তেইশ বৎসর বয়সের যুবক শেখ নিজামকে বাবা ফরিদ (র.) তাঁর প্রধান খলীফা হিসেবে নিয়োগ প্রদান করেন। বাবা ফরিদের সান্নিধ্যে থেকে তিনি একজন সুফি সাধকের যে সকল গুণাবলী অর্জন করেন তার কয়েকটি নিম্নে প্রদত্ত হলঃ-

(১) শেখ নিজাম (র.) বাবা ফরিদের কাছ থেকে পবিত্র কুরআন মজিদের ছয় পারা, 'আওয়ারিফ উল মা'আরিফ' গ্রন্থের পাঁচটি অধ্যায় এবং আবু সাকুর সেলিমী কর্তৃক প্রণীত তামহিদাত আল মুহ্তাদী' গ্রন্থ সম্পর্কে শিক্ষালাভ করেন। কুরআন শরীফের বাকী পারাগুলো ও আওয়ারিফ উল মা 'আরিফ' গ্রন্থের বাকী অধ্যায়গুলো পড়াশুনার ভার শেখ নিজামের হাতে বাবা ফরিদ (র.) ছেড়ে দেন এবং শেখ নিজামকে একটি আধ্যাত্মিক যোগ্যতার সনদ প্রদান করেন।

বাবা ফরিদ (র.) মনে করেন যে, মানব হৃদয়ে আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও প্রেরণা জাগ্রত করার জন্য পবিত্র কুরআন মজিদকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করা উচিৎ। বাবা ফরিদের খানকাহ্ (জামাত খানা) সর্বদা পবিত্র কুরআন আবৃত্তি কারকদের সুমধুর স্বরে মুখরিত থাকত। বাবা ফরিদের অনুপ্রেরণায় পরবর্তীতে শেখ নিজাম (র.) সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ মুখস্থ করেন এবং দিল্লীতে নিজের খানকাহ্তে কুরআন অধ্যয়নের রীতি চালু করেন। 'আওয়ারিফ উল মা'আরিফ' গ্রন্থের লেখক শেখ শিহাব উদ্দিন সোহ্রাওয়ার্দী (র.) এর প্রতি বাবা ফরিদ গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। এই গ্রন্থটির বাস্তব ও ব্যবহারিক গুরুত্ব অত্যধিক। যাঁরা খানকাহ্ পরিচালনা করেন তাঁদের জন্য এই গ্রন্থটি খুবই প্রয়োজন। যেদিন এ গ্রন্থটি বাবা ফরিদের হস্তগত হয়, সেদিনই বাবা ফরিদ (র.)'র একটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। বাবা ফরিদ সন্তানটির নাম

রাখলেন শিহাব উদ্দিন। 'তামহিদাত' হল ইসলামী আইন বা ফিকাহ্ শাস্ত্রসম্বলিত পুস্তক। যে এ পুস্তকটি অধ্যয়ন করবে, ইসলামী ফিকাহ্ শাস্ত্র সম্পর্কে তার গভীর জ্ঞান অর্জিত হবে।

(২) কিভাবে বাবা ফরিদের চিন্তাপ্রসূত বুদ্ধিমত্তা (intuitive intelligence)' তাঁর শিষ্যের চরিত্রে সংক্রমিত হোত তা' নিম্নোক্ত ঘটনা থেকে বুঝা যায়। বাবা ফরিদ (র.) যখন হস্তলিখিত পাভুলিপি থেকে 'আওয়ারিফ উল মা'আরিফ' শিক্ষা দিতেন, তখন খুব ধীরে ধীরে পড়াতেন কারণ পাভুলিপিটির বিভিন্ন পৃষ্ঠায় যে সকল ভুল ছিল তা' তিনি শুদ্ধ করে নিতেন। একদা শেখ নিজাম (র.) পাঠদানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে যান এবং বলেন, শেখ নাজির উদ্দিন মোতাওয়াক্কিল এর নিকট একটি ভাল পাভুলিপি আছে যাতে ভুল নাই। বাবা ফরিদ বিরক্ত হলেন এবং বললেন, 'আমার মত দরবেশের কাছে ভুল পাভুলিপি সংশোধন করার কোন ক্ষমতা নাই?' শেখ নিজাম (র.) যখন বুঝতে পারলেন যে, তাঁর মুর্শিদ তাঁর মন্তব্যে খুশী হননি, তখন তিনি বাবা ফরিদের পায়ে লুটিয়ে পড়লেন এবং তাঁর বেয়াদবীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। কিন্তু বাবা ফরিদের রাগ কমলনা। শেখ নিজাম (র.) দুঃখে কাতর হয়ে পড়লেন। তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে অঝোর ধারায় কাঁদতে লাগলেন। এক পর্যায়ে তিনি আত্মহত্যা করার চিন্তা করলেন। বাবা ফরিদের ছেলে শিহাব উদ্দিন শেখ নিজামের বন্ধু ছিলেন। তিনি শেখ নিজামের মানসিক অস্থিরতা দেখে বিষণ্ন হলেন, তিনি তাঁর বাবা শেখ ফরিদ (র.) কে শেখ নিজামের অবস্থা বর্ণনা করলেন এবং শেখ নিজামকে ক্ষমা করে দেয়ার জন্য রাজী করালেন। বাবা ফরিদ (র.) শেখ নিজামকে তাঁর (বাবা ফরিদের) সামনে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, আমি এসব করেছি তোমার পূর্ণতা অর্জনের জন্য। একজন পীর হচ্ছে কনেদের সাজসজ্জাকারী (dresser of brides)। এ কথা বলে তিনি তাঁর বিশেষ পোষাকটি শেখ নিজামকে পরিয়ে দিলেন। শেখ নিজামের মন্তব্যটি মোটেও দোষের ছিলনা। কিন্তু বাবা ফরিদ (র.) এতে উত্তেজিত হয়ে দেখাতে চাইলেন যে, দিল্লীতে থাকাকালীন শেখ নিজাম (র.) যে বিদ্যা ও খ্যাতি অর্জন করেছেন তাঁর কোন অহমিকা যেন তাঁর অন্তরে স্থান না পায়।

(৩) একদিন দিল্লী থাকাকালীন এক সহপাঠির সাথে অজোধানে শেখ নিজামের দেখা হয়। তিনি (সহপাঠি) একটি সরাইখানায় অবস্থান করছিলেন এবং তাঁকে দেখাশুনা করার জন্য একজন ভৃত্যও তাঁর সাথে ছিল। শেখ নিজামকে জীর্ণশীর্ণ পোষাক পরিহিত অবস্থায় দেখে বন্ধুটি আফসোস্ করে বললেন, মাওলানা নিজাম উদ্দিন! তোমার এ দুর্দশা কেন? তুমি যদি দিল্লীতে শিক্ষকতা করতে, তাহলে তুমি একজন বিখ্যাত পন্ডিত হিসেবে খ্যাতি লাভ করতে এবং তোমার আর্থিক অবস্থাও অনেক ভাল হতো। শেখ নিজাম (র.) উত্তরে কিছু বললেন না, কিন্তু বাবা ফরিদকে বিষয়টি জানালেন। বাবা ফরিদ (র.) বললেন, "তোমার যদি সহপাঠির সাথে দেখা হয়, তাহলে তাঁকে নিম্নোক্ত কথাগুলো শুনিয়ে দেবেঃ–

"তুমি আমার সফর সঙ্গী নও। তোমার পথে তুমি যাও। জীবনে সমৃদ্ধির অংশটা তোমার হোক এবং দুর্দশার অংশটা হোক আমার।"

অতঃপর বাবা ফরিদ (র.) শেখ নিজাম (র.) কে রান্নাঘর থেকে কিছু খাবার আনতে বললেন এবং মাথায় বহন করে তাঁর বন্ধুর কাছে নিয়ে যেতে বললেন। বন্ধুটি বাবা ফরিদ (র.) কে দেখতে আসলেন এবং বাবা ফরিদের আধ্যাত্মিকতা চর্চার রীতি দেখে এত বেশী মুগ্ধ হলেন যে, তিনি বাবা ফরিদের ত্বরিকায় দীক্ষা নিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

(৪) একদা একজন বৃদ্ধ লোক বাবা ফরিদের কাছে আসলেন এবং বললেন যে, শেখ কুতুব উদ্দিন বখতিয়ার কাকী (র.)'র খানকাহ্‌তে বৃদ্ধলোকটির সাথে বাবা ফরিদের দেখা হয়েছিল। বৃদ্ধলোকটি তাঁর ছেলেটিকে সাথে নিয়ে এসেছিলেন যে ছিল রগচটা, অসভ্য ও অমার্জিত। সে বাবা ফরিদের সাথে উগ্রভাবে কথাবার্তা বলতে শুরু করে এবং উচ্চস্বরে চীৎকার দিতে থাকে। শেখ নিজাম (র.) এবং বাবা ফরিদের ছেলে মাওলানা শিহাব উদ্দিন দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। যখন তাঁরা ছেলেটির রুক্ষ্ম আওয়াজ শুনতে পেলেন, তখন মাওলানা শিহাব উদ্দিন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন এবং ছেলেটির গালে চড় মারলেন। ছেলেটি যখন মাওলানা শিহাব উদ্দিনকে পাল্টা চড় মারতে উদ্যত হল তখন শেখ নিজাম (র.) ছেলেটির হাত ধরে ফেললেন। বাবা ফরিদ (র.) তাঁর ছেলে মাওলানা শিহাব উদ্দিনকে দর্শনার্থীদের প্রতি সদ্ব্যবহার বরতে নির্দেশ দিলেন। বাবা ফরিদের ছেলে বৃদ্ধলোকটি এবং তাঁর পুত্রকে কিছু কাপড় এবং টাকা দিলেন এবং উভয়ে সন্তুষ্ট চিত্তে খুশীমনে বাবা ফরিদের খানকাহ্‌ থেকে প্রস্থান করল।

এ সকল ঘটনার মাধ্যমে বাবা ফরিদ শেখ নিজামকে আধ্যাত্মিকতায় প্রশিক্ষণ দিয়েছেন মাত্র। একজন ব্যক্তি যদি ধর্মীয় বিজ্ঞানে সুশিক্ষিত না হয় এবং ইসলামী শরীয়াহ্‌ সম্পর্কে যদি তাঁর অন্তর্দৃষ্টি না থাকে, তা'হলে সে ব্যক্তি কাউকে আধ্যাত্মিকতার পথে পরিচালিত করতে পারেনা। দম্ভ ও অহংকারের কোন স্থান আধ্যাত্মিকতায় নেই। কোন ব্যক্তি খানকাহ্‌ থেকে অসন্তুষ্ট বা আঘাত পেয়ে যেন ফিরে না যায় সেদিকে একজন খানকাহ্‌ পরিচালনাকারী সুফি সাধককে খেয়াল রাখতে হবে।

পঞ্চম অধ্যায়

বাবা ফরিদের জামাত খানার (খানকাহ্) কর্মকান্ডের কিঞ্চিৎ বর্ণনা

বাবা ফরিদের জামাত খানা ছিল একটি প্রকান্ড কক্ষ যে কক্ষে সকল বসবাসকারী ভক্তরা/শিষ্যরা মেঝেতে ঘুমাত, প্রার্থনা করত এবং লেখাপড়া করত। কক্ষে বসবাসকারী সকলে মিলে জামাত খানাটি পরিচালনা করত। জামাত খানার বিভিন্ন কাজকর্ম যার যার পছন্দমত সবাই ভাগ করে নিত। কেউ জঙ্গল থেকে রান্নাবান্নার জন্য কাঠ সংগ্রহ করে আনত, কেউ সেজানা পাতা সংগ্রহ করত, কেউ কূপ থেকে পানি সংগ্রহ করত, কেউ রান্না ঘরে থালাবাসন ধৌত করত এবং কেউ বা খাবার রান্না করত। খাবার তৈরী হলে সবাই একত্রে বসে খানা খেত। শেখ নিজাম উদ্দিন (র.)'র মতে, এরূপভাবে রাত্রে একত্রে বসে খানা খাওয়া ছিল একটি ঈদ উৎসবের মত।

শেখ নিজাম উদ্দিন (র.) তাঁর মুর্শিদ বাবা ফরিদ (র.)'র জামাত খানায় কিভাবে দিন কাটাতেন তা' নিম্নোক্ত ঘটনা বা কর্মকান্ড থেকে বুঝা যাবে:–

(ক) তাঁর সহপাঠি বন্ধুরা জঙ্গল থেকে যে সেজানার ডাল নিয়ে আসতেন সেগুলো রান্না করার দায়িত্ব ছিল শেখ নিজাম উদ্দিন (র.)'র। একদিন তিনি যখন সেজানার ডাল সিদ্ধ করছিলেন তখন তিনি দেখতে পান যে রান্না ঘরে লবণ নেই। তিনি পার্শবর্তী একটি মুদি দোকান থেকে ধারে কিছু লবণ কিনে আনলেন। রান্না হবার পর সজানার ডাল একটি বাটিতে করে বাবা ফরিদ (র.)'র সামনে পেশ করলেন। বাবা ফরিদ (র.) পেয়ালা থেকে সামান্য ডাল হাত দিয়ে নিতে উদ্যত হবার সাথে সাথে বললেন, "আমার হাত ভারী মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে এ খাবারটি খাবার জন্য আমাকে অনুমতি দেয়া হয়নি, সম্ভবতঃ এর মধ্যে সন্দেহজনক কিছু আছে।" এ উক্তি করার পর বাবা ফরিদ (র.) যেটুকু খাবার মুখে দেবার জন্য পেয়ালা থেকে নিয়েছিলেন, তা' আবার পেয়ালায় রেখে দিলেন। বাবা ফরিদ (র.)'র কথা শুনে শেখ নিজাম (র.) ভয়ে কাঁপতে লাগলেন। তিনি দাঁড়িয়ে উঠে মেঝেতে সেজদায় পড়লেন এবং মিনতি করে বললেন, "ওগো আমার মুর্শিদ! শেখ জালাল, মাওলানা বদরুদ্দীন ইসহাক এবং মাওলানা হুশাম উদ্দিন রান্না ঘরের জন্য কাঠ, সেজানার ডাল এবং পানি এনেছেন। এ অধম সেজানার ডালগুলো সিদ্ধ করেছি খুবই যত্ন সহকারে এবং মুর্শিদ বাবার সামনে পেশ করেছি। আমার মনে হচ্ছে সন্দেহ করার কিছু নেই। যদি সন্দেহ করার কিছু থেকে থাকে, তা'

একমাত্র আমার মুর্শিদ বাবাই জানেন।" বাবা ফরিদ (র.) লবণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। শেখ নিজাম (র.) আবার মেঝেতে সেজদায় পড়লেন এবং জানালেন, লবণগুলো পার্শ্ববর্তী দোকান থেকে ধারে কিনেছেন। বাবা ফরিদ (র.) বললেন, "দরবেশরা তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য ঋণ করার চাইতে উপবাস থেকে মরে যাওয়াটাকে শ্রেয় মনে করেন। ঋণগ্রস্ততা বা দেনা এবং আধ্যাত্মিকতার অবস্থান দুই ভিন্ন মেরুতে। এ দু'টি বিষয়ের কখনও সহ-অবস্থান হতে পারে না।"

(খ) বাবা ফরিদ (র.)'র নিকট থেকে তাবিজ নেয়ার জন্য অনেকে জামাত খানায় আসত। তাঁর স্বহস্তে এত বেশী তাবিজ লেখা খুবই কষ্টকর ছিল। তাই বাবা ফরিদ (র.) তাবিজ লেখার দায়িত্ব দিয়েছিলেন মাওলানা বদরুদ্দীন ইসহাক সাহেবকে। একবার মাওলানা ইসহাক জামাত খানায় ছিলেন না। বাবা ফরিদ (র.) সেদিন তাবিজ লেখার দায়িত্ব দিলেন শেখ নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.)কে। সেদিন তাবিজ নেয়ার লোক এত বেশী ছিল যে শেখ নিজাম (র.) তাবিজ লিখতে লিখতে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। এরপর থেকে বাবা ফরিদ (র.) শেখ নিজাম (র.) কে স্বাধীনভাবে দর্শনার্থীদেরকে তাবিজ লেখার জন্য অধিকার প্রদান করলেন।

(গ) একদা শেখ নিজাম (র.) যখন দিল্লী থেকে অজোধানে যাচ্ছিলেন, তখন মুহাম্মদ নামের এক খুবই অসুস্থ প্রতিবেশী বাবা ফরিদ (র.) থেকে তার জন্য একটি তাবিজ আনতে বললেন। শেখ নিজাম (র.) বাবা ফরিদ (র.)কে বিষয়টি বললেন। বাবা ফরিদ (র.) শেখ নিজাম (র.)কে তাঁর পক্ষে তাবিজটি লিখে দিতে বললেন। শেখ নিজাম (র.) এক টুকরা কাগজ নিলেন এবং তাতে লিখলেন, "আল্লাহু শাফী, আল্লাহু কাফী, আল্লাহু মাফী।" এবং তা' তিনি বাবা ফরিদ (র.)কে দেখালেন। বাবা ফরিদ (র.) সেটা স্পর্শ করলেন, পড়লেন এবং উক্ত মুহম্মদকে দেয়ার জন্য শেখ নিজাম (র.)'র হাতে দিলেন।

(ঘ) একদিন বাবা ফরিদ (র.)'র দাড়ি থেকে একটি চুল পড়ে গেল। শেখ নিজাম (র.) তা' মাটি থেকে তুলে নিলেন এবং তাবিজ হিসেবে ব্যবহার করার জন্য বাবা ফরিদ (র.)'র অনুমতি নিলেন।

(ঙ) কিরমানের এক সমৃদ্ধশালী ব্যবসায়ী সৈয়দ মোহাম্মদ কিরমানী তাঁর স্ত্রী বিবি রাণী (যিনি ছিলেন মুলতানের এক টাকশালের কর্মকর্তার কন্যা)কে নিয়ে বাবা ফরিদ (র.)'র জামাত খানায় বসবাস শুরু করেন ও সুফি সাধনায় আত্ম-নিয়োগ করেন। তাঁরা খানকাহ্‌র অন্যান্য বসবাসকারীর ন্যায় দারিদ্র্য ও ক্ষুধার কষ্ট-যাতনাকে বরণ করে বসবাস করছিলেন। বিবি রাণী খুবই দয়ালু ও সহানুভূতিশীল মহিলা ছিলেন। তিনি খানকাহ্‌র সকলকে ভাই বলে ডাকতেন এবং সবাই তাঁকে বোন হিসেবে স্নেহ করতেন। একদিন তিনি দেখলেন যে, শেখ নিজাম (র.)'র পরিধেয় কাপড়গুলো খুবই নোংরা এবং ছেঁড়া। বিবি রাণী শেখ নিজাম (র.)কে পরনের কাপড়গুলো খুলে দিতে বললেন এবং তাঁকে একটি চাদর দিলেন তাঁর শরীর ঢেকে রাখার জন্য। শেখ নিজাম (র.) চাদর মুড়ি দিয়ে ঘরের এক কোণে বসে রইলেন এবং

একটি কিতাব পড়তে লাগলেন। বিবি রাণী কাপড়গুলো সেলাই করে ধুয়ে দিলেন। এই জামাত খানাতেই শেখ নিজাম (র.)'র সাথে সৈয়দ মুহাম্মদ কিরমানী পরিবারের ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে উঠে এবং এ কিরমানী দম্পতি আজীবন শেখ নিজামের পাশে ছিলেন।

(চ) বাবা ফরিদ (র.) সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পেরেছিলেন যে, শেখ নিজামের পরিবার দিল্লীতে অত্যন্ত দারিদ্র্যক্লিষ্ট অবস্থায় জীবন যাপন করে থাকেন। একদা শেখ নিজাম (র.) যখন দিল্লী ত্যাগের অনুমতি চাইলেন, বাবা ফরিদ (র.) তখন তাঁকে খরচ নির্বাহের জন্য একটি স্বর্ণমুদ্রা দিলেন। পরে শেখ নিজাম (র.) জেনেছিলেন যে, এই মুদ্রাটিই ছিল বাবা ফরিদের ঘরে থাকা সর্বশেষ মুদ্রা। ইফতার করার সময় বাবা ফরিদ (র.)'র রোজা খোলার জন্য কোন আহার্য ছিলনা। শেখ নিজাম মুদ্রাটি বাবা ফরিদের পদপ্রান্তে নিবেদন করলেন। বাবা ফরিদ (র.) তা' গ্রহণ করলেন এবং বললেন, "আমি তোমাকে পার্থিব বস্তুর কিছু অংশ দেয়ার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করেছি।" শেখ নিজাম চিন্তিত হলেন এই ভেবে যে, দুনিয়াবী আরাম-আয়েশ তাঁকে আবার আধ্যাত্মিক সাধনা থেকে বিচ্যুত করবে কিনা। বাবা ফরিদ (র.) শেখ নিজামের চিন্তা দূর করার জন্য বললেন, "ভীত হয়োনা। এটা তোমাকে কোন সমস্যা কিংবা দূর্যোগে ফেলবেনা।"

(ছ) একদা বাবা ফরিদ (র.) একটু অসুস্থ ছিলেন। তিনি শেখ নিজাম (র.) ও তাঁর অন্য কয়েকজন শিষ্যকে তাঁর রোগ মুক্তির জন্য প্রার্থনাকল্পে শহীদদের কবরস্থানে পাঠালেন। শেখ নিজাম (র.)'র মাতাও তদ্রুপ করতেন। যখনি তিনি অসুস্থ হতেন, তখনি তিনি তাঁর সন্তান শেখ নিজামকে ওলী-বুজুর্গ ও শহীদদের কবরে গিয়ে তাঁর রোগ মুক্তির জন্য প্রার্থনা করতে বলতেন।

(জ) বাবা ফরিদ (র.) যখন কোন শিষ্যকে পবিত্র কুরআন মুখস্থ করতে বলতেন, তিনি তাঁকে সূরা ইউসুফ পাঠ করে শুরু করতে উপদেশ দিতেন। যে এভাবে কুরআন শরিফ মুখস্থ করা আরম্ভ করতেন, তিনি আল্লাহ্‌র রহমত লাভ করতেন।

(ঝ) বাবা ফরিদ (র.) যখন নিজের জীবনের কোন ঘটনা বর্ণনা করতেন, তখন তিনি বলতেন যে, এরূপ ঘটনা একজন দরবেশের জীবনে ঘটেছিল। তিনি কখনও নিজের নাম উচ্চারণ করতেন না বা নিজের ঘটনা বলে প্রকাশ করতেন না। শেখ নিজাম (র.) ও পরবর্তী জীবনে এ পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন।

(ঞ) একদিন ছয় কিংবা সাতজন যুবক বয়সী চিশ্তিয়া সিলসিলাহ্‌র দরবেশ বাবা ফরিদের খানকাহ্‌তে আসলেন। কিছু বিষয় নিয়ে তাঁদের মধ্যে বিবাদ চলছিল এবং তাঁরা বাবা ফরিদের কাছে এ বিবাদের মীমাংসার জন্য আসছিলেন। বাবা ফরিদ (র.) বিষয়টি মীমাংসার ভার শেখ নিজাম (র.) ও শেখ বদরুদ্দীন ইসহাক (র.)'র উপর অর্পণ করলেন। দরবেশগণ এত বিনম্র ও বিনয়ী চিত্তে বিষয়টি তাঁদের কাছে পেশ করলেন যে, শেখ নিজাম (র.) ও শেখ ইসহাক (র.)'র চোখে পানি এসে গেল।

(চ) একদা শবে বরাতের প্রাক্কালে বাবা ফরিদ (র.) কিছু অতিরিক্ত নামায আদায় করলেন এবং শেখ নিজাম (র.) কে এ নামায পরিচালনা করার জন্য আদেশ দিলেন।

এভাবে বিভিন্ন কথোপকথন, ঘটনা, কর্মকান্ড, দৃষ্টান্ত প্রভৃতির মাধ্যমে শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জেশকর (র.) (বাবা ফরিদ) শেখ নিজাম (র.)কে আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। বাবা ফরিদ (র.) তাঁকে যে সকল নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উপদেশ দিতেন, সেগুলো শেখ নিজাম (র.) লিখে রাখতেন এবং অনুসরণ করার চেষ্টা করতেন। নিম্নে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উপদেশ বা অনুসরণীয় রীতি বর্ণনা করা হলোঃ

(১) বাবা ফরিদের খানকাহ্‌তে দরবেশ ও সাধারণ মানুষের অবাধ বিচরণ ছিল। সকলকে বাবা ফরিদ দর্শন দিতেন এবং কথাবার্তা বলতেন। শেখ নিজাম (র.) তাঁর খানকাহ্‌তেও পরবর্তীকালে এ রীতি বজায় রেখেছিলেন।

(২) বাবা ফরিদ (র.) শত্রুকে শান্তভাবে কথা বলতে এবং ঋণের টাকা অপরিশোধিত না রাখতে উপদেশ দিতেন। শেখ নিজাম (র.) ইতোপূর্বে অনিবার্য কারণে ধার করলেও এ উপদেশ পাবার পর ধার করা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেন।

(৩) বাবা ফরিদ (র.) আধ্যাত্মিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য ত্বরিকায় দৃঢ় আস্থা রাখা এবং সাধনা আজীবন অব্যাহত রাখা অপরিহার্য মনে করতেন। শেখ নিজাম (র.) এ উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে গেছেন।

(৪) বাবা ফরিদের উপদেশ অনুযায়ী শেখ নিজাম (র.) পার্থিব সম্পদের মোহ সম্পূর্ণরূপে বর্জন করেন।

(৫) বাবা ফরিদ (র.) পার্থিব জীবিকা বৃদ্ধির জন্য প্রত্যেক শুক্রবার রাত্রে সূরা জুমা আবৃত্তি বা পড়ার জন্য ভক্তদেরকে উপদেশ দিতেন। শেখ নিজাম (র.) নিজে তা' করতেন না যেহেতু তিনি পার্থিব সম্পদের মোহ ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু তিনি শিষ্যদেরকে শুক্রবার রাতে সূরা জুমা পড়তে বলতেন।

(৬) একদা শেখ নিজাম (র.) বাবা ফরিদের সাথে নৌকায় ভ্রমণ করছিলেন। সময়টা ছিল গ্রীষ্মকালের দুপুর। সকল সফরসঙ্গী ঘুমুচ্ছিলেন, কিন্তু শেখ নিজাম জাগ্রত থেকে তাঁর মুর্শিদের শরীর থেকে মাছি তাড়াচ্ছিলেন। বাবা ফরিদ (র.) শেখ নিজামকে বললেন, 'যখন তুমি দিল্লী যাবে, তখন তুমি ধর্ম চর্চায় ব্যস্ত থাকবে। অযথা সময় নষ্ট করবেনা। ঈমানের অর্ধেক হচ্ছে রোজা রাখা এবং বাকী অর্ধেক হচ্ছে নামায পড়া, হজ্জ্ব করা প্রভৃতি।'

(৭) একদিন শুক্রবারে (২৫শে জমাদিউল আউয়াল, ৬৬৪ হিঃ/১২৬৫ খৃঃ) জুমার নামাযের পর বাবা ফরিদ (র.) তাঁর লালা মোবারক শেখ নিজাম (র.)'র মুখে ঢুকিয়ে দেন এবং তাঁকে পবিত্র কুরআন শরিফ মুখস্থ করতে বলেন। অতঃপর তিনি বললেন, "আমি তোমাকে উভয় জগৎ দিয়েছি। যাও এবং হিন্দুস্থান সাম্রাজ্য নিয়ে নাও।"

(৮) বাবা ফরিদ (র.) আল্লাহ্‌র কাছে শেখ নিজাম (র.)'র দোয়া কবুলের জন্য প্রার্থনা জানালেন এবং শেখ নিজামকে তাঁর আশাটি (লাঠি) প্রদান করলেন।

(৯) একদিন বাবা ফরিদ (র.) যখন তাঁর কক্ষে একাকী ছিলেন, তখন শেখ নিজাম (র.) তথায় প্রবেশ করলেন। শেখ নিজাম (র.) বাবা ফরিদের চরণে তাঁর মাথা রাখলেন এবং তিনি যেন বিশ্বাসে অটল থাকতে পারেন সেজন্য দোয়া চাইলেন। বাবা ফরিদ (র.) তাঁর ইচ্ছা পূরণের জন্য দোয়া করলেন।

(১০) রমজান মাসের ১৩ তারিখে (৬৬৪ হিঃ/১২৬৫ খৃঃ) বাবা ফরিদ (র.) শেখ নিজামকে মুরিদ করার জন্য অনুমতি সম্বলিত 'এজাজত নামা' বা 'খেলাফত নামা' সনদ প্রদান করলেন। সনদ প্রদানকালে বাবা ফরিদ (র.) শেখ নিজামের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ও সৌভাগ্যের জন্য দোয়া করলেন এবং বললেন, "তুমি হবে একটি বিশাল বৃক্ষ যার স্নিগ্ধ ছায়াতলে জনগণ শান্তি পাবে।" অতঃপর বাবা ফরিদ (র.) দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বললেন, "আমার ওফাতকালে তুমি অজোধানে থাকবেনা। তুমি থাকবে দিল্লীতে।"

শেখ নিজাম (র.) তাঁর দীক্ষাগুরুর ভালবাসায় বিমোহিত হয়ে গেলেন। তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বললেন, "আমাকে আপনি আপনার আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী মনোনীত করে মহাসম্মান দান করেছেন। এটা আমার জন্য দূর্লভ সম্পদ। কিন্তু আমি একজন ছাত্র মাত্র এবং পার্থিব যোগাযোগ বা সম্পর্ককে অপছন্দ ও ঘৃণা করি। এ অবস্থান অতি উচ্চ এবং দায়িত্ব কাঁধে নেবার মত সামর্থ্য আমার নেই। আপনার দয়া এবং অনুগ্রহই আমার জন্য যথেষ্ট। যখন বাবা ফরিদ (র.) দেখলেন যে, শেখ নিজাম (র.) এ দায়িত্ব নিতে ইতঃস্ততঃ করছেন, তখন তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করলেন, "এ দায়িত্বটি তোমার দ্বারা দক্ষভাবে পালিত হবে।" এরপরও যখন শেখ নিজাম (র.) আপত্তি করছিলেন, বাবা ফরিদ (র.) উত্তেজিত হয়ে বললেন, "নিজাম! এটা আমার নিকট থেকে গ্রহণ করো, যদিও আমি জানিনা যে, আল্লাহ্‌ আমাকে সম্মানিত করবেন কিনা। আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, আমার সিলসিলাহ্‌ভুক্ত তোমার সকল মুরীদ বা শিষ্যদেরকে সাথে না নিয়ে আমি বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবনা।" এরপর শেখ নিজাম (র.) দিল্লীর উদ্দেশ্যে অজোধান ত্যাগ করেন। হাঁচীতে অবস্থানকারী মাওলানা জামাল উদ্দিনকে বাবা ফরিদের উপদেশমত শেখ নিজাম (র.) তাঁকে প্রদত্ত খেলাফতনামাটি দেখালে তিনি বলে উঠলেনঃ "বাবা ফরিদকে সহস্র আশীর্বাদ ও ধন্যবাদ এই জন্য যে, তিনি মণি-মুক্তা এমন একজনের কাছে অর্পণ করেছেন যিনি তার মূল্য বুঝেন।" শেখ নিজাম (র.) দিল্লীতে চলে আসার পর ক্রমাগত রোজা ও সংযম সাধনার ফলে বাবা ফরিদ (র.) ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। বাবা ফরিদের ওফাতের কয়েকদিন আগে সৈয়দ মুহাম্মদ কিরমানী দিল্লী থেকে অজোধানে আসেন। বাবা ফরিদ (র.) তখন হুজরা শরিফে একটি খাটের উপর শায়িত ছিলেন এবং তাঁর পুত্র ও শিষ্যগণ হুজরা শরিফের দরজায় বাবা ফরিদের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী (গদীনশীন) কে হবেন তা' নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন। সৈয়দ কিরমানী

বাবা ফরিদকে দেখার আগ্রহ ব্যক্ত করলেন, কিন্তু তাঁকে হুজরা শরিফে প্রবেশ করতে দেয়া হলো না।

সৈয়দ কিরমানী হুজরা শরিফের দরজায় ধাক্কা মেরে দরজা খুলে ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং হুমড়ি খেয়ে বাবা ফরিদের চরণে লুটিয়ে পড়লেন। বাবা ফরিদ (র.) চোখ মেললেন এবং বললেন, "সৈয়দ! তুমি কেমন আছ? তুমি এখানে কখন এবং কীভাবে এসেছ?" সৈয়দ কিরমানী বললেন, "এখনি এসেছি।" কথা প্রসঙ্গে সৈয়দ কিরমানী শেখ নিজামের কথা বললেন এবং বাবা ফরিদকে শেখ নিজামের সালাম পৌঁছিয়ে দিলেন। শেখ নিজামের প্রসঙ্গ আসলে বাবা ফরিদ (র.) জিজ্ঞাসা করলেন, "শেখ নিজাম (র.) কেমন আছে? সে কি সুখে আছে?" অতঃপর বাবা ফরিদ (র.) শেখ নিজামকে দেয়ার জন্য বাবা ফরিদের আধ্যাত্মিক রাজমুকুটসম জায়নামায, আলখাল্লা, লাঠি প্রভৃতি সৈয়দ কিরমানীর হাতে অর্পণ করলেন। বাবা ফরিদের সন্তানগণ এতে হতাশ হলেন এবং সৈয়দ কিরমানীর সাথে তাঁদের পিতার ব্যবহৃত এ দূর্লভ জিনিসগুলো থেকে তাঁদেরকে বঞ্চিত করার জন্য ঝগড়া শুরু করলেন।

এ প্রসঙ্গে শেখ নাছির উদ্দিন চেরাগে দিল্লী সে সময়ে প্রচারিত একটি রিপোর্টের কথা উল্লেখ করলেন। একদা বাবা ফরিদ (র.) তাঁর পুত্র ও শিষ্যদেরকে নিয়ে নৌকায় ভ্রমণ করছিলেন। বাবা ফরিদ (র.) এবং শেখ নিজাম (র.) ছাড়া নৌকার সকল আরোহী ঘুমুচ্ছিলেন। হঠাৎ বাবা ফরিদ (র.) ডাকলেন, 'নিজাম!' শেখ নিজাম (র.) তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, 'আমি হাজির।' বাবা ফরিদ (র.) বললেন, 'আমার পুত্র নিজাম উদ্দিন।' কিছুক্ষণ পর বাবা ফরিদ (র.) আবার ডাকলেন, 'শেখ নিজাম উদ্দিন।' শেখ নিজাম (র.) বললেন, 'আমি হাজির।' বাবা ফরিদ (র.) বললেন, 'আস!' মানুষ চেয়েছিল আমার পুত্র নিজামকে আশীর্বাদ করতে। কিন্তু আল্লাহ্ চান তোমাকে আশীর্বাদ করতে।" এই রিপোর্ট বা সংবাদের ভিত্তি যাই হোকনা কেন, আশীর্বাদ হচ্ছে ঐ মূহুর্তের জন্য এক প্রকারের আধ্যাত্মিক অনুগ্রহ, এটা প্রধান উত্তরাধিকারী মনোনয়নের বিষয় নয়। বলাবাহুল্য, শেখ নিজামকে অনেক ভেবে-চিন্তে বাবা ফরিদ তাঁর আধ্যাত্মিক জগতের প্রধান উত্তরাধিকারী হিসেবে ইতোপূর্বে মনোনয়ন দিয়েছিলেন। সুতরাং পুত্র নিজামকে আশীর্বাদ করা মানে খেলাফত প্রদান করা নয়। বাবা ফরিদের পুত্র সেনাবাহিনীতে চাকুরী করতেন এবং আধ্যাত্মিকতার প্রতি তেমন আগ্রহী ছিলেন না। একদিন বাবা ফরিদের ছেলে নিজাম উদ্দিন এবং শেখ নিজাম (র.) উভয়ে বাবা ফরিদের সামনে উপস্থিত ছিলেন। বাবা ফরিদ বললেন, "তোমরা উভয়ে আমার পুত্র। নিজাম (নিজ পুত্র) রুটি রোজগারের (নানী) পুত্র এবং শেখ নিজাম (র.) হচ্ছে আত্মার (জানি) পুত্র।" শেখ নিজাম (র.) একদিন জনতার সম্মুখে বলছিলেন, "বাবা ফরিদের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র দিল্লীতে গিয়েছিল এবং কুতুব উদ্দিন বখতিয়ার কাকী (র.)'র মাযারে গিয়ে মাথা মুণ্ডন করেছিল। বাবা ফরিদ (র.) যখন এ খবরটি শুনেছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন, "শেখ কুতুব উদ্দিন (র.) আমার আধ্যাত্মিক গুরু। কিন্তু এ ধরণের বায়াতের কোন অর্থ নেই।"

শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জেশকর (র.) তাঁর শিষ্য ও যোগ্য উত্তরসূরী শেখ নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.)'র ব্যক্তিত্ব ও আধ্যাত্মিক চরিত্র গঠনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। শেখ নিজাম (র.)কে বাবা ফরিদ (র.) একজন আগ্রহী, বিবেকবান, ত্যাগী এবং অনুসন্ধিৎসু বুদ্ধিমান যুবক হিসেবে পেয়েছিলেন এবং বাবা ফরিদ (র.) শেখ নিজাম (র.)'র অন্তরে সকল আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ সাধন করতে পেরেছিলেন। শেখ নিজাম (র.) তাঁর গুরুর শিক্ষা ও দীক্ষাকে সর্বতোভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন সারা জীবনব্যাপী এবং এর ফলে জনজীবনে চিস্তিয়া সিলসিলাহ্‌র প্রভাব চিরস্থায়ীভাবে বিদ্যমান রয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভারত বর্ষে চিশ্‌তীয়া ত্বরিকার কর্ণধার হিসেবে শেখ সৈয়দ নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.):

তেইশ বৎসর বয়সে হযরত শেখ নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.) কে শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জেশকর (র.)'র উত্তরাধিকারী খলীফা নিযুক্ত করা হয় এবং দিল্লীতে বসতি স্থাপন করে সেখান থেকে সিল্‌সিলাহ্ বিকাশের কাজে আত্ম নিয়োগ করার জন্য তাঁর মুর্শিদ বাবা ফরিদ (র.)'র তরফ থেকে নির্দেশ প্রদান করা হয়। এ কাজটি ছিল একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ এবং দায়িত্বের বিষয়। রাজধানী দিল্লী থেকে দূর দূরান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা চিশ্‌তীয়া ত্বরিকার অনুসারীদের মধ্যে চিশ্‌তীয়া ত্বরিকার বিকাশ সাধন করা ছিল একটি দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু যুবক নিজাম উদ্দিন (র.) অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে সে কঠিন দায়িত্ব মাথা পেতে নিলেন।

এ প্রসঙ্গে হযরত আমির খসরু (র.) বলেন, "হযরত নিজাম উদ্দিন (র.) বাবা ফরিদ (র.)'র জপমালা সংগ্রহ করে এক সুতায় গেঁথেছেন। সে জন্যই তাঁর নাম হয়েছে নিজাম (মুক্তার মালা)।" হযরত শেখ নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.)'র বিরামহীন প্রচেষ্টার ফলে সমগ্র ভারত চিশ্‌তীয়া ত্বরিকার খানকাহ্‌তে ভরে যায়। ভারতের প্রতিটি আনাচে-কানাচে চিশ্‌তীয়া খানকাহ্ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মোহাম্মদ ঘোথী সত্তারী (Ghauthi Sattari)'র বর্ণনা মতে, হযরত নিজাম উদ্দিন (র.) প্রায় সাতশত সিনিয়র শিষ্যকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠান এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তির কথা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। শিষ্যদের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য নিয়মিত চিশ্‌তীয়া ত্বরিকায় বায়াত প্রদান ও অনুশীলনের ক্ষেত্রে তাঁর যে গভীর আগ্রহ ও মনোযোগ পরিলক্ষিত হয়, তা সকল মহলের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করে। গিয়াসপুরে স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য হযরত শেখ নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.) যে সিদ্ধান্ত নেন তা'ছিল ঐতিহাসিক। গিয়াসপুরে বসবাসের পর থেকেই একজন উচ্চ মার্গের আধ্যাত্মিক গুরু ও প্রশিক্ষক হিসেবে তাঁর খ্যাতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ গিয়াসপুর থেকেই চিশ্‌তীয়া ত্বরিকার বিকাশের ক্ষেত্রে গণজাগরণ সূচিত হয়। বলা বাহুল্য, হযরত নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.)'র পূর্বে এই সিল্‌সিলাহর কোন ওলী ত্বরিকার অনুসারীদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য এত ব্যাপক কর্মসূচী ও উদ্যোগ গ্রহণ করেন নি। হযরত নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.) বায়াত প্রদানের ক্ষেত্রে আমজনতার জন্য অবাধ সুযোগ নিশ্চিত করেছিলেন। তিনি মনে করতেন, প্রাথমিক স্তরে ভর্তি হবার পর যদি কোন শিষ্যের চরিত্রগত উন্নতি হয় এবং তার ইতোপূর্বে কৃত সকল ভুলের জন্য অনুশোচনা

করে, তাহলে সে পরবর্তী ধাপে অগ্রসর হতে সক্ষম হবে। মানুষকে খোদার নৈকট্য লাভের পথে যাত্রা শুরুর জন্য সুযোগ দেয়া উচিৎ। কেননা তাঁর মুর্শিদ বাবা ফরিদ (র.) বলেছেন, "নিজাম! যে পর্যন্ত তোমার একজন শিষ্যও বেহেশ্তের বাইরে থাকবে, সে পর্যন্ত আমি ফরিদ (র.) বেহেশ্তে প্রবেশ করবনা।" তিনি চিশ্তীয়া ত্বরিকার অনুসারী সকল শিষ্যদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠা করার জন্য বিভিন্ন নীতিমালা গ্রহণ করেন এবং সেগুলো দৃঢ়ভাবে প্রয়োগ করেন। নীতিমালা বাস্তাবায়নের ক্ষেত্রে তাঁর দৃঢ়তা কেমন ছিল তা নিম্নোক্ত ঘটনাগুলো থেকে জানা যাবেঃ–

১. মাওলানা বোরহান উদ্দিন গরীব ছিলেন হযরত নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.)'র একজন সিনিয়র শিষ্য। তিনি দাক্ষিণাত্যে চিশ্তীয়া ত্বরিকা প্রচারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি রান্নাঘরে খাদ্য প্রস্তুতির কাজ তদারক করতেন। তিনি ছিলেন সত্তর বৎসর বয়সের একজন বৃদ্ধ লোক। তিনি একদিন খানকাহ্তে ভাজকরা কম্বলের উপর হেলান দিয়ে বসেছিলেন। আলী জামবেলী এবং মালিক নুশরাত (যারা এক সময়ে সুলতান আলাউদ্দিন খলজির খানসামা ছিলেন) নামক হযরত নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.)'র দুই শিষ্য শেখ নিজাম (র.) কে জানালেন যে, মাওলানা বোরহান উদ্দিন মুর্শিদের মত (বা শেখের ন্যায়) তাঁর কার্পেটে বসে আছেন। এ সংবাদে হযরত নিজাম উদ্দিন আওলিয়া অত্যন্ত মর্মাহত হলেন এবং মাওলানা বোরহান উদ্দিনকে ডেকে পাঠালেন। মাওলানা বোরহান উদ্দিন শেখ নিজাম (র.)'র সামনে ভয়ে কোন কথাই বলতে পারলেন না। যখন মাওলানা বোরহান উদ্দিন শেখ নিজাম (র.)'র সাথে দেখা করে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে আসছিলেন, তখন ইকবাল নামক হযরত নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.)'র একজন খাদেম এসে তাঁকে বললেন যে অনতি বিলম্বে তিনি যেন খানকাহ্ ত্যাগ করে চলে যান। এটাই হচ্ছে শেখ নিজাম (র.)'র আদেশ। মাওলানা বোরহান উদ্দিন আঘাত পেলেন এবং ইব্রাহিম তস্তদরের বাসায় আশ্রয় নিলেন। কয়েকদিন সেখানে থাকায় পর ইব্রাহিম তস্তদর ও তাঁকে তাঁর বাসা ছেড়ে চলে যেতে বললেন।

শেখ নিজাম (র.)'র সুনজরে না থাকলে কারও বাসায় তিনি সাদরে গৃহীত হবেন না বলে এ দৃষ্টান্ত থেকে প্রতীয়মান হয়। মাওলানা বোরহান উদ্দিন দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তাঁর নিজ বাড়ীতে চলে গেলেন। বন্ধু-বান্ধব ও সহপাঠিগণ তাঁকে সান্তনা দিতে আসলেন। কিন্তু হযরত নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.)'র কাছে গিয়ে তাঁর জন্য সুপারিশ করার কারও সাহস হলনা। হযরত আমির খসরু (র.) বুকে সাহস নিয়ে শেখ নিজাম (র.)'র কাছে মাওলানা বোরহান উদ্দিনকে ক্ষমা করার জন্য অনুরোধ করলেন। কিন্তু শেখ নিজাম (র.) কোন উত্তর দিলেন না। অতঃপর হযরত আমির খসরু (র.) ভিন্ন একটি কৌশল অবলম্বন করলেন। তিনি তাঁর মাথার পাগড়ীটি তাঁর ঘাড়ের চারিদিকে পেঁচিয়ে বাঁধলেন যেরূপভাবে একজন আসামী আদালতে আত্মসমর্পণের সময় করে যাকে। শেখ নিজাম (র.) তাঁকে এ অবস্থায় দেখে মোহিত হয়ে গেলেন এবং এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। হযরত আমির খসরু (র.) মাওলানা

বোরহান উদ্দিনকে ক্ষমা করার জন্য অনুরোধ করলেন। হযরত আমির খসরু (র.) তাঁর মত আসামীর সাজে মাওলানা বোরহান উদ্দিনকে এনে হাজির করলেন। হযরত নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.) তাঁকে ক্ষমা করলেন।

বলা বাহুল্য। এ দৃষ্টান্তের মাধ্যমে শেখ নিজাম (র.) সকল শিষ্যকে জনসাধারণের সাথে কথাবার্তায় চাল চলনে অত্যন্ত বিনীত ও নিরহঙ্কার হওয়ার জন্য শিক্ষা দিলেন।

২. কাজী মুহি উদ্দিন কাসানী শেখ নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.)'র অত্যন্ত সিনিয়র খলীফাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। কিন্তু শেখ নিজাম (র.) যখন দেখলেন যে, সরকারী চাকুরীর প্রতি তাঁর কিছুটা আগ্রহ আছে, তিনি তাঁর থেকে খেলাফত নামা প্রত্যাহার করে নিলেন এবং এক বৎসর পর্যন্ত তাঁর খেলাফত স্থগিত রাখলেন। এটাতে প্রমাণ হল যে, তাঁর কোন শিষ্য বা খলীফার যদি সরকারী চাকুরীর প্রতি বিন্দু মাত্র আসক্তি বা ঝোঁক থাকে তা হলে তিনি শেখ নিজাম (র.)'র বিরাগভাজন হবেন। সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে হযরত নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.) যে আদর্শ অনুসরণ করতেন তা নিম্নোক্ত দু'টো নীতি থেকে সম্যক উপলব্ধি করা যাবে। এ নীতিগুলো থেকে এটা সহজেই অনুমান করা যায় যে, হযরত নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.) উচ্চতর মানবিক মূল্যবোধের বিকাশের প্রতি দৃঢ় অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন। নীতিদ্বয় হলো নিম্নরূপ:

১. হযরত নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.) স্রষ্টার সৃষ্টি রাশির সেবা বা ভালবাসার মাধ্যমে স্রষ্টার আশীর্বাদ লাভের জন্য তাঁর মুরীদদেরকে তাগিদ দিতেন। আনুষ্ঠানিক ইবাদতের চাইতে মানব সেবাকে শেখ নিজাম (র.) অত্যধিক আধ্যাত্মিক তাৎপর্যবহ বলে বিবেচনা করতেন।

২. চিশ্‌তীয়া সিল্‌সিলাহ্‌র জন্য বাবা ফরিদ (র.)'র আদর্শ অনুসরণ করা জরুরী বলে হযরত নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.) মনে করতেন। বাবা ফরিদ (র.) সমাজে মানব সেবা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার যে দৃষ্টান্ত দেখিয়ে গেছেন তা অনুসরণের জন্য শেখ নিজাম (র.) সবাইকে তাগিদ দিয়েছেন। শেখ নিজাম (র.) সকলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য আহ্বান জানাতেন। আমির-ফকির, আশরাফ-আত্‌রাফ এরূপ কোন ভেদাভেদ তাঁর কাছে ছিলনা। কারও প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ না করার জন্য তিনি জোর তাগিদ দিতেন।

বাবা ফরিদ (র.) থেকে খেলাফত লাভের পর শেখ নিজাম (র.) উপর্যুক্ত সাংগঠনিক ও আদর্শগত নীতিমালাকে অনুসরণ করেই মানবাত্মাকে আলোকিত করার আধ্যাত্মিক কর্মসূচী শুরু করেন।

শেখ নিজাম (র.)'র খানকাহ্‌ জীবন: হযরত শেখ নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.)'র খানকাহ্‌ যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। মুক্ত ও স্নিগ্ধ বাতাসে ভরপুর ছিল এ খানকাহ্‌। প্রথমে এ খানকাহ্‌টি ছিল একটি মাটির গুদাম। কিন্তু পরবর্তী কালে মালিক ইমাদ উল মুলকের একজন কেরানী জনাব জিয়া উদ্দিন শেখ নিজাম (র.)'র অনুমতিক্রমে খানকাহ্‌ গৃহটি পাকা করে দেন। বাদশাহ্‌ হুমায়ুনের সমাধির পাশে এ খানকাহ্‌ গৃহের ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান

আছে। খানকাহ্ ভবনের কেন্দ্রস্থলে একটি বড় হল ঘর ছিল এবং এ হল ঘরটির উভয় পাশে অনেকগুলো সারি সারি স্তম্ভ ছিল। খানকাহ্ প্রাঙ্গণে কেন্দ্রস্থল থেকে কিছুটা দূরে একটি প্রকান্ড বটগাছ ছিল যার শাখা-প্রশাখা ভবনের ছাদের উপর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। প্রাঙ্গণের চতুর্দিকে ছিল খানকাহ্র বারান্দা। সিনিয়র শিষ্যদের বসার জন্য বড় হলটির সাথে সংযুক্ত বারান্দার কিছু অংশ দেয়াল দিয়ে ঘিরে দেয়া হয়েছিল। প্রধান ফটকের বিপরীতে একটি ফটক-কক্ষ (Gate room) ছিল যার উভয় পাশে ছিল দরজা। এটা একটা বড় কক্ষ ছিল এবং অন্যদের প্রবেশ পথ বন্ধ না করে এ কক্ষে স্বল্পসংখ্যক লোক আরামে বসতে পারত। এ কক্ষের সাথে সংলগ্ন ছিল রান্নাঘর। পরবর্তী সময়ে শেখ নিজাম (র.) এ হল ঘরের ছাদে ছোট্ট একটি কাঠের দেয়াল ঘেরা কক্ষে বাস করতেন। দিনের বেলায় তিনি প্রধান ভবনের ছোট কামরার একটিতে বিশ্রাম নিতেন। ছাদের চারিদিকে নীচু দেয়াল দ্বারা ঘেরা ছিল এবং আঙ্গিনার দিকে এ দেয়ালটি উঁচু করে দেয়া হয়েছিল যাতে শেখ নিজাম (র.)'র কামরার উপরে সকাল বেলায় ছাদে ছায়া থাকে। এ কক্ষে শেখ নিজাম (র.) দর্শনার্থীদের সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং তাদের সাথে কথাবার্তা বলতেন। খানকাহ্র সকল কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি কঠোর নিয়ম মেনে চলতেন। শত ব্যস্ততার মাঝেও তিনি ছাদের উপর থেকে খানকাহ্র কর্মকান্ড তদারকি করতে ভুলতেন না। তাঁর কথাই ছিল আইন এবং এ আইন থেকে বিচ্যুতি ছিল অকল্পনীয়। কেউ আইন ভঙ্গ করলে তাকে কঠোর শাস্তি পেতে হোত। হযরত নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.)'র কাছে রাজা ও ভিক্ষুকের মধ্যে কোন তফাৎ ছিলনা। দর্শনার্থীদের সাথে নরম ও ভদ্র ব্যবহার করার জন্য তিনি খানকাহ্র লোকদেরকে নির্দেশ দিতেন। ঈদুল আজহার পরবর্তী তিনদিন খানকাহ্তে প্রচুর দর্শনার্থীর সমাগম হোত। বৈষম্যহীন ও বিরামহীনভাবে দর্শনার্থীদেরকে খাবার পরিবেশন করা হোত। একদা হযরত নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.) এক দরবেশকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'পবিত্র কুরআনের কোন আয়াত তাঁর ভাল লাগে? দরবেশ উত্তর দিয়েছিলেন, সর্বদা-খাবার কথা যে আয়াতে বলা হয়েছে।' (১৩:৩৫)। কোন দর্শনার্থী রোদের মধ্যে আঙ্গিনায় বসে থাকতে দেখলে হযরত নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.) বলতেন 'তারা রোদে বসে আছে অথচ আমি তাপে পুড়ে যাচ্ছি।' অর্থাৎ তিনি তা সহ্য করতে পারতেন না।

হযরত নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.) বলতেন, 'কোন গরীব দর্শনার্থী যখন খালি হাতে আমার দরবারে আসে, তাকে কিছু উপহার দেয়া আমার কর্তব্য হয়ে যায়।' তাঁর পায়ে ব্যাথা থাকার কারণে একদা তিনি খাটে বসেছিলেন। এজন্য তিনি দর্শনার্থীদের কাছে মাফ চেয়ে নিলেন।

একবার শেখ রোকন উদ্দিন আবুল ফতেহ্ দোলনা বা পাল্কী করে খানকাহ্তে এসেছিলেন। পায়ে সমস্যা থাকার কারণে তিনি পাল্কী থেকে নামতে পারছিলেন না। তিনি উপস্থিত লোকদেরকে তাঁকে সাহায্য করতে বললেন। শেখ নিজাম (র.) তাঁকে পাল্কী থেকে নামতে বারণ করলেন এবং নিজে স্বয়ং হল ঘরের মেঝেতে বসে তাঁর সাথে আলাপ-আলোচনা করতে লাগলেন।

শেখ বোরহান উদ্দিন গরীব, মাওলানা ফখরুদ্দীন জাররাদী, সৈয়দ খামোশ কিরমানী, মাওলানা মিরাজী, আমির খুরদ প্রমুখ বিখ্যাত শিষ্যগণ স্থায়ীভাবে খানকাহ্‌তে বসবাস করতেন। কোন কোন সময় ভ্রাম্যমান বিশ থেকে ত্রিশজন দরবেশ একসাথে খানকায় রাত্রি যাপন করতেন। কোন কোন বিখ্যাত খলীফাগণ বাদ্যযন্ত্র ও ছোট বাদকদলসহ খানকাহ্‌তে স্থায়ীভাবে বাস করতেন। একদা মুলতানের শেখ বাহাউদ্দিন জাকারিয়ার শিষ্য খাজা মাহমুদ গজরুনী খানকাহ্‌য় আসলেন। তিনি রাত্রে তাহাজ্জুদ নামায পড়ার জন্য অজু করতে পাশে যমুনা নদীতে গেলেন। এমন সময় জনৈক চোর তাঁর জামাটি নিয়ে পালাল। জনাব গজরুনী এসে চিৎকার করতে লাগলেন। তখন হযরত নিজাম উদ্দিন (র.) প্রার্থনায় রত ছিলেন। তাঁর ধ্যান ভঙ্গ হতে পারে এ আশঙ্কায় শেখ নাছির উদ্দিন চেরাগ দেহলী জনাব গজরুনীকে নিজের জামাটি দিয়ে দিলেন। পরের দিন সকালে শেখ নিজাম (র.) ঘটনাটি জানতে পেরে নিজের গায়ের জামাটি জনাব নাছির উদ্দিন চেরাগকে দিয়ে দিলেন। আর একদিন মাওলানা ওয়াজি উদ্দিন পাইলীর জুতাগুলো খানকাহ্ থেকে হারিয়ে গেলে শেখ নিজাম (র.) নিজের জুতাগুলো তাঁকে দিয়ে দিলেন। জনাব পাইলী জুতাগুলো মাথায় করে বাড়ীতে নিয়ে গেলেন এবং বললেন, এটা আমার মাথার মুকুট। শেখ নিজাম (র.)'র একটি কাশ্মীরী শাল ছিল যা অনেক দর্শনার্থী ব্যবহার করতেন। প্রকৃত পক্ষে খানকাহ্ ছিল আধ্যাত্মিক সাধনা ও ত্বরিকা চর্চার এক অনুপম প্রাণ কেন্দ্র।

শেখ নিজাম (র.) শিষ্যদের সাধনার স্তর অনুযায়ী বিভিন্ন ছোট ছোট দলে তাদেরকে বিভক্ত করে প্রতিটি দলের জন্য একজন প্রশিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য দায়িত্ব দিতেন। প্রাথমিক স্তরের শিষ্যদের জন্য অপেক্ষাকৃত কম অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রশিক্ষক, মাধ্যমিক স্তরের জন্য আর একটু বেশী অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক এবং উচ্চ স্তরের জন্য বেশ সিনিয়র প্রশিক্ষকদেরকে প্রশিক্ষণ বা তালিম দেয়ার দায়িত্ব দিতেন। ফলে প্রশিক্ষণার্থীরা তাদের সমাজ জীবন, ব্যক্তি জীবন, ধর্মীয় জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে পেত এবং স্রষ্টার নৈকট্য লাভের সুযোগ লাভ করত। শেখ নিজাম (র.) উপদেশের চাইতে উদাহরণের মাধ্যমে পাঠদানের ওপর গুরুত্ব প্রদান করতেন। দর্শনার্থীরা যখন বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য আসতেন, তখন তিনি উদাহরণের মাধ্যমে সেগুলোর সমাধান দিতেন। এ প্রসঙ্গে নিম্নে দু'একটা দৃষ্টান্ত দেয়া হলোঃ

হযরত নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.) বললেন, "শেখ আলী নামক এক লোক তার পা দুটো সামনের দিকে প্রসারিত করে বসে কাপড় সেলাই করছিলেন। এমন সময় তার দেশের বাদশাহ্ ঝটিকা সফরে বের হলেন। বাদশাহ্‌র আগে উজির এসে শেখ আলীকে পা গুটিয়ে নিয়ে বাদশাহ্‌কে সম্মান দেখাতে বললেন। লোকটি কর্ণপাত করলনা। বাদশাহ্ যখন তথায় পৌঁছলেন তখন লোকটি উজিরের হাতটি বগলে নিয়ে বললেন, আমি কোন অনুগ্রহের জন্য হাত পাতিনা। তাই আমি আমার পা প্রাসারিত করতে সক্ষম হয়েছি।"

এ উদাহরণের মাধ্যমে এ শিক্ষাই দেয়া হল যে কারও কাছে কিছু পাওয়ার প্রত্যাশা না করে জীবিকা অর্জনের চেষ্টা করা শ্রেয়।

শেখ নিজাম (র.) বর্ণনা করেন, “শেখ হাসান আফগান শেখ বাহাউদ্দিন জাকারিয়ার শিষ্য ছিলেন। তিনি বাজারে থাকা অবস্থায় আজান শুনতে পেলেন এবং নামায পড়ার জন্য যাত্রা বিরতি করে নামায পড়লেন। জামাত সহকারে নামায পড়ার পর তিনি ইমাম সাহেবের কাছে গিয়ে মৃদুস্বরে বললেন, “আপনি যখন নামায পড়াচ্ছিলেন, আমি তখন আপনার সাথে ছিলাম। আপনি তখন এখান থেকে দিল্লী গিয়েছিলেন। সেখানে আপনি কয়েকজন ক্রীতদাস কিনেছিলেন। তারপর আপনি মুলতানে ফিরে আসলেন। অতঃপর আপনি ঐ ক্রীতদাসগুলো নিয়ে খোরাশান গেলেন। আমিও আপনার সাথে এখান থেকে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। শেষ পর্যন্ত আপনি আমাকে কোথায় ফেলে এলেন?” এ ঘটনা থেকে বুঝা গেল যে, একমন এক ধ্যানে নামায না পড়লে নামায হবেনা।

হযরত শেখ নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.)’র জামাত খানায় তাঁর যে সকল সিনিয়র শিষ্য অবস্থান করতেন তাঁরা সবাই ইসলামী বিধানের কোন না কোন শাখায় সুপণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁদের বিজ্ঞতার সুনাম সর্বত্র সুবিস্তৃত ছিল। এঁদের মধ্যে মাওলানা সামছুদ্দীন ইয়াহিয়া, মাওলানা ফখর উদ্দিন জার্‌রাদী, কাজী মহিউদ্দিন কাশানী, মাওলানা ওয়াজি উদ্দিন পাইলী, খাজা করিম উদ্দিন, শেখ নাসির উদ্দিন চিরাগ প্রমূখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জ্ঞানী-গুণীদের সমাবেশের কারণে জামাত খানার শান, মান ও মর্যাদা অতি উচ্চস্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। জামাত খানায় অবস্থানকারী শিষ্যদের পোষাকের কোন নিয়ম ছিলনা। তবে শেখ নিজাম (র.) মহানবী (দ.)’র আদর্শ অনুসরণে সাদা পোষাক পরিধান করাকে পছন্দ করতেন।

ফুতুহ্ /উপ-ঢৌকন/ হাদিয়া/ নজর-নেয়াজ সম্পর্কে শেখ নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.)’র দৃষ্টিভঙ্গী: শর্তযুক্ত বা নিঃস্বার্থ নয় এরূপ ফুতুহ্ বা হাদিয়া গ্রহণের ক্ষেত্রে শেখ নিজাম (র.) কড়া নীতির প্রচলন করেন। নিয়ম বা নীতিগুলো নিম্নরূপ:

ক. কোন তারিখ বা সময় নির্দিষ্ট করে নিয়মিতভাবে কোন হাদিয়া (Guaranteed payment) গ্রহণ করা যাবেনা। একদা শেখ নিজাম (র.)’র প্রাথমিক জীবনে কাফুর নামক এক ব্যক্তি দুইটি টাকা (টংকা) এনে দিলেন এবং বললেন, “প্রত্যেক শুক্রবারে সুলতান গিয়াস উদ্দিন বলবনের আত্মার মাগফিরাতের জন্য আমাকে কিছু দান করার জন্য আদেশ দেয়া হয়েছে। আপনি যদি অনুমতি দিন, তা’হলে প্রত্যেক শুক্রবারে আমি আপনার জন্য কিছু পাঠিয়ে দেব।” শেখ নিজাম (র.) সম্মতি দিলেন এবং প্রতিশ্রুতি মোতাবেক তাঁর কাছে টাকা পাঠানো হলো। এরপর একদা এক সেমা মাহফিলে শেখ নিজাম (র.) যখন ভাব-বিহ্বল অবস্থায় উপরের দিকে হাত তুললেন, তখন তাঁর কাছে এল্‌হাম হল; “যে ব্যক্তি নির্ধারিতভাবে নিয়মিত দানের টাকা গ্রহণ করে, সে ব্যক্তির এভাবে হাত তোলার অধিকার নেই।”

এ এল্‌হাম পাবার পর শেখ নিজাম (র.) দানের টাকা ফেরৎ দেবার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং আর কোনদিন এভাবে নির্ধারিত দান (Guaranteed Payment) গ্রহণ করেননি।

খ. যদি দান শর্তযুক্ত হয় এবং এর সাথে কোন কাগজ আঁটা থাকে (যে কাগজে শর্ত লেখা থাকে), তবে ঐ দান নিষিদ্ধ।

গ. কোন স্থাবর সম্পত্তি যথা: জমি, দালান প্রভৃতি ফুতুহ্ বা দান হিসেবে গ্রহণ করা যাবেনা।

ঘ. ফুতুহ্ (Futuh) হিসেবে যা কিছু পাওয়া যাবে তা তাৎক্ষণিকভাবে বিলিয়ে দিতে হবে এবং আগামীকালের জন্য কিছু রাখা যাবেনা।

ঙ. শেখ নিজাম (র.) প্রত্যেক শিষ্যকে তাঁদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত দান গ্রহণ না করার এবং সামর্থ্যের অতিরিক্ত দান না করার জন্য উপদেশ দিতেন। তাঁর শিষ্য জনাব জামাল কিয়াম উদ্দীনের বর্ণনা অনুযায়ী শেখ নিজাম (র.) কোন কোন শিষ্যকে দানের এক দশমাংশ নিজের জন্য রাখার এবং বাকী দান বিলিয়ে দেবার জন্য উপদেশ দিতেন। আবার কোন কোন শিষ্যকে দানের ১৫ অংশ রাখার, কাউকে ১৪ অংশ রাখার জন্য উপদেশ দিতেন এবং বাকীটা গরীব দুঃখীদের মধ্যে বন্টন করে দিতে বলতেন। উল্লেখ্য যে, শেখ নিজাম (র.)'র শিষ্য শেখ বোরহান উদ্দিন গরীব এবং মাওলানা ফখর উদ্দিন জেরাদী ফুতুহ্ (Futuh) বা দান হিসেবে যা কিছু পেতেন তার সবটুকুই বিলিয়ে দিতেন। নিজেদের জন্য কিছুই রাখতেন না।

শেখ নিজাম (র.) তাঁর শিষ্যদেরকে মহানবী (দ.) খলীফা ওমর (রা.) কে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তা অনুসরণ করতে বলতেন। মহানবী (দ.) আমীরুল মোমেনীন হযরত ওমর (রা.) কে বলেছিলেন, "তোমার কাছে যদি কোন কিছু অযাচিতভাবে (unsolicited) উপহার বা দান হিসেবে আসে, তা খাও এবং বন্টন করে দাও।" আমীরুল মোমেনীন হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসের উল্লেখ করে শেখ নিজাম (র.) বলেছেন, "মহানবী (দ.) কোন উপহার এক রাতের জন্যও নিজের কাছে রাখেননি, তা বিলিয়ে দিয়েছেন।" বলা বাহুল্য, শেখ নিজাম (র.)'র খানকাহ্‌তে যমুনা নদীর স্রোতের মত দান, উপঢৌকন (ফুতুহ্) প্রভৃতির ঢল নেমেছিল শেখ নিজাম (র.)'র জীবদ্দশায়। অর্থ, খাবার, কাপড়-চোপড় প্রভৃতি স্তুপাকারে জমা হোত। শেখ নিজাম (র.) মানুষের ভালবাসা তথা আত্ম-নিবেদনের প্রকৃতিকে প্রশংসা করতেন এবং তাঁদের মনস্কামনা পূরণের জন্য দোয়া করতেন। বিশাল পরিমাণ ফুতুহ্ আসতে থাকায় শেখ নিজাম (র.)'র দায়িত্ব ও বোঝা বেড়ে যেত। যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি গরীব ও দুঃখী মানুষকে এ সকল ফুতুহ্ বিলিয়ে দিতে না পারতেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি মনে এতটুকু স্বস্তি বা শান্তি পেতেন না।

খানকাহ্‌তে দর্শনার্থীদেরকে খাবার পরিবেশনের ক্ষেত্রে কোন বৈষম্য করা হোতনা। ধনী-দরিদ্র, ক্ষুধার্ত কিংবা ক্ষুধার্ত নয় এরূপ বিচার-বিশ্লেষণ না করে সকল দর্শনার্থীকে দু'বেলা খাওয়ানোর রেওয়াজ ছিল। শেখ নিজাম (র.)'র নির্দেশ ছিল: 'প্রথমে অভ্যর্থনা জানাও, অতঃপর খাবার দাও এবং তারপর কথাবার্তা শুন বা বল।' যেহেতু শেখ নিজাম (র.) প্রায়শ: রোজা রাখতেন, তিনি কেবলমাত্র দর্শনার্থীদের সাথে রাতের খাবারে যোগ দিতেন। যাঁরা

খাবার পরিবেশন করতেন, তাঁদেরকে খাবার পরিবেশনের পূর্বে ভাল করে হাত ধুয়ে ফেলতে হোত। শেখ নিজাম (র.) মহানবী (দ.)'র হাদীসের উল্লেখ করে খাবার পরিবেশনকারীদেরকে মেহমানদের হাতমুখ ধোবার জন্য সাহায্য করতে বলতেন এবং সকলকে খাবার আগে পবিত্র কুরআনের সূরা মায়েদার পঞ্চম আয়াতটি দোয়া হিসেবে উচ্চারণ করতে উপদেশ দিতেন। তিনি বলতেন, খাবার সময় সম্পূর্ণ নীরবতা হল ইহুদীদের কাজ বা রীতি। সুতরাং শেখ নিজাম (র.) খাবার সময় হাল্কা গাল-গল্প পছন্দ করতেন। উল্লেখ্য, তিনি নিজেও খাবার গ্রহণের সময় হাল্কা গাল-গল্প করতেন। একদা তিনি খাওয়ার প্রারম্ভে লবণ খেয়ে শুরু করলেন এবং সামান্য লবণ মুখে দিয়েই খাওয়া শেষ করলেন। প্রসঙ্গতঃ তিনি বললেন, 'লবণ কুষ্ঠরোগ নিবারণ করে।' তিনি আরও বললেন, 'আঙ্গুল পানিতে ভেজা অবস্থায় লবণ স্পর্শ করা উচিৎ নয়।' হাসান সিজ্‌জী তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন, 'লবণের অধিকারের (হক-এ-নিমক) উপর গুরুত্ব আরোপ করার জন্য খোদাকে ধন্যবাদ।' কাজী মুহিউদ্দিন হাসানী বললেন, 'আপনি একটি লবণাক্ত (Salty) বা মসলাযুক্ত (Spicy) বাক্য উচ্চারণ করেছেন।'

শেখ নিজাম (র.) শুনে বললেন, 'হ্যাঁ, তিনি নিজেও লবণযুক্ত বা লবণের অধিকারী (অর্থাৎ আকর্ষণীয়)। অন্য আর একদিন যখন খাওয়ার পর হাত ধোয়ার জন্য তাঁর সামনে গামলা আনা হল তখন তিনি বললেন, 'আরবীরা এটাকে আবুল ইয়াই' (হতাশার প্রভু) বলে থাকে, কারণ এটা ঘোষণা করে যে খাবার শেষ।' তিনি আরও বললেন, 'হিন্দুস্থানে পানকে 'আবুল ইয়াই' বলে, কারণ খাওয়ার পরেই পান পরিবেশন করা হয়।' একদা খানকাহ্‌তে মুলতানের শেখ রুকুনুদ্দীন আবুল ফতেহ্ তাঁর কাছে ভিনেগারের পেয়ালাটি আনতে বললেন। শেখ নিজাম (র.) বললেন, 'এটা ভাল।' শেখ রুকুনুদ্দীন বললেন, 'এটা ঠক।' শেখ নিজাম (র.) বললেন, 'সেজন্যই আপনি এটা পছন্দ করেছেন।' তিনি খাওয়ার সময় আল্লাহ্‌কে স্মরণ করতে বলতেন এবং তিনি পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি বলে প্রতিটি গ্রাস বা দানা মুখে দিতেন। খানকাহ্‌তে সাধারণত রুটি এবং ঝোলযুক্ত মাংস, তেহরী, কেক, পুডিং, হালুয়া, সমুচা, খিচুরী (বিশুদ্ধ মাখনযুক্ত) প্রভৃতি পরিবেশন করা হোত। কোন কোন সময় মাটির পাত্রে ভিনেগারও পরিবেশন করা হোত। খিচুরী পরিবেশনের ক্ষেত্রে রোজাদারকে অগ্রাধিকার দেয়া হোত। শেখ নিজাম (র.)'র রান্নাঘরে যারা কাজ করতেন তারা এ কাজকে অতীব সম্মানজনক কাজ বলে মনে করতেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, প্রখ্যাত শিষ্য হযরত আমীর খসরু (র.) শেখ নিজাম (র.)'র খানকাহ্‌র রান্নাঘরে থালা-বাসন ধোয়ার কাজ করতেন এবং নিজেকে শেখ নিজাম (র.)'র থালা-বাসন ধৌতকারী বলে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করতেন। ভক্তরা খানকাহ্‌র রুটিকে তাবিজ হিসেবে মনে করতো যা তাদের মনষ্কামনা পূরণ করত বলে তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতো। যখনি কোন ভক্ত শেখ নিজাম (র.)'র কাছে দোয়া চাইত, তিনি তাকে এক টুকরা রুটি দিতেন। শেখ নিজাম (র.) হাসান গাঙ্গুকে এক টুকরা রুটি দিয়ে বলেছিলেন, 'তুমি রাজকীয় ক্ষমতার অধিকারী হবে।' সুলতান আলাউদ্দিন খলজির সহধর্মীনী মালিকা জাহান তাঁর দুই সন্তানকে (খিজির খান ও শাদী খান

ভ্রাতৃদ্বয়) শেখ নিজাম (র.)'র কাছে দোয়া চাইতে পাঠালে শেখ নিজাম (র.) মালিকা জাহানের জন্য দুই টুকরা রুটি দিয়ে ছিলেন। একদা কাজী মুহিউদ্দিন কাসানীকে সুলতান আলাউদ্দিন খলজি জেলে পাঠালে তিনি শেখ নিজাম (র.)'র কাছে দোয়া চেয়ে সংবাদ পাঠান। শেখ নিজাম (র.) তার জন্য তিন টুকরা রুটি পাঠান এবং প্রতিদিন এক টুকরা করে তিন দিনে তিন টুকরা রুটি খেতে বলেন। তিনি নির্দেশমত তিন দিনে তিন টুকরা রুটি খান এবং জেল থেকে খালাস পান। ওরশের সময় যে সকল রুটির টুকরা অবশিষ্ট থাকত সেগুলো মাওলানা বোরহান উদ্দিন গরীব নামক শেখ নিজাম (র.)'র শিষ্য সংরক্ষণ করতেন এবং রোগগ্রস্ত লোকদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন। একদা শেখ নিজাম (র.) ২০ দিন বা আরও অধিক দিনের পুরাতন বাসী রুটি শেখ নাছির উদ্দিন চেরাগকে দিয়েছিলেন। রুটি ছাড়াও শেখ নিজাম (র.) কোন কোন দর্শনার্থীকে তাঁর মুখের চিবানো পান কিংবা তিনি যে পাত্রে পানি খেতেন সে পাত্র থেকে পানি পান করতে দিতেন। এতে মানুষের মনস্কামনা পূর্ণ হতো। শেখ নিজাম (র.) খানকাহ্‌তে অবস্থানকারী জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের মাঝে যুক্তিপূর্ণ আলাপ আলোচনাকে উৎসাহিত করতেন। কিন্তু খানকাহ্‌তে অহেতুক তর্ক-বিতর্ক, ঝগড়া করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ছিল। রাজকীয় কর্মকর্তা, রাজপুত্র, নবাব, সুলতান, বাদশাহ্ বিভিন্ন সিলসিলার বুজুর্গানে দ্বীন তথা সর্বস্তরের জনগণের অবাধ গমন ছিল শেখ নিজাম (র.)'র খানকাহ্‌য়। তাঁরা শেখ নিজাম (র.)'র নিকট থেকে দোয়া নিয়ে ধন্য হোত। কেউ আধ্যাত্মিক বা আত্মিক উন্নতির জন্য আসত, আবার কেউবা আসত ব্যক্তিগত বা পার্থিব বিপদ-আপদ থেকে মুক্তি কিংবা নিজ নিজ আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য। শেখ নিজাম (র.) চেহারা দেখে তাদের মনের খবর বুঝতে পারতেন এবং যার যার সমস্যার প্রকৃতি অনুযায়ী সমাধান দিতেন। বহু বাস্তব দৃষ্টান্ত থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। নিম্নে দৃষ্টান্ত সমূহের কয়েকটি উল্লেখ করা হলো:

১. নাগোড় থেকে আগত এক বৈষয়িক পণ্ডিত (Externalist scholar) শেখ নিজাম (র.)'র কাছে এসে মুরীদ হতে ইচ্ছা প্রকাশ করল। শেখ নিজাম (র.) তাতে সম্মতি দিলেন না, কিন্তু তার মুরীদ হবার প্রকৃত কারণ কী তা অকপটে প্রকাশ করার জন্য বললেন। লোকটি তা বলতে প্রস্তুত ছিলনা, কিন্তু শেখ নিজাম (র.) বারবার পীড়াপীড়ি করাতে সে বলল যে, নাগোড়ে তাকে কিছু জমি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে যা এলাকার একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি দখল করতে দিচ্ছেনা। তাই সে জমিটি পাওয়ার জন্য শেখ নিজাম (র.)'র মুরিদ হতে চায়। শেখ বললেন, 'যদি আমি তোমাকে একটি সুপারিশ পত্র তোমার মাধ্যমে ঐ ব্যক্তির কাছে দেবার জন্য লিখে দিই এবং তুমি যদি জমিটি পাও তাহলে কি তুমি আমার কাছে মুরিদ হবার ধারণা ত্যাগ করবে?' লোকটি বলল, হ্যাঁ। শেখ নিজাম (র.) তাকে সুপারিশ পত্র দিলেন এবং সে চলে গেল।

২. এক ব্যক্তি মীরাট থেকে শেখ নিজাম (র.)'র কাছে এসে বলল, 'আমার একটি মেয়ে আছে। অর্থের অভাবে তাকে বিয়ে দিতে পারছিনা।' শেখ নিজাম (র.) দোয়ার চিহ্ন হিসেবে

তাকে একটি টাকা (টংকা) দিলেন। এর ফলে সুলতান আলাউদ্দিন খলজির স্ত্রী কোন না কোনভাবে তার অভাবের কথা জানতে পারেন এবং তার মেয়ের বিয়ের খরচ মেটান।

৩. খাজা মোবারক গোপামাবী যখনি দিল্লীতে আসতেন, তখনি তিনি আলাউদ্দিন খলজির দরবারে যেতেন এবং তাঁকে একটি খিলাত (সম্মানজনক লম্বা ঢিলা পোশাক) দেয়া হতো। কিন্তু একবার সুলতান তাঁকে 'খিলাত' না দিয়ে একটি সাদা কাপড় দিলেন। এতে তিনি হতাশ হলেন। শেখ নিজাম (র.) যখন এটা জানতে পারলেন, তখন তিনি বড় বড় শব্দে কবিতার দু'টি ছত্র আওড়াতে লাগলেন 'রাজার উপহার মূল্যবান, সেটা হতে পারে স্বর্ণমুদ্রা, নতুবা নারকেলের ফাঁস। এ বাণী খাজা মোবারকের উপরে দারুন প্রভাব বিস্তার করে এবং তার অন্তরের দুঃখ চলে যায়।

৪. আমীর খসরু তাঁর কণ্ঠ ও সুর যাতে আকর্ষণীয় ও মোহনীয় হয়, সেজন্য শেখ নিজাম (র.)'কে আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করতে অনুরোধ করলেন। শেখ নিজাম (র.) তাঁকে এক প্লেট চিনি আনতে বললেন এবং চিনিগুলো তাঁর খাটের নীচে রেখে দিতে বললেন। অতঃপর চিনিগুলো মাথার উপরে বৃত্তাকারে গড়াতে বললেন এবং চিনিগুলো থেকেও কিছু নিজেকে খেতে বললেন। বলা বাহুল্য, এতে তাঁর কণ্ঠ ও সুর অতি আকর্ষণীয় হয়।

৫. কাজী মুহিউদ্দিন কাসানীর সাথে তাঁর স্ত্রীর সম্পর্ক ভাল যাচ্ছিলনা। সম্পর্ক এত খারাপ হয়েছিল যে তিনি তাঁর স্ত্রীকে তালাক দেবার জন্য মনস্থ করলেন। এ ব্যাপারে তিনি শেখ নিজাম (র.)'র পরামর্শ চাইলেন। শেখ নিজাম (র.) এ ব্যাপারে সম্মতি দিলেন না। বলা বাহুল্য, কিছুদিন পর তাঁর স্ত্রীর সাথে তাঁর সম্পর্ক ভাল হয়ে যায়।

৬. মাওলানা ওয়াজিউদ্দিন পাইলী যক্ষায় ভূগছিলেন। একদিন শীতকালের সন্ধ্যায় তিনি খানকাহ্‌তে আসেন। শেখ নিজাম (র.) সবেমাত্র রোজা খুলেছেন। তিনি মাওলানা পাইলীকে (Paili) টাট্‌কা মুণ্ডি খেতে দিলেন। তিনি ইতস্ততঃ করতে লাগলেন, কারণ মুণ্ডি তাপ বাড়ায় এবং এতে তাঁর রোগ বেড়ে যেতে পারে। কিন্তু অবশেষে তিনি তা খেলেন এবং ভাল বোধ করতে লাগলেন।

৭. মোহাম্মদ হাজী নামক এক ব্যক্তি কেবলমাত্র হজ্ব থেকে এসেছেন। তিনি হজ্ব করে আসলেও অন্তরে তৃপ্তি ও রূহানী শান্তি পাচ্ছিলেন না। তিনি কাজী মুহিউদ্দিন কাসানীর মাধ্যমে শেখ নিজাম (র.)'র দোয়া চাইলেন। শেখ নিজাম (র.) তাঁকে তাঁর ডান হাত বুকে চেপে ধরে নিম্নোক্ত পবিত্র কুরআনের আয়াতটি দৈনিক ৭ বার করে আবৃত্তি করতে বললেন:

তিনিই আল্লাহ্ যিনি বিশ্বাসীদের অন্তরে শান্তি প্রেরণ করেন যাতে তাদের বিশ্বাস বা ঈমান বৃদ্ধি পায়। কারণ আল্লাহ্‌ই স্বর্গ এবং মর্ত্যের সকল শক্তির মালিক এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ ও মহাজ্ঞানী।" (সূরা আল-ফাত্‌হ্, ৪৮:৪)।

৮. কাজী মুহিউদ্দিন কাসানীর ছেলে আবদুল্লাহ্ খুবই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তিনি শেখ নিজাম (র.)'র নিকট দোয়া চাইলেন। শেখ নিজাম (র.) তাঁকে বললেন, 'একজন ব্যক্তির একমাত্র পুত্র রোগাক্রান্ত হয়ে মারা গেলে মৃত ব্যক্তির বাবা ধৈর্য সহকারে এতবড় শোক সহ্য করেছিলেন নীরবে। এজন্য মহান করুণাময় আল্লাহ্ তাকে পুরস্কৃত করেন।" শেখ নিজাম (র.)'র কথা শুনে কাজী মুহিউদ্দিন কাসানী ধৈর্য ধারণ করলেন এবং মনে সাহস পেলেন।

৯. শেখ নাছির উদ্দিনের পৌত্র একজন অসৎ চরিত্রের লোক ছিল। সে শেখ নিজাম (র.)'র সামনে দোয়াত, কলম ও কাগজ রাখল এবং শেখ নিজাম (র.) কে কোন এক গভর্নরের কাছে একটি সুপারিশ পত্র লিখে দিতে বলল যাতে গভর্নর তাকে কিছু জিনিস দেয়। শেখ নিজাম (র.) বললেন, "আমি তাকে সুপারিশ পত্র লিখতে পারবনা, যেহেতু সে কোনদিন আমার কাছে আসেনি। আমাকে বল গর্ভনরের কাছে তুমি কি চাও। আমি তা তোমাকে দেব।" লোকটি বলল, "আপনার যা খুশী তা আমাকে দিন। তবে সুপারিশ পত্রটিও লিখে দিতে হবে।" শেখ নিজাম (র.) বললেন, "পারবনা। যে লোককে আমি চিনিনা এবং যে কোনদিন আমার কাছে আসেনি তার কাছে সুপারিশ পত্র লেখা দরবেশদের রীতি নয়।" লোকটি শেখ নিজাম (র.) কে নিম্নোক্তভাবে গালাগালি করতে লাগল:

"নিজাম উদ্দিন! তুমি হলে আমার পিতামহের শিষ্য এবং দাস। আমি খাজার বংশধর। আমি তোমাকে সুপারিশ পত্র লিখতে বললাম। তুমি লিখলেনা।" এ কথাগুলো বলে লোকটি সে দোয়াতটি হাতে নিয়ে মাটিতে ছুঁড়ে মারল এবং প্রস্থান করতে উদ্যত হল। শেখ নিজাম (র.) তাঁর হাত বাড়িয়ে লোকটির জামা ধরে ফেললেন এবং বললেন, "তুমি অসন্তুষ্ট হয়ে চলে যাচ্ছ। তোমার রাগ ফেলে দাও এবং তারপর যাও।"

খানকাহ্তে যে সকল জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি শেখ নিজাম (র.)'র দোয়া নিতে আসতেন, তাঁদেরকে তিনি সম্মান করতেন এবং তাঁদের সাথে বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে মতবিনিময় করতেন। কারো মতামত পছন্দ না হলেও তার প্রতিবাদ না করে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে নিজের মতামত ব্যক্ত করতেন। একদা সুলতানের প্রখ্যাত বুজুর্গ মাওলানা শেখ রুকুনুদ্দীন ইসমাঈল এবং তাঁর ভ্রাতা মাওলানা ইমাদ উদ্দীন শেখ নিজাম (র.)'র দরবারে আসেন। মাওলানা ইমাদ উদ্দীন তাঁর ভাই শেখ রুকুনুদ্দীনকে জিজ্ঞাসা করলেন, "মহানবী (দ.) এর মক্কা শরীফ থেকে মদীনা শরীফে হিজরত করার উদ্দেশ্য কী ছিল?" মাওলানা রুকুনুদ্দীন আশা করেছিলেন যে, শেখ নিজাম (র.) প্রশ্নটির উত্তর দেবেন। কিন্তু শেখ নিজাম (র.) মাওলানা রুকুনুদ্দীনকে এ প্রসঙ্গে বলার জন্য অনুরোধ করলেন। শেখ রুকুনুদ্দীন বললেন, "সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে নবুয়তের পরিপূর্ণতা এবং সম্মান মহানবী (দ.)'র জন্য সংরক্ষিত ছিল এবং মহানবী (দ.) মদীনায় হিজরতের পর তা চূড়ান্তভাবে বিকশিত ও অর্জিত হয়।" শেখ নিজাম (র) দ্বিমত পোষণ না করে বললেন, "মদীনায় মহানবী (দ.)'র হিজরতের উদ্দেশ্য ছিল মদীনার লোকদেরকে পরিপূর্ণ মানবে (ইনছানে কামেল) পরিণত করা যার জন্য

মহানবী (দ.)'র দৈহিক উপস্থিতি প্রয়োজন ছিল।" এভাবে উভয়ে একে অপরের সাথে কোন তর্ক না করে ভদ্রভাবে নিজ নিজ মতামত ব্যক্ত করলেন। কত চমৎকার ও সুন্দর উদাহরণ।

শেখ নিজাম (র.) শেখ রুকুনুদ্দীন মুলতানীকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। শেখ নিজাম (র.) কোন দর্শনার্থীকে খালি হাতে বিদায় দিতেন না। তাদের হাতে কোন না কোন বস্তু তাবাররুক হিসেবে দিতেন। একজন ভক্ত শেখ নিজাম (র.) কে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি সবাইকে দান করেন কেন?" উত্তরে শেখ নিজাম (র.) বললেন, "দান করা বা উপহার দেয়া মহানবী (দ.) এর সুন্নাহ্। অতঃপর তিনি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে বললেন, "কোন দর্শনার্থী যদি খালি হাতে ফিরে যায়, তবে মনে করতে হবে যে, সে যেন মৃত ব্যক্তির সাথে দেখা করে গেল।" এটা শুনে এক শিষ্য বললেন, "শেখ রুকুনুদ্দীন মুলতানীতো কাউকে কোন বস্তু দান করেন না কিংবা উপহার দেননা।" উত্তরে শেখ নিজাম (র.) বললেন, "আমি দান করি বস্তুগত জিনিস, আর শেখ রুকুনুদ্দীন দান করেন রূহানী জিনিস"। অন্য এক প্রসঙ্গে শেখ নিজাম (র.) বলেছিলেন, "শেখ রুকুনুদ্দীন পার্থিব এবং আধ্যাত্মিক উভয় জগতকে জয় করেছেন।" উল্লেখ্য যে, শেখ রুকুনুদ্দীন যখন সুলতানের দরবার থেকে খানকাহতে আসতেন তিনি তখন অজু করে আসতেন। তিনি বলতেন, 'যে অজু নিয়ে আমি সুলতানের দরবারে গিয়েছি, সে একই অজু নিয়ে আমি শেখ নিজাম (র.)'র দরবারে আসতে পারিনা।" গুলবাগার সৈয়দ মুহাম্মদ গিসু দারাজ বর্ণনা করেন, "খোরাসানী নামক এক খানকাহ্‌র সেবক খানকাহ্‌র ভাণ্ডার থেকে সাতশত টাকা (টংকা) ঋণ নিয়েছিল। কিন্তু নির্দিষ্ট সময় পার হবার পরও সে তা পরিশোধ করতে অনীহা প্রকাশ করল। খানকাহ্‌র ভাণ্ডারের প্রধান ব্যবস্থাপক ইকবাল তাকে শিকল দিয়ে বেঁধে একটি ঘরের মধ্যে তালাবন্দী করে রাখল। ইকবাল যখন দুপুরে তার বাসায় বিশ্রামের জন্য গেল, তখন লোকটি উচ্চস্বরে চীৎকার করতে লাগল এবং তালা ভেঙ্গে কক্ষ থেকে বের হয়ে আসতে চাইল। দারোয়ান তাকে এরূপ না করার জন্য বারবার বারণ করতে লাগল। ইত্যবসরে হৈ চৈ এর শব্দ শেখ নিজাম (র.)'র কানে গেল। তিনি চিন্তিতভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, 'দরজায় কে?' শেখ নিজাম তার পায়ে শিকল দেখে কাঁপতে শুরু করলেন এবং বললেন, "তোমার পায়ে এ শিকল কে পরিয়েছে?" খোরাসানী বলল, "খাজা ইকবাল। কারণ আমি সাতশত টাকার জন্য খানকাহ্‌র কাছে ঋণী।" লোকটির কথা শুনে শেখ নিজাম (র.) তৎক্ষণাৎ ইকবালকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, "টাকার মালিক আল্লাহ্। এই টাকার কিছু অংশ আমরা খাওয়ার জন্য ব্যয় করেছি এবং বাকীটা এই গরীব লোকটি নিয়েছে। তাকে বন্দী করে রাখার কী অধিকার তোমার আছে?" তিনি একজন কামারকে ডাকলেন, কামার শিকল কেটে দিল এবং সে মুক্তি পেল।

আর একদিনের ঘটনা। এ ঘটনাটিও সৈয়দ মুহাম্মদ গিসু দারাজ থেকে বর্ণিত। একদিন একজন ভক্ত শেখ নিজাম (র.)'র জন্য কিছু স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে এলেন। তখন ছিল নামাযের সময়। শেখ নিজাম (র.) এক বালককে বললেন, "এগুলো রেখে দাও। এটা সঠিক সময় নয়। আগামীকাল বণ্টন করে দেব।" শেখ নিজাম (র.) ভুলে গেলেন। উল্লেখ্য যে জীবনের

শেষ দিনগুলোতে শেখ নিজাম (র.)'র স্মৃতিশক্তি হ্রাস পেয়েছিল। ইকবাল মনে করল যে, হুজুর বোধহয় ব্যাপারটা সম্পূর্ণরূপে ভুলে গিয়েছেন। সে স্বর্ণমুদ্রাগুলো তার বাড়ীতে নিয়ে গেল। এমন সময় একদিন শেখ নিজাম (র.) আকস্মিকভাবে ইকবালকে স্বর্ণমুদ্রাগুলো আনতে বললেন। ইকবাল স্বর্ণমুদ্রাগুলো এদিক সেদিক তালাশ করতে লাগল। শেখ নিজাম (র.) বুঝতে পারলেন যে, ইকবালই স্বর্ণমুদ্রাগুলো নিয়েছে। শেখ নিজাম (র.) বললেন, 'ইকবাল! আমরা মুদ্রাগুলো চাশ্তের সময়ে অনেক লোকের মধ্যে বণ্টন করতে চেয়েছিলাম। যাই হোক, আল্লাহ্ তা একজন লোককে দিয়েছেন। তুমি কেন এদিক সেদিক খোঁজাখোঁজি করছ?"

উপরোক্ত উদাহরণগুলো থেকে এটা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, ওলী-বুজুর্গদের প্রতিটি কাজ বা কথার মধ্যে তাৎপর্য বা নিগূঢ় খোদায়ী রহস্য নিহিত রয়েছে এবং তাঁদের প্রতিটি কাজ বা কথা মানবতা তথা সৃষ্টির কল্যাণেই সংঘটিত হয়। তাঁরা আল্লাহ্র হুকুমে মানুষের মনের খবর জানেন।

সপ্তম অধ্যায়

সেমা মাহ্ফিল ও
হযরত নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.)'র খানকাহ্

আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে শেখ নিজাম (র.) সেমার প্রতি ভীষণ অনুরক্ত ছিলেন। শিষ্যদের ভক্তি আপ্লুত চিত্তে গাওয়া মরমী (কাওয়ালী) সঙ্গীতের তালে তালে পেশাদার বাদকদলের বাদ্যযন্ত্রের মূহুর্মূহু ধ্বনিতে খানকাহ্ মুখরিত থাকত। কিন্তু শেখ নিজাম (র.) কারা কারা সেমা মাহফিলে অংশ গ্রহণ করবে, কোন্ বাদ্যযন্ত্র বাজাবে এবং কখন সেমা মাহফিল অনুষ্ঠিত হবে– এসব বিষয়ে কড়া নিয়ম আরোপ করতেন। কারো খেয়াল খুশীমত যখন তখন যেনতেন প্রকারে সেমা মাহফিল করা যেতনা। সঙ্গীত ইসলামে নিষিদ্ধ আলেমদের এরূপ ফতোয়ার সাথে তিনি দ্বিমত পোষণ করতেন এবং মহানবী (দ.)'র হাদীসের আলোকে তিনি আধ্যাত্মিক সঙ্গীত বৈধ বলে দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করতেন এবং আলেমদের সাথে যুক্তি তর্ক করতেন। আলেমগণ অবশ্য এ ব্যাপারে ইমাম আজম আবু হানিফা (রা.)'র কোন ইতিবাচক ফতোয়া বা রায় আছে কিনা তা দেখানোর জন্য শেখ নিজাম (রা.)কে পীড়াপীড়ি করতেন। সুলতান গিয়াস উদ্দিন তুঘলকের রাজত্বকালে খোলা ময়দানে সেমা মাহফিল করার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। কিন্তু শেখ নিজাম (র.) ঐ সময়ে ও খানকাহ্তে সেমা মাহফিল চালিয়ে যেতে থাকেন। সাধারণতঃ তাঁর নিজ কক্ষে দোতলায় তিনি সেমা মাহফিলের আয়োজন করতেন। যখন শেখ নিজাম (র.) সেমা মাহফিলে বসতেন, তখন মরমী (কাওয়ালী) সঙ্গীত শুনে তিনি আধ্যাত্মিক ভাবে বিভোর হয়ে যেতেন এবং তাঁর চোখ থেকে ঝর্ ঝর্ করে অশ্রু গড়িয়ে পড়ত। তিনি খোদার মোহে আবিষ্ট হয়ে সঙ্গীতের তালে তালে নাচতে থাকতেন। তাঁর শিষ্য ইকবাল পাতলা কাপড়ের পিস থেকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে তাঁকে দিতেন এবং তিনি তা' দিয়ে তাঁর চোখ মুছে অশ্রু ভেজা কাপড়ের ছেঁড়া টুকরাগুলো কাওয়ালের (কাওয়ালী সঙ্গীত শিল্পী) সামনে ছুঁড়ে মারতেন। শেখ নিজাম (র.) যাঁদের সঙ্গীত (কাওয়ালী) পছন্দ করতেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল হাসান বদ্দী, আমির হাজী [হযরত আমির খসরু (র.)'র পুত্র] প্রমুখ। কোন কোন সময় তিনি ভাবে এত বেশী তন্ময় হয়ে যেতেন যে, তাঁর পাশে বসে থাকা খাজ মুসাকে (শেখ ফরিদ (র.)'র নাতি) টেনে দাঁড় করিয়ে দিতেন এবং তাঁর সাথে নাচতে বলতেন। তিনি কোন কোন সময় শেখ সাদী (র.) রচিত ফার্সী গজলের কয়েকটি লাইন শুনে এত বেশী ভাবাবেগে আপ্লুত হতেন যে, ধ্যানমগ্ন অবস্থায় সারাদিন উচ্ছ্বসিত ও উল্লসিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন ছন্দময়

নৃত্যের ভঙ্গীতে। শেখ নিজাম (র.) হিন্দী গজল ও পছন্দ করতেন এবং হিন্দী গজল শুনেও তিনি ভাবে বিহ্বল হয়ে যেতেন।

ওরশ উদ্‌যাপন ও শেখ নিজাম (র.)'র খানকাহ্:

একদিন এক দর্শনার্থী শেখ নিজাম (র.)কে জিজ্ঞাসা করল, 'ওরশ মানে কী বুঝায়?' তিনি উত্তর দিলেন, 'ওরশ হল বিবাহের ভোজ সভা এবং বরযাত্রীদেরকে আপ্যায়নের মাধ্যমে খুশী করা কিংবা আনন্দে উদ্ভাসিত করা।' তাঁর আধ্যাত্মিক গুরু শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জে শকর (র.)'র ওফাত বার্ষিকী উদ্‌যাপন করা ছিল খানকাহ্‌তে একটি বিরাট উৎসব। প্রত্যেক বৎসর ৫ই মহর্‌রম তারিখে খানকাহ্‌তে শত শত লোকের সমাগম হোত। খাদ্য বা খাবার প্রস্তুত এবং বন্টনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হোত। শেখ নিজাম (র.) ওরশ উপলক্ষে খানকাহ্ এবং শহরের লঙ্গরখানার সকল পাচক/বাবুর্চী ও লঙ্গরখানার ব্যবস্থাপকদেরকে খাবার প্রস্তুতে সাহায্য করার জন্য আহ্বান জানাতেন। শেখ নিজাম (র.) তাঁর সকল বন্ধু-বান্ধব এবং শিষ্যরা ওরশে এসেছেন কিনা সে ব্যাপারে খোঁজ খবর নিতেন। কেউ কোন কারণে ওরশে অংশ গ্রহণ করতে না পারলে বা না আসলে তাদের বাড়ীতে তাবার্‌রুক হিসেবে খাবার পাঠাতেন।

খানকাহ্‌তে মধ্য রাতের দৃশ্য: খানকাহ্ ছিল নামায-কালাম, ইবাদত-উপাসনা, মোরাকাবা-মোশাহেদা প্রভৃতি আধ্যাত্মিক কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু। শেষ বা মধ্য রাতের খানকাহ্‌র পরিবেশ ছিল অসাধারণ– কোথাও হৈচৈ নেই। কেউ এক মন এক ধ্যানে আল্লাহ্‌র জিকির করছে, কেউ তাহাজ্জুদের নামায পড়ছে, কেউবা রোজা রাখার জন্য সেহ্‌রী খাচ্ছে এবং কেউ সূর্য উঠার অব্যবহিত পূর্বে যমুনা নদীর পানিতে অজু করে ফজরের নামাযের জন্য জায়নামাযে বসে অপেক্ষা করছে। কী এক অপূর্ব পূত-পবিত্র দৃশ্য!

অনুসন্ধিৎসু সমালোচকের উত্তরে শেখ নিজাম (র.): খানকাহ্‌য় মাঝে মাঝে কিছু কিছু অনুসন্ধিৎসু সমালোচক শেখ নিজাম (র.)'র পান্ডিত্য যাচাই করার জন্য আসতেন। শেখ নিজাম (র.)'র বুদ্ধিদীপ্ত আধ্যাত্মিক উত্তর শুনে তাঁদের অহমিকা মোমের ন্যায় গলে যেত এবং তাঁরা শিষ্যত্ব বরণ করার জন্য শেখ নিজাম (র.)'র কাছে অনুনয় বিনয় করত। এ প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা প্রয়োজনীয় মনে করছি:

একদা শামসুদ্দীন এবং সদরুদ্দীন নামক দু'জন গরীব কিন্তু প্রতিভাধর ছাত্র খানকাহ্‌র নিকটে যমুনা নদীর তীরে কাপড় ধৌত করছিল। শামসুদ্দীন তার ফুফাত ভাইয়ের দিকে তাকাল এবং বলল, "শেখ নিজাম উদ্দীন (র.) এ এলাকায় বাস করেন। শহরের অনেক লোক তাঁর প্রতি আস্থা রাখে। কিন্তু আমরা জানিনা তাঁর জ্ঞানের গভীরতা কতটুকু। চল, আমরা তাঁর কাছে যাই এবং তাঁর পান্ডিত্য যাচাই করি। কিন্তু আমরা তাঁকে খুব বেশী সম্মান দেখাব না এবং আমাদের মাথা তাঁর সামনে মাটিতে রাখব না। আমরা কেবল মাত্র তাঁকে অভিবাদন জানিয়ে আমাদের আসন গ্রহণ করব।" বলাবাহুল্য, তারা দু'জনেই খানকাহ্‌তে প্রবেশ করে

শেখ নিজাম (র.)কে দেখা মাত্র মাটিতে চুম্বন করল। শেখ নিজাম (র.) তাদেরকে আরামে বসতে বললেন এবং অতঃপর তাদের সাথে কথাবার্তা বললেন। তারা বলল যে, তারা শহরে বাস করে এবং মাওলানা জহির উদ্দিন বোখারীর কাছে 'বাজুদী' (Bazudi) অধ্যয়ন করছে। শেখ নিজাম (র.)কে তারা একটি প্রবন্ধ (Passage) ব্যাখ্যা করতে বলল যা' তাদের শিক্ষক এক সময় ব্যাখ্যা করতে পারেননি এবং পরে ব্যাখ্যা করবেন বলেছিলেন। তাদের শিক্ষকের অক্ষমতার বিষয়টি শেখ নিজাম (র.)কে তারা জানাল। শেখ নিজাম (র.) তা' এত গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও উপলব্ধি নিয়ে ব্যাখ্যা করলেন যে তারা উভয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। তারা যখন প্রস্থানের জন্য দাঁড়াল, তখন শেখ নিজাম (র.) শামসুদ্দীনকে একটি মোটা কাপড় (loin cloth) দিলেন এবং জহির উদ্দিনের জন্য একটি দস্তার (পাগড়ী) দিলেন। উভয়ে পুনরায় ফিরে আসল এবং শেখ নিজাম (র.)'র মুরীদ হয়ে গেল। পরে শামসুদ্দিন এত পান্ডিত্য অর্জন করেছিলেন যে শেখ নাসির উদ্দিন চেরাগও তাঁকে গভীর সম্মানের চোখে দেখতেন।

শেখ নিজাম (র.)'র প্রতিপক্ষ বা বিরুদ্ধবাদী প্রসঙ্গেঃ কিছু কিছু লোক শেখ নিজাম (র.)'র প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিল এবং তাঁর জনপ্রিয়তা ও সম্মানকে সহ্য করতে পারছিলনা। তারা তাঁর দুর্নাম করত, খানকাহ্ সম্পর্কে বিভিন্ন বিদ্রুপাত্মক কথা-বার্তা বলত। শেখজাদা হুশাম উদ্দিন ফারজাম এবং কাজী জালাল উদ্দিন সাকনজী সুলতান গিয়াস উদ্দিন তুঘলক কর্তৃক সেমার বৈধতা সম্পর্কে বিবেচনার জন্য আহুত মাহ্জার (Mahzar) সভায় শেখ নিজাম (র.)'র বিরুদ্ধে প্রচন্ড শত্রুতা দেখাল। শেখ নিজাম (র.) তাদের ঔদ্ধত্যপনার জন্য যতনা বিক্ষুব্ধ হলেন, তার চাইতে বেশী বিরক্ত হলেন সেমার পক্ষে মহানবী (দ.)'র হাদীসকে (সুন্নাহ্কে) অস্বীকার করার জন্য। কিন্তু শেখ নিজাম (র.) সবচেয়ে বিরক্ত হলেন শেখ নুরুদ্দীন ফেরদৌসীর সন্তানদের আচরণ ও মনোভাবে। তারা ছিল অপরিপক্ষ, সন্ত্রাসী ও অসত্য যুবক যারা খানকাহ্র পাশ দিয়ে যমুনা নদীতে নৌকা বাইত এবং প্রচন্ড শোরগোল, হৈ চৈ করে নৌকায় নাচত এবং শেখ নিজাম (র.)'র প্রতি কটাক্ষমূলক উক্তি করত। একদিন সকালে শেখ নিজাম (র.) কাঠের সিঁড়িতে হতাশাগ্রস্ত হয়ে বসেছিলেন, উক্ত যুবকেরা তখন খানকাহ্র পাশ দিয়ে নৌকা বেয়ে যাচ্ছিল এবং শেখ নিজাম (র.) তাঁর জামার হাতা থেকে হাতগুলো বের করলেন এবং দুঃখভরে বললেন, 'কী আশ্চর্য! একজন মানুষ দীর্ঘকাল যাবত ধর্মীয় বা দ্বীনের জন্য তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছে এবং এরূপ লোকও আছে যারা এখনও জিজ্ঞাসা করে, কে তুমি যে আমাদের সাথে সমান হতে চাও?! এ কথা বলার পর পরই দূর্ভাগ্যবশতঃ নৌকাটি ডুবে যায় এবং ফূর্তিতে রত উক্ত যুবকদের দল পানিতে অদৃশ্য হয়ে যায়।

জাওয়ালিক, কলন্দরী এবং হায়দরী দরবেশদের প্রতি শেখ নিজাম (র.)'র দৃষ্টিভঙ্গীঃ খানকাহ্তে যে সকল ভ্রাম্যমান দরবেশদের আগমন ঘটত তাদের মধ্যে জাওয়ালিক, কলন্দরী এবং হায়দরী দরবেশদের আধিক্য দেখা যেত। তাদের ঔদ্ধত্য এবং

খাপছাড়া/অশোভন আচরণ সত্বেও শেখ নিজাম (র.) তাদের কথা শুনতেন, তাদের সাথে ভদ্র ব্যবহার করতেন এবং তাদের চাহিদা পূরণ করতেন। যারা তাঁকে অশোভনীয় কায়দায় সম্বোধন করত, তিনি তাদের কথা ধৈর্য সহকারে শুনতেন এবং তাদের আচরণের প্রকৃতির তাৎপর্য উপলব্ধি করতেন।

মঙ্গোলীয়দের আক্রমণের প্রতিক্রিয়া এবং শেখ নিজাম (র.)'র শিক্ষা: পূর্বেই বলা হয়েছে যে, শেখ নিজাম (র.)'র পূর্ব পুরুষগণ বোখারা থেকে মঙ্গোলীয়দের দ্বারা বিতাড়িত হয়েছিল। মঙ্গোলীয়দের আক্রমণের আশঙ্কায় ভারতও শঙ্কিত ছিল। যখন মঙ্গোলীয়দের আক্রমণের আশঙ্কাজনিত খবর দিল্লীতে পৌঁছল, তখন দলে দলে লোক এসে আত্মরক্ষার জন্য শেখ নিজাম (র.)'র খানকাহ্য় ভীড় জমাল। কারণ খানকাহ্র অবস্থান ছিল মূল শহর থেকে দূরে এবং শেখ নিজাম (র.)'র মত মহান ওলীর নিরাপত্তার ছাতা দ্বারা (রূপক অর্থে) বেষ্টিত। একদা মাওলানা শামসুদ্দিন ইয়াহিয়া, মাওলানা আলাউদ্দিন নীলি এবং আরও কিছু শিষ্য আওয়াধ থেকে শেখ নিজাম (র.)'কে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য আসলেন। সে সময়ে দিল্লী শহরে মঙ্গোলীয়দের আক্রমণের আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল। চারদিন অতিবাহিত হতে না হতেই শেখ নিজাম (র.) তাঁদেরকে গ্রামের বাড়ীতে চলে যেতে বললেন। তাঁরা হতাশ হয়ে বিষন্ন চিত্তে নির্দেশ মোতাবেক খানকাহ্ থেকে বিদায় নিলেন। কিন্তু তিলপট (Tilpat) পৌঁছেই শেখ আলাউদ্দিন নীলি অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হলেন। তাঁরা শেখ নিজাম (র.)'র কাছে খবর পাঠালেন এবং তাঁর নির্দেশ পুনঃবিবেচনা করতে বললেন। আওয়াধ (Awadh) যাওয়ার রাস্তাও নিরাপদ ছিলনা। শেখ নিজাম (র.) খবর পেয়ে তৎক্ষণাৎ তাঁদেরকে তাঁর খানকাহ্য় আনার জন্য নিজের গাড়ীটি (ঘোড়ার গাড়ী) পাঠালেন এবং সাথে কিছু টাকাও দিলেন। আলাউদ্দিন নীলি তাঁর গাড়ীতে বসাটা বেয়াদবীর সামিল মনে করলেন এবং তিনি তাতে না বসে একটি 'ডলি' (doli) ভাড়া করে উক্ত গাড়ীটির পেছনে পেছনে আসলেন। শেখ নিজাম (র.) তাঁদেরকে সাদরে গ্রহণ করলেন এবং শেখ আলাউদ্দিন নীলির অসুখের খবর নিলেন। খানকাহ্র ব্যবস্থাপক ইকবাল তাদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করলেন। খাবারটি ছিল বিশুদ্ধ মাখন মিশ্রিত খিচুড়ি যা' শেখ নিজাম (র.) নিজ হাতে মাওলানা নীলিকে দিলেন। খাবারটি মাওলানা নীলির জন্য উপযোগী ছিল এবং তিনি সুস্থ হয়ে গেলেন। শেখ নিজাম (র.) বললেন, "মঙ্গোলীয়দের আক্রমণ আতঙ্ক সর্বত্র ভীষণ চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শহরতলীর লোকজন শহরে চলে আসছে। ফলে শহরে পানি ও খাবারের অভাব দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে সফরকারীরা দারুন অসুবিধায় পড়েছে। আমি সেজন্যই আপনাদেরকে বাড়ী চলে যেতে বলেছিলাম। কিন্তু তাতে আপনারা নিরাশ হয়ে গেলেন। অথচ নিরাশ হওয়ার কোন কারণ ছিল না।"

শেখ নিজাম (র.)'র খানকাহ্ ছিল একটি সমাজ কল্যাণ কেন্দ্র: খানকাহ্ ছিল সকলের জন্য একটি সেবা ও কল্যাণের কেন্দ্র। কেবল মাত্র খান্কাহ্র লোক কিংবা স্থানীয়দের জন্য নয়। খানকাহ্র আশে পাশে বসবাসকারী সকল প্রতিবেশীরাও খানকাহ্ থেকে বিভিন্ন প্রকারের

দান, সাহায্য লাভ করত। শেখ নিজাম (র.) নিজ হাতে ভিক্ষা ও দান বিতরণ করতেন পর্যাপ্ত পরিমাণে যা' সকলকে বিস্মিত করত। তাঁর দান বা উপহার থেকে আলেম সমাজ, বিশিষ্ট ব্যক্তি ও অভিজাত লোকজন ও বঞ্চিত হোত না। জামাল উদ্দিন বর্ণনা করেন, শেখ নিজাম (র.) যখন বৃত্তি এবং পুরস্কার প্রদানের দ্বার উন্মুক্ত করলেন (অর্থাৎ রেওয়াজ চালু করলেন), তখন বৃত্তি এবং পুরষ্কার প্রদানের প্রবাহ এমন স্তরে পৌঁছল যে ওলামা মাশায়েখ, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ (nobles, maliks, prince etc.), রাজকুমারসহ সকলে বৃত্তি প্রাপ্তদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। ফজরের নামাযের পর থেকে যোহরের নামাযের পূর্ব পর্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণীর দুঃখী মানুষ তাঁর দান গ্রহণের জন্য আসত। তিনি তাদের প্রয়োজন অনুসারে ১০, ২০, ৫০, ১০০টি জিতাল (Jitals), স্বর্ণমুদ্রা, রৌপ্যমুদ্রা এবং দামী কাপড়চোপড় দান করতেন। কেউ খালি হাতে ফিরে যেতনা। শেখ নিজাম (র.)'র ঘরের দু'টো দরজা ছিল যমুনা নদীর দিকে মুখ করে। সাহায্যপ্রার্থী প্রচুর লোকের সমাগম হোত। যদি দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা কোন সাহায্যপ্রার্থীর আনীত মাটির পাত্রটি ভাঙ্গা থাকত, তিনি তা বদলিয়ে নুতন মাটির পাত্র দিতেন। এত মাটির পাত্র কোথা থেকে আসত তা কারও জানা ছিলনা। লোকজন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেত। এ থেকে বোঝা যায় শেখ নিজাম (র.) মানুষের ক্ষুদ্র প্রয়োজন সম্পর্কেও কত সজাগ ছিলেন!

একদিন গ্রীস্মকালে তপ্ত ও প্রখর রোদের ভর দুপুরে গিয়াসপুরের অনেক ঘরে আগুন লেগে গেল। শেখ নিজাম (র.) খুবই চঞ্চল হয়ে উঠলেন। তিনি নগ্নপায়ে মাথায় একটি টুপি (যদিও তিনি সাধারণতঃ পাগড়ী পরতেন) দিয়ে ছাদে উঠে দাঁড়িয়ে থাকলেন যতক্ষণ পর্যন্ত আগুন সম্পূর্ণরূপে নির্বাপিত না হলো। অতঃপর তাঁর শিষ্য ইকবালকে কয়টা ঘর দগ্ধ হয়েছে তা গুণে আসার জন্য পাঠালেন। তিনি প্রত্যেক ঘরের মালিকের/ বসবাসকারীদের জন্য দু'টি রৌপ্য মুদ্রা, দু'টি ট্রে ভর্তি খাদ্য এবং এক বোতল ঠান্ডা খাবার পানি পাঠালেন। সে সময়ে দু'টি রৌপ্যমুদ্রা গৃহস্থালির সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্য কেনার জন্য যথেষ্ট ছিল। শেখ নিজাম (র.)'র তিরোধানের পরও তাঁর এ মানব সেবা ও রীতি অব্যাহত রাখা হয় বলে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও গবেষকের লেখা থেকে জানা যায়।

শেখ নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.) কঠোর রুটিন মেনে চলতেন এবং ব্যস্ততম সময় কাটাতেন। এমনকি অসুস্থ অবস্থায়ও এর কোন ব্যাত্যয় ঘটতনা। ফরজ নামাযের সময়ের সাথে সমন্বয় করে তিনি তাঁর রুটিন তৈরী করতেন। বছরের প্রায় প্রতি দিনই তিনি রোজা রাখতেন এবং সেহরীর সময় হবার আগেই ঘুম থেকে জেগে উঠতেন। সকাল বেলায় তাঁর কপালে স্বর্গীয় আভা চমকাত এবং তাঁর চোখে দেখা যেত প্রশান্তির ছায়া। হযরত নিজাম (র.) জামাত খানায় সকল ফরজ নামায আদায় করতেন। এমনকি ৮০ বছর বয়সেও তিনি কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে আসতেন এবং জামাতে ফরজ নামায আদায় করতেন। সূর্যোদয়ের পর তিনি তাঁর মাদুর বিছিয়ে কাবামুখী হয়ে বসতেন এবং জামাত খানার ছাদে ভক্ত ও দর্শনার্থীদেরকে সাক্ষাৎ দান করতেন। দর্শনার্থীরা তাঁদের সমস্যার কথা বলত এবং তিনি তা

মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করতেন। তিনি সমস্যাগুলোর সমাধান দিতেন এবং সমাধানের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করতে বলতেন। এতে সমস্যাজর্জরিত দর্শনার্থীদের মনে আশার সঞ্চার হোত। দর্শনার্থীরা যে সকল নজর নেয়াজ নিয়ে আসত তা তিনি উপস্থিত সকলের মাঝে বিলিয়ে দিতেন। দুপুরের দিকে তিনি নীচ তলায় একটি কক্ষে সামান্য বিশ্রামের জন্য চলে যেতেন এবং নীচের সম্মেলন কক্ষে যোহরের নামায আদায় করতেন। অতঃপর তিনি দোতলায় চলে যেতেন এবং পুনরায় দর্শনার্থীদের সাথে সাক্ষাৎ দান করতেন। অতঃপর আছর নামাযের জন্য কিছুক্ষণ বিরতি দিয়ে পুনরায় তিনি দর্শনার্থীদের অভাব অভিযোগ শুনতেন। সূর্যাস্ত অবধি এ অবস্থা চলতে থাকত। ইফতারের সময় তিনি আবার নীচ তলায় সম্মেলন কক্ষে চলে আসতেন এবং সকলকে ইফতারে অংশ গ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানাতেন। তিনি জামাত খানায় মাগরিবের নামায আদায় করতেন। গ্রীষ্মকালে মাগরিবের নামাযের পর তিনি দোতলায় চলে যেতেন, কিন্তু শীতকালে তিনি নীচ তলায় এশার নামায অবধি থাকতেন এবং দর্শনার্থীদের কাকুতি মিনতি, আরজি-ফরিয়াদ শ্রবণ করতেন। এশার নামাযের পূর্বে দোতলায় নৈশ ভোজ দেয়া হত। শেখ নিজাম (র.) খুব অল্প আহার করতেন এবং উপস্থিত অভ্যাগতদেরকে আহার করতে বলতেন। অতঃপর তিনি সম্মেলন কক্ষে এশার নামাযের পর দোতলায় চলে যেতেন। কিছুক্ষণ ধ্যানমগ্ন থাকতেন। তারপর তিনি তাঁর খাটে বসে বিশ্রাম নিতেন এবং খাদেম ইকবাল তাঁর হাতে এক ছড়া তসবীহ্ দিতেন। ঐ সময়ে হযরত আমির খসরু (র.) ছাড়া তাঁর কাছে কেউ উপস্থিত থাকতনা। হযরত আমির খসরু (র.) ছিলেন একজন বিখ্যাত কবি যিনি শেখ নিজাম (র.) কে বিভিন্ন খবরাখবর, আলোচনা-পর্যালোচনা শুনাতেন এবং হযরত নিজাম (র.) মাঝে মাঝে তাঁর মাথা নাড়তেন ও আলোচনা চালিয়ে যেতে বলতেন। মাঝে মধ্যে শেখ নিজাম (র.) বলতেন, "হে তুর্কী! আরও বলার আছে কি?" হযরত খসরু (র.) সভা কবি হিসেবে তাঁর প্রতিভা ও দক্ষতা নিয়ে সকল বিষয় নিয়ে শেখ নিজাম (র.)'র কাছে আলোচনা পেশ করতেন। এই সময়ে শেখ নিজাম (র.)'র আত্মীয় স্বজন তাঁর সাথে দেখা করতেন। যখন সবাই চলে যেত, তখন খাদেম ইকবাল এসে অজুর জন্য কিছু পানি দিয়ে যেত। শেখ নিজাম (র.) তখন দরজা বন্ধ করে দিতেন এবং এরপর কেউ আর তাঁকে ডাকতে সাহস করতনা। স্তব্ধ নিশীথে তাঁর কক্ষ থেকে প্রজ্বলিত মোমবাতির আলো ছিটকে বেরিয়ে আসত দরজার ফাঁক দিয়ে। ঐ সময়ে তিনি নিম্নোক্ত ফার্সী কবিতার শ্লোকটি আওড়াতেন মৃদু স্বরেঃ

"দেখতে এসো আমাকে এবং আমার মোমবাতিটারে
যবে মোমবাতিটার শিখা যাবে নিভে
এবং আমার প্রাণবায়ু যাবে দেহ ছেড়ে।"

শেখ নিজাম (র.) রাত্রের বেশীরভাগ সময় প্রার্থনা, পড়াশুনা ও ধ্যানমগ্ন অবস্থায় কাটাতেন। একবার তিনি তাঁর এক শিষ্যকে বলেছিলেন যে, প্রত্যুষে তাঁর মনের কোণে অনেক ধারণা ও কবিতার ছন্দ উঁকি ঝুঁকি মারত এবং এগুলো তাঁকে সীমাহীন স্বর্গীয় আনন্দ দিত। রাত্রের কিছু

সময় তিনি লেখাপড়ায় কাটাতেন। তিনি কিতাব পড়তেন এবং কিতাবের প্রতিটি পৃষ্ঠার প্রান্তে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলো লিখে রাখতেন। কোন কোন সময় আলাদা কাগজেও লিখতেন। তাঁর দৃষ্টিশক্তি ভাল ছিল এবং তিনি পাণ্ডুলিপির অক্ষরগুলো সহজে পড়তে পারতেন।

দুপুর পর্যন্ত তাঁর দরবারে দর্শনার্থীদের ভীড় থাকত স্রোতের মত। দুপুরের পর জনস্রোত কমে আসত এবং তিনি জামাত খানার পাশের কক্ষে মধ্যাহ্ন কালীন বিশ্রামে যেতেন। কিন্তু প্রায়শঃ তিনি খুব একটা বিশ্রাম নিতে পারতেন না। কারণ জনতার আহ্বানে তিনি সাড়া না দিয়ে পারতেন না। তিনি প্রায়শঃ বলতেন, "আমি দু'টো কাজে আনন্দ পাই, (এক) যখন আমি সেমা মাহফিলে যোগদান করি এবং (দুই) – যখন কেউ আমার সাথে দেখা করতে আসে এবং আধ্যাত্মিক বিষয়ে আলাপ আলোচনা করে।" জনগণ যখন তাদের দুঃখের কথা বলত, তখন তিনি বিমর্ষ হয়ে যেতেন। যদিও তিনি কঠোর রুটিন মেনে চলতেন, তথাপি তিনি অসময়ে ও দর্শনার্থীদের ডাকে সাড়া দিতেন। সাধারণতঃ শেখ নিজাম (র.)'র সাথে দেখা করার সময় ছিল সূর্য উঠার পর থেকে যোহরের নামাযের পূর্ব পর্যন্ত। কিন্তু তা তিনি কঠোরভাবে মানতেন না। যে কোন সময় যে কোন দর্শনার্থীকে তিনি সাক্ষাৎ দান করতেন। তিনি বলতেন, "মুসাফির ও ভবঘুরের সরাইখানায় কোন বাধা নাই। তোমরা সবাই আস, বস এবং স্বাভাবিকভাবে কথা বল।" একদা একজন লোক শেখ নিজাম (র.)'র সাথে দেখা করতে আসল যখন তিনি দুপুর বেলায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। তখন আখি মোবারক নামক জামাত খানার একজন খাদেম লোকটিকে তাড়িয়ে দিল। ঠিক সে সময় শেখ নিজাম (র.) শেখ ফরিদ (র.)কে স্বপ্নে দেখলেন। শেখ ফরিদ (র.) স্বপ্নে শেখ নিজাম (র.) কে বললেন, "দর্শনার্থীকে দেবার জন্য কিছুই যদি তোমার না থাকে, তবে অন্ততঃ তাকে সাদরে অভ্যর্থনা জানাও।" এ ঘটনার পর শেখ নিজাম (র.) নির্দেশ জারি করলেন, "আমি যদি নিদ্রিত অবস্থায় থাকি এবং তখন যদি কোন দর্শনার্থী আমার সাথে দেখা করতে আসে, তাহলে আমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলবে। তাকে তাড়িয়ে দেবেনা।" দুপুরে ঘুম থেকে উঠে তিনি খাদেমদেরকে দু'টো প্রশ্ন করতেন: "(১) বেলা অপরাহ্ন হয়েছে কি? (২) কেউ দেখা করতে এসেছিল কি?"

শেখ নিজাম (র.)'র স্বাস্থ্য কখনও ভাল ছিলনা। শেখ নাছিরুদ্দীন চেরাগ এর মতে তিনি প্রায়শ একটা না একটা রোগে ভুগতেন। একটা রোগ ভাল হলে আর একটা রোগ দেখা যেত। শরীরের ব্যথা, জ্বর, অর্শ্ব ইত্যাদি রোগ লেগেই থাকত। তাঁর অসুস্থতায় জামাত থানার সকল খাদেম প্রায়শঃ উদ্বিগ্ন থাকতেন। তাঁর জন্য বিশেষ মুনাজাত করা হোত এবং ভক্তরা বিভিন্ন দান-খায়রাত করতেন। একবার তাঁর শরীর অত্যন্ত ফুলে গিয়েছিল এবং ব্যথায় তিনি অত্যন্ত কাতর ও অস্থির হয়ে পড়লেন। বাদাউন, চাঁন্দেরী, আওয়াধ প্রভৃতি স্থান থেকে শিষ্যরা তাঁকে এক নজর দেখার জন্য দলে দলে আসতে লাগলেন। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য! শেখ নিজাম (র.) যখন আরোগ্য লাভ করলেন, তখন শিষ্যরা জানমালের ছদকা দিলেন এবং ভক্তিভরে তাঁকে সালাম জানালেন। শেখ নিজাম (র.) প্রায়শঃ পাকস্থলীর ব্যথায় ভূগতেন।

একদা কোন এক অসুস্থতার কারণে সাময়িকভাবে তাঁর দৃষ্টিশক্তি কমে গিয়েছিল। তাঁর শিষ্য মাওলানা বোরহান উদ্দিন গরীব তা লক্ষ্য করলেন এবং তিনি শেখ নিজাম (র.)'র দৃষ্টি শক্তি বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য এবং স্বাস্থ্যের উন্নতির নিমিত্তে জামাত খানায় দোয়া মাহফিলের আয়োজন করলেন। কিন্তু ভীষণ অসুস্থ অবস্থায়ও শেখ নিজাম (র.) নফল নামায পড়া ও মোরাকাবা মোশাহেদা করা বন্ধ করলেন না।

একদা সেমা মাহফিলের সময় তিনি ভাবে এত বেশী বিভোর বা তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন যে, তিনি জামাত খানার ছাদ থেকে নীচে পড়ে গেলেন এবং তাঁর পায়ের হাঁড় ভেঙ্গে গেল। এরপর থেকে তিনি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতেন। কোন কোন সমালোচক বলতে লাগল, "শেখ নিজাম (র.)'র আধ্যাত্মিক শক্তি চলে গিয়েছে বলে এ দুর্ঘটনা হয়েছে।" নাউজুবিল্লাহ্। এ সমালোচনা শুনে মুলতানের রুকুনুদ্দীন আবুল ফতেহ্ খুবই মর্মাহত হলেন এবং তিনি সমালোচকদের অজ্ঞতা ও ধৃষ্টতার তীব্র নিন্দা জানালেন।

যদিও শেখ নিজাম (র.)'র চেহারা মোবারক ও চাহনির মধ্যে একটা ধ্যানমগ্ন আবেশ লক্ষ্য করা যেত, তিনি সারাক্ষণ নফল নামায পড়তেন না এবং কুরআন তেলাওয়াত করতেন না। তাঁর নফল নামায পড়ার জন্য এবং কুরআন তেলাওয়াত করার জন্য সময় নির্ধারিত ছিল। একবার এক দর্শনার্থী সাহস করে শেখ নিজাম (র.)কে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি প্রতিদিন কতটুকু কুরআন পড়েন বা তেলাওয়াত করেন?" শেখ নিজাম (র.) উত্তর দিলেন, "এক পারা"। আমির খসরু বর্ণনা করেছেন যে, শেখ নিজাম (র.) প্রত্যেক দিন এশার নামাযের পর দরুদ শরীফ পড়তেন এক হাজার বার এবং সূরা ফাতেহা পড়তেন এক হাজার বার। তিনি প্রত্যেক দিন ইমাম গাজ্জালী প্রণীত 'জাওয়াহিরুল কুরআন' এবং 'হির্জ-ই-ঈয়ামানী' ও 'হির্জ-ই-কাফি' কিতাব থেকে কিছু অংশ তেলাওয়াত করতেন।

জামাত খানায় শেখ নিজাম (র)'র যারা খাদেম ছিলেন তাঁদের মধ্যে মোবাশ্বির, খাজা নাছির, খাজা আবদুর রহিম, খাজা রাজী, ইকবাল, আবদুল্লাহ্ কলি প্রমূখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁরা সর্বদা শেখ নিজাম (র.)'র আহ্বানে সাড়া দেয়ার জন্য প্রতীক্ষায় রত থাকতেন বা অপেক্ষমান থাকতেন এবং শেখ নিজাম (র.)'র ডাকে সাড়া দিয়ে শেখ নিজাম (র.)'র খেদমত করতে পারলে নিজেদেরকে ধন্য মনে করতেন। শেখ নিজাম (র.)'র শিষ্যরা গিয়াসপুর থেকে দু'মাইল দূরে কিলুগড়ী (Kilugarhi) তে তাঁর জন্য একটি ছোট, সুন্দর বাড়ী নির্মাণ করে দেন। কিলুগড়ী জামে মসজিদের দরজার বিপরীতে এ বাড়ীটি অবস্থিত। শুক্রবার সকালে তিনি ঐ বাড়ীতে যেতেন, গোসল করতেন, কাপড় চোপড় পরিবর্তন করতেন এবং কিছু সময় স্রষ্টার ধ্যানে কাটাতেন। এখানে তিনি জুমার নামাযের আগে দর্শনার্থীদেরকে সাক্ষাতও দান করতেন। মসজিদের দক্ষিণ গেইটের নিকটে একটি নির্ধারিত যায়গায় তিনি বসতেন।

গিয়াহপুরে অবস্থানকালে প্রাথমিক অবস্থায় তাঁর কোন পরিবহন ছিলনা এবং তিনি হেঁটেই মসজিদে যেতেন। মাঝে মাঝে রোজা রাখার দরুন তিনি এত ক্লান্ত হয়ে পড়তেন যে তাঁকে পথের মধ্যে কোন দোকানে বসে বিশ্রাম নিতে হোত। মালিক ইয়ার পরান (Malik Yar Parran) নামক এক শিষ্য তাঁকে একটি ঘোড়া উপহার দেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু তাঁর গুরু শেখ ফরিদ (র.)'র নিকট থেকে স্বপ্নযোগে অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত তিনি ঐ ঘোড়া গ্রহণ করেননি। ঘোড়াটি পাওয়ার পর তিনি ঘোড়াযোগেই যাতায়াত করতেন। অবশ্য জীবনের শেষ দিকে তিনি পাল্কী, তাঞ্জাম (Singhasan, Dolah etc) প্রভৃতি ব্যবহার করতেন। খাদেম ইকবাল পাল্কী বা তাঞ্জামের ডান দিকে হাঁটতেন এবং আবদুল্লাহ্ কলি হাঁটতেন বাম দিকে। তাঁরা উভয়ে শেএর বা গজল গেয়ে গেয়ে পথ চলতেন কিংবা পবিত্র কুরআনের আয়াত তেলাওয়াত করতে থাকতেন। শেখ নিজাম (র.) দোলাহ বা তাঞ্জামে বসে যখন তাদের গজল বা শেএর শুনে ভাব বিহ্বল হয়ে যেতেন তখন তাঁর দু'চোখ বেয়ে দর্ দর্ করে অশ্রু ঝরে পড়ত।

শেখ নিজাম (র.) সর্বদা বাইরে বেড়াতে যেতেন না। কিন্তু তিনি দিল্লীতে বিদ্যমান কিছু কিছু বুজুর্গের মাজার জিয়ারতে যেতেন এবং কখনও কখনও যমুনা নদীর তীরে পায়চারী করতে যেতেন। তাঁর জীবনের প্রথম ভাগে বাগে খশরত ও অন্যান্য স্থানে একাকী ধ্যান ও প্রার্থনা করার জন্য যেতেন। একদা তিনি যখন যমুনা নদীর তীরে হাঁটছিলেন, তখন তিনি দেখলেন যে একটি কূপ থেকে একজন মহিলা পানি তুলছে। তিনি মহিলাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "পাশে যমুনা নদী থেকে পানি না নিয়ে সে কূপ থেকে কেন পানি নিচ্ছে। মহিলা উত্তর দিল, "আমার স্বামী এবং আমি নিজে খুবই দরিদ্র। যমুনা নদীর পানি মানুষের ক্ষুধা বাড়ায়। সে জন্য আমি কূপের পানি নিচ্ছি।" মহিলার কথা শুনে শেখ নিজাম (র.) বিমোহিত হয়ে গেলেন। তিনি তাঁর খাদেম ইকবালকে ডেকে বললেন, "আমাদের গিয়াসপুরে একজন মহিলা ছিল যে কখনও ক্ষুধার ভয়ে যমুনা নদী থেকে পানি নিতনা। যাও এবং এ মহিলাকে জিজ্ঞেস কর তার দৈনন্দিন খরচের জন্য কত টাকা প্রয়োজন। প্রত্যেক মাসে মহিলার জন্য কোন প্রকার অবহেলা ছাড়া ঐ পরিমাণ টাকা নিয়মিত পাঠিয়ে দেবে।"

শেখ নিজাম (র.) প্রায়শঃ শেখ নজিব উদ্দিন মোতাওয়াক্কিল (র.), খাজা কুতুব উদ্দিন বখতিয়ার কাকী (র.) এবং তাঁর মায়ের মাজার জেয়ারত করতেন। শেখ নিজাম (র.) যখনি কোন যায়গায় ভ্রমণের জন্য বের হতেন, তাঁর ভ্রমণের খবর শুনে অনেক বেশ্যা মহিলা (Prostitutes) রাস্তায় বের হয়ে আসত। শেখ নিজাম (র.) তাদের দ্বারা বেষ্টিত হবার পূর্বেই তাঁর কিছু খাদেমকে কিছু টাকা সমেত বেশ্যাদের নিকট বন্টনের জন্য বেশ্যাদের কাছে পাঠিয়ে দিতেন যাতে বেশ্যাদের বেষ্টনী এড়ানো যায়, তারা যাতে রাস্তা আগলে না থাকে সেজন্য তাদেরকে রাস্তা থেকে সরিয়ে দেয়া যায় এবং কোন গাছের ছায়ায় গিয়ে যাতে তারা বসে তার ব্যবস্থা করা যায়। শেখ নিজাম (র.) খাজা কুতুব উদ্দিন বখতিয়ার কাকী (র.) এবং কাজী হামিদ উদ্দিন নাগোরী (র.)'র মাজারদ্বয়ের মধ্যবর্তী শূন্যস্থানে বসে

মুনাজাত বা প্রার্থনা করতে ভালবাসতেন। তাঁদের মাজারের মাঝখানে বসে প্রার্থনা করার সময় তিনি এক অনাবিল আধ্যাত্মিক প্রেরণা অনুভব করতেন। কোন কোন সময় তিনি 'সরাই জখরত' এ অবস্থিত মাওলানা রশীদ উদ্দিন (শেখ রশন নামে খ্যাত) এর মাজার জেয়ারত করতেন এবং একটি 'ইমলী গাছ' (Imli Tree) এর নীচে বসে ধ্যান করতেন। তিনি জীবনের প্রথম ভাগে শেখ রশনের মাজারে চল্লিশ দিনের চিল্লায় যেতেন (অর্থাৎ লোকালয় থেকে নির্জনে গিয়ে ধ্যান করতেন)। দিল্লীতে স্থায়ীভাবে বসবাস করার পর তিনি আর বাদাউনে যাননি। তিনি অজোধানে গিয়ে ছিলেন নয় থেকে দশ বার– তিন বার শেখ ফরিদ (র.)'র জীবদ্দশায় এবং ছয় বা সাত বার শেখ ফরিদ (র.)'র ওফাতের পর। দিল্লীতে দীর্ঘ অবস্থানকালে তিনি দিল্লীর বাইরে আর কোন যায়গায় ভ্রমণ করেননি।

শেখ নিজাম (র.) কোন কোন সময় সেমা মাহফিলে যেতেন এবং বাগান, খানকাহ্ এবং দিল্লীতে বিভিন্ন ব্যক্তির বাসায় সেমা মাহফিল ও ভোজের আয়োজন হোত। তিনি প্রত্যেক সোমবারে কাজী মীনহাজ উজ্ সিরাজের বাসায় (যিনি তাবাকত-ই-নাছিরী কেতাবের লেখক) সেমা মাহফিলে যেতেন। যখন মাহফিলে গজল, হামদ্, নাত ইত্যাদি গাওয়া হোত, তিনি ভাবে বিভোর হয়ে নাচতে থাকতেন। আলাউদ্দিন খলজির শাসনামলে জিনিস পত্র খুব সস্তা ছিল এবং মাত্র কয়েক টাকায় বিশাল ভোজ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যেত। দিল্লীতে অনেক লঙ্গর খানার মালিক এ সকল ভোজের আয়োজন করতেন। শেখ নিজাম (র.)কে এ সকল ভোজে আমন্ত্রণ জানানো হোত। তিনি এ সকল ভোজ ও মাহফিলে যোগদান করতেন।

শেখ নিজাম (র.) সময়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতেন। তিনি বলতেন, "একজন সুফি সাধকের কাছে সময় অত্যন্ত মূল্যবান। যদি কেউ অযথা সময় নষ্ট করে, তবে তা হবে অত্যন্ত শোকের। প্রতিটি নিঃশ্বাসের মুহূর্ত খুবই মূল্যবান যদি সে মুহূর্তটা খোদার ধ্যানে ব্যয় করা হয়। খোদার ধ্যানে যে সময়টা ব্যয় করা হবে, সে সময়টাই হবে আসল বা প্রকৃত জীবন।" সময়ের ব্যবহার সম্পর্কে এটাই ছিল তাঁর মূল নীতি।

অষ্টম অধ্যায়

শেখ নিজাম (র.)'র সর্বশেষ শারীরিক অসুস্থতা ও পরপারে পদার্পণ

শেখ নিজাম (র.) যখন ওফাত প্রাপ্ত হন তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। তিনি গভীর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে তাঁর বিশাল ও মহান আধ্যাত্মিক কর্মকান্ড পরিচালনা করে গেছেন। বছরের পর বছর ধরে রোজা রাখা, অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায় তাঁর শরীরের উপর ভীষণ চাপ সৃষ্টি করে। জীবনের শেষ প্রান্তে তিনি এমন অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন যে, একটা না একটা অসুখ তাঁর লেগেই থাকত। গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা, জ্বর, মাথা ব্যথা, অর্শ্ব রোগ প্রভৃতি তাঁর লেগেই থাকত। কিন্তু এত সব অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি তাঁর দৈনন্দিন নির্ধারিত কাজ কর্ম চালিয়ে যেতেন।

তাঁর স্বাস্থ্যের সর্বশেষ অবনতি হয় তখন যখন একদিন তিনি মসজিদে শুক্রবারের নামায আদায় করছিলেন। গভীর ধ্যান ও অজ্‌দ এবং স্মৃতি শক্তি লোপ পাওয়ার ফলে তিনি নুইয়ে পড়েন। বার বার তিনি সেজদায় যাচ্ছিলেন আর উঠছিলেন। এ অবস্থায় তিনি মসজিদ থেকে বাসায় বা নিজ গৃহে ফিরে আসেন। তাঁর স্মরণ শক্তি ক্ষণিকের জন্য ফিরে আসে, কিন্তু আবার চলে যায়। জ্ঞান ফিরে আসলে তিনি শুধু নামায পড়ার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করতে থাকেন। যদিও একই নামায তিনি ইতোপূর্বে পড়েছেন। তিনি বলতে থাকেন, "আজ শুক্রবার, আমি কি নামায পড়েছি?" তিনি একটি শব্দ বারবার উচ্চারণ করতে থাকেন, "আমরা চলে যাচ্ছি!" তাঁর প্রতিটি কথাই ছিল অন্তরের ইচ্ছার রূপক প্রকাশ মাত্র। এ সময়ে তাঁর চোখ বেয়ে অনর্গল অশ্রু গড়িয়ে পড়তে থাকে। একদিন তিনি তাঁর আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, খাদেম সবাইকে ডাকলেন এবং বললেন, "তোমরা সবাই সাক্ষী থাক যে, আমার এই খাদেম ইকবাল যদি লোকদের কাছে আমার জন্য আনীত নজর নেয়াজ বন্টন করতে গিয়ে সামান্য জিনিসও নিজের জন্য রেখে দেয়, তাহলে তাকে রোজ হাসরের দিন আল্লাহ্‌র কাছে সে দ্রব্যের জন্য জবাবদিহি করতে হবে।" এই কথা বলে তিনি ইকবালকে জামাত খানার ভাণ্ডারে যা কিছু জমা আছে তা বিলিয়ে দেয়ার জন্য আদেশ দিলেন। ইকবাল সব কিছু বন্টন করে দিলেন, কেবলমাত্র খানকাহ্‌র (জামাত খানা) লোকদেরকে কয়েকদিন খাওয়ানোর জন্য কিছু গম বা আটা রেখে দিলেন। শেখ নিজাম (র.) যখন সৈয়দ হোসাইন কিরমানী থেকে এ কথা জানলেন, তখন তিনি অসন্তুষ্ট হলেন এবং ইকবালকে বললেন, "তুমি কেন এই মৃত

বালি রেখে দিয়েছো?” তিনি গরীব লোকদেরকে ডাকলেন এবং শস্যভাণ্ডারের দরজা ভেঙ্গে সবকিছু ইচ্ছেমত নিয়ে যেতে বললেন।

খানকাহ্‌র সেবক, আত্মীয় স্বজন এবং সিনিয়র বা বয়োজ্যেষ্ঠ শিষ্যদের মনে দু'টো সমস্যার উদ্রেক হলঃ (১) শেখ নিজাম (র.)'র অবর্তমানে তাদের জীবিকার সংস্থান কোথা থেকে হবে? এবং (২) শেখ নিজাম (র.) ওফাত প্রাপ্ত হলে তাঁকে কোথায় দাফন করা হবে? সমস্যা দু'টো শেখ নিজাম (র.)'র দৃষ্টি গোচর করা হলে তিনি প্রথম সমস্যা সম্পর্কে নিম্নরূপ মন্তব্য করলেনঃ “যারা আমার মাজার প্রাঙ্গণে অবস্থান করবে তাদের জীবিকার কোন অসুবিধে হবেনা। তারা জীবিকার জন্য পর্যাপ্ত জিনিস পাবে।” মাজারের আয় কে সংগ্রহ করবে, নিয়ন্ত্রণ করবে এবং বন্টন করবে সে ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে শেখ নিজাম (র.) বললেন, “যে তার নিজের অংশ ত্যাগ করবে, সেই এ কাজটি করবে।”

মাওলানা সামসুদ্দিন দামখানী ছিলেন সিয়ার-উল-আওলিয়া'র লেখকের মাতামহ এবং শেখ নিজাম (র.)'র বন্ধু ও সহপাঠি। তাঁর মাধ্যমে দ্বিতীয় প্রশ্ন করা হল। উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন ভক্ত ইতোমধ্যে তাঁদের পাকা দালানে শেখ নিজাম (র.) কে সমাহিত করার জন্য ঘর নির্মাণ করে ফেলেছেন। দামখানীর প্রশ্নের উত্তরে শেখ নিজাম (র.) জবাব দিলেন, “মাওলানা! আমি কোন ভবনের নীচে শায়িত হয়ে নিদ্রা যাবার উপযুক্ত নই। আমি খোলা আকাশের নীচে থাকব। প্রায় ৪০ দিন যাবত শেখ নিজাম (র.) আধা সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ছিলেন। ইতোপূর্বে তাঁর খাবারের পরিমাণ খুবই কমে গিয়েছিল। তা' দিন দিন আরও কমে যেতে থাকল। এক পর্যায়ে তিনি খাওয়া বন্ধ করে দিলেন। আখি মোবারক তাঁর জন্য কিছু মাছের স্যুপ এনেছিলেন। তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালেন এবং চলন্ত পানি বা বহমান পানির স্রোতের মাঝে ফেলে দিতে বললেন।

তাঁর এই অসুস্থতার সময় মুলতান থেকে শেখ রুকুনুদ্দীন আবুল ফাত্‌হ তাঁর শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে জানার জন্য আসলেন। শেখ নিজাম (র.) এত দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন যে, তিনি তাঁকে অভিবাদন জানানোর জন্য উঠে দাঁড়াতে পারছিলেন না। শেখ রুকুনুদ্দীন আবুল ফাত্‌হ বার বার শেখ নিজাম (র.)কে তাঁর খাট থেকে উঠতে নিষেধ করলেন। কিন্তু শেখ নিজাম (র.) তা শুনলেন না। শ্রদ্ধাভরে উঠে দাঁড়ালেন কোনমতে। তাঁর জন্য একটি চেয়ার আনা হল। শেখ রুকুনুদ্দীন (র.) একটি হাদীস বর্ণনা করলেন নিম্নোক্ত ভাবে: “নবীদেরকে আল্লাহ্‌তালা বলেছেন যে তাঁরা যদি নির্ধারিত সময়ের চাইতে বেশী সময় বাঁচতে চান তবে সে সুযোগ তাঁদেরকে দেয়া হবে। যেহেতু ওলীরা নবীদের উত্তরাধিকারী, সেহেতু তাঁরা যদি খোদার কাছে হায়াত বৃদ্ধির জন্য ফরিয়াদ জানায়, তবে আল্লাহ্‌তালা তাঁদের জন্য ও সে সুযোগ দেবেন।”

এ হাদীসটি শুনে শেখ নিজাম (র.) কান্নায় ফেটে পড়লেন এবং বললেন, “আমি মহানবী (দ.) কে স্বপ্নে দেখেছি তিনি আমাকে বলছেন, নিজাম! আমরা তোমার জন্য উৎকণ্ঠিত চিত্তে অপেক্ষা করছি।” এ বাক্যটি উচ্চারণ করার সাথে সাথে সকল দর্শক শ্রোতা, আলেম-ওলামা

এবং উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ হু হু করে কাঁদতে থাকেন। সবার এটা বুঝতে বাকী রইলনা যে এটাই হচ্ছে অস্তগামী সূর্যের সর্বশেষ আভা। শেখ নিজাম (র.) ৭২৫ হিজরীর ১৮ই রবি-উস-সানী মোতাবেক ৩রা এপ্রিল, ১৩২৫ খ্রিস্টাব্দ সনে সূর্যোদয়ের পর পরপারে পদার্পণ করেন। (ইন্না লিল্লাহে .... রাজেউন)। শেখ রুকুনুদ্দীন (র.) তাঁর জানাযার নামাযে ইমামতি করেন এবং তাঁর ইচ্ছানুযায়ী খোলা আকাশের নীচে উন্মুক্ত স্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

সুলতান মোহাম্মদ বিন তুঘলক শেখ নিজাম (র.)'র দেহবাহী খাট নিজ কাঁধে বহন করে জানাযার নামাযের জন্য নিয়ে যান। কথিত আছে যে, গায়কগণকে শেখ নিজাম (র.) তাঁর দেহ সমাহিত হওয়ার পূর্বে তিন দিন ব্যাপী আধ্যাত্মিক সঙ্গীত গাওয়ার জন্য এবং সেমা মাহফিল করার জন্য তাঁর অন্তিমকালে নির্দেশ দিয়ে যান। এমনকি শেখ নিজাম (র.) এ প্রসঙ্গে মাওলানা শিহাব উদ্দিন থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করে নেন। কিন্তু শেখ রুকুনুদ্দীন (র.) এটা না করার জন্য পরামর্শ দেন এবং বলেন, "আমি শেখ নিজাম (র.)'র এ নির্দেশ পালন না করার জন্য শেষ বিচারের দিনে আল্লাহ্‌র নিকট দায়ী থাকব।" মোহাম্মদ বিন তুঘলক শেখ নিজাম (র.)'র নির্দেশ পালন করা হচ্ছেনা জেনে মর্মাহত হলেন। এটা শেখ নিজাম (র.)'র দীর্ঘকাল ধরে লালন করার আকাঙ্খা ছিল। একদা তাঁর আধ্যাত্মিক গুরু শেখ ফরিদ (র.) শেখ নিজাম (র.)কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন," আল্লাহ্‌র নিকট থেকে তোমার কোন্ এরাদা পূরণের জন্য আমি প্রার্থনা করব?" শেখ নিজাম (র.) বলেছিলেন, "আমি যেন তাসাওউফের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারি সেজন্য প্রার্থনা করুন।" অবশ্য পরবর্তীতে তিনি দুঃখভরে অনুশোচনা করে বলেছিলেন, "আমি যেন সেমা বা আধ্যাত্মিক সঙ্গীত শুনতে শুনতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে পারি সেজন্য দোয়া করার নিমিত্ত কেন আমি আমার দীক্ষা গুরু শেখ ফরিদ (র.) কে বললাম না!"

এটা বলা হয় যে, শেখ রুকুনুদ্দীন (র.) খাদেম ইকবালকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "শেখ নিজাম (র.) তাঁর দাফনের জন্য কোন স্থান নির্দিষ্ট করে গিয়েছিলেন কি?" খাদেম ইকবাল উত্তর দিয়েছিলেন, "হ্যাঁ! এই বাগানে।" পুনরায় শেখ রুকুনুদ্দীন (র.) জিজ্ঞাসা করলেন, "শেখ নিজাম (র.) যখন এই বাগানে আসতেন, তখন তিনি কোথায় বসতেন?" খাদেম ইকবাল বললেন," ঐ কমলা গাছটির নীচে।" শেখ রুকুনুদ্দীন ঐ স্থানে দুই রাকাত নফল নামায আদায় করলেন এবং সে স্থানেই শেখ নিজাম (র.) কে সমাহিত করা হয়। শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জেশকর (র.) তাঁকে [শেখ নিজাম (র.)] যে খিরকা প্রদান করেন তা দিয়ে শেখ নিজাম (র.)'র সর্বাঙ্গ ঢেকে দেয়া হয় এবং তাঁর ব্যবহৃত জায়নামায তাঁর মাথা মোবারকের উপর রাখা হয়। তাঁর দেহ মোবারক কবর শরীফে নামানোর সাথে সাথে দক্ষিণ এশিয়ার মুসলিম সুফি আন্দোলনের ঐতিহাসিক পর্যায় যেন শেষ হয়ে গেল। যখন আমির খসরু (র.) তাঁর গুরু শেখ নিজাম (র.)'র ওফাতের খবর শুনলেন, তিনি আওয়াধ থেকে ছুটে আসলেন এবং তাঁর জামা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেললেন, তাঁর নিজের মুখে কালি লিপে দিলেন

এবং শেখ নিজাম (র.)'র কবর শরীফের উপর লুটিয়ে পড়লেন। তিনি নিম্নোক্ত হিন্দি গজলটি আবৃত্তি করতে করতে বেহুঁশ হয়ে গেলেনঃ

"প্রিয়া তোমার প্রতীক্ষায় গুণছে প্রহর,
এলোকেশে শুয়ে আছে পালঙ্কের উপর।
ওহে খসরু! বাড়ী আসার সময় যে হল তোমার;
নিশীথ রজনীতে ছেয়ে গেছে পৃথিবী,
চারিদিকে আজ শুধু ঘোর অন্ধকার।"

সুলতান মোহাম্মদ বিন তুঘলক শেখ নিজাম (র.)'র কবর শরীফের উপর একটি গম্বুজ নির্মাণ করে দেন। মাজারের পাশের বিল্ডিং বা ভবনটি ফিরোজ শাহ্ তুঘলক নির্মাণ করে দেন যা জামাত খানা নামে পরিচিত। ফিরোজ শাহ্ তুঘলক বলেন, 'আমি একটি নুতন জামাত খানা নির্মাণ করে দিলাম যা পূর্বে সেখানে ছিলনা।

নবম অধ্যায়

শেখ নিজাম (র.)'র নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা

সমাজে সুফিদের ভূমিকা প্রসঙ্গে বার্গসন (Bergson) বলেন, "একজন বড় মাপের সুফি সাধক মনে করেন যে, কর্মরত শক্তি (force in action) বা শক্তিকে কাজে প্রয়োগই হচ্ছে একজন সুফি সাধকের অন্তরে সত্য প্রবাহের উৎস।" স্রষ্টার সহায়তায় মানবকে পূর্ণতা দানই হচ্ছে একজন সুফি সাধকের আকাঙ্ক্ষা।

একজন সুফির পথ নির্দেশই হল মানব জীবনের অনুসরণীয় পথ। শেখ নিজাম (র.)'র জীবন সাধনা হচ্ছে এ বাণীর জ্বলন্ত উদাহরণ। তাঁর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা যে তিনটি মৌলিক আদর্শকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়েছে সেগুলো নিম্নরূপ:

ক. বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রভুর প্রতি আনুগত্যের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক তাৎপর্য সম্পর্কে শিক্ষা দেয়া;
খ. এ পার্থিব দুনিয়ায় সীমাহীন দুর্দশাপন্ন ও সংগ্রামী জীবনের মাঝে মানব অন্তরের শান্তি আনয়ন করা;
গ. পাপ বা গুনাহের কাজ হ্রাস করা এবং নৈতিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার মানসিকতা সৃষ্টি করা।

উপরোক্ত তিনটি আদর্শ বা নীতিমালা অনুযায়ী শেখ নিজাম (র.) তাঁর শিষ্যদেরকে নৈতিকভাবে স্বায়ত্তশাসিত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। শেখ নিজাম (র.) অনুভব করেছিলেন যে, দুঃখী ও নিঃস্ব, নিপীড়িত, বঞ্চিত ও লাঞ্ছিত মানুষদের অন্তরে শান্তি দেয়া, তাদের দুঃখ লাঘবের চেষ্টা করা ও বিপদে আপদে সাহায্য করা আধ্যাত্মিক সাধনা, নামায-কালাম, মোরাকাবা-মোশাহেদা প্রভৃতি ইবাদতের চাইতে আল্লাহ্‌র কাছে অনেক বেশি মূল্যবান। তাই তাঁর সকল সাধনা ও প্রচেষ্টা ছিল মানুষের দারিদ্র্য ও দুর্দশা মোচনের জন্য নিবেদিত। তাঁর কাছে মানুষ যে সকল সমস্যা নিয়ে আসত সে সকল সমস্যাসমূহের সবগুলো সমাধান করা যে কোন মানুষের ক্ষমতার মধ্যে হয়ত পড়েনা, কিন্তু দুঃখভোগী মানুষের অন্তরে একটু নিরাপত্তার আশ্বাস দেয়া, তাদের দুশ্চিন্তা কমানো এবং অন্তরে শান্তি ও নিশ্চয়তা বোধ জাগ্রত করার ব্যবস্থা করা একজন সুফি সাধকের নৈতিক কর্তব্য বহির্ভূত নয়। মানুষকে দু-চার টাকা দান করার চাইতে মানুষকে নৈতিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত করা, মানুষের অন্তরে স্বর্গীয় আনন্দ সৃষ্টি করা এবং অনাবিল প্রশান্তি লাভের মানসিকতা তৈরি করা অনেক বেশি শ্রেয়। মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী, আশা-আকাঙ্ক্ষা, মন-

মানসিকতার পরিবর্তনের জন্য রূহানী ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ দিয়ে শেখ নিজাম (র.) আশাহত, ভাগ্যাহত, দুর্দশাগ্রস্ত মানব জীবনে যুগান্তকারী বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন। এ লক্ষ্য অর্জনকে তিনি জীবনের ব্রত হিসেবে নিয়েছিলেন এবং এর জন্য আজীবন সংগ্রাম ও সাধনা করে গেছেন। নিম্নে তাঁর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার উল্লেখযোগ্য কিছু বিষয় তুলে ধরা হলো:

ক. আনুষ্ঠানিক প্রার্থনার (ইবাদত) চাইতে মানব সেবা শ্রেয়: শেখ নিজাম (র.)'র নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার শেকড় আল্লাহ্‌তালার প্রতি সাধনা বা একাগ্রতার ধারণায় প্রোথিত। শেখ নিজাম (র.) বলেন, "আল্লাহ্‌র প্রতি সাধনা বা একাগ্রতা দু'প্রকার: ১. লাজমী (অকর্মক) এবং ২. মুতা'আদ্দী (সকর্মক)। লাজমী একাগ্রতার উপকার কেবলমাত্র স্রষ্টানুরাগীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এ ধরনের স্রষ্টানুরাগের মধ্যে নামায, রোজা, হজ্ব, তসবিহ্-তাহলিল প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত। মুতা'আদ্দী একাগ্রতার উপকার কেবলমাত্র সাধকের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটার উপকার ও আনন্দ অন্যান্যদের মধ্যেও বিস্তার লাভ করে। এরূপ একাগ্রতার মধ্যে কাউকে দান-সাদাকা করা, দয়া-দাক্ষিণ্য দেখানো এবং দুঃখী মানুষের সেবায় অনুরাগ বা একাগ্রতার পুরস্কার বা পুণ্য সীমাহীন। ধর্মের এই বৈপ্লবিক দর্শন শেখ নিজাম (র.)'র ত্বরিকার চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে এবং মানুষকে পাপমুক্ত ও সমাজকে ভোগান্তি মুক্ত করার ক্ষেত্রে মানবিক কর্মকাণ্ডের গুরুত্বকে তাঁর শিষ্যদের মাঝে আকর্ষণীয় করে তোলে। শেখ নিজাম (র.)'র স্রষ্টার ধারণা সম্পর্কে সর্ববেষ্টনকারী বাস্তবতা হচ্ছে উপরোক্ত মানবসেবামূলক দৃষ্টিভঙ্গীর উৎস যা তাঁর নৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার মধ্যে নিহিত। তিনি কেবলমাত্র স্রষ্টার জন্যই বেঁচে ছিলেন। তাঁর রূহানী আবেগ স্রষ্টার সার্বভৌম শক্তির উপর বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। স্রষ্টার পথ অনুসরণের প্রতি তাঁর আস্থা ছিল অবিচল। সৃষ্টির মাঝে স্রষ্টার ঐশ্বর্য বিতরণে কোন বৈষম্য নেই। সূর্যের কিরণ জাতি, ধর্ম, বর্ণ, বিত্ত নির্বিশেষে সকলের জন্য সমভাবে বন্টিত। যখন বৃষ্টি হয়, তখন ধনী-গরিব সকলেই সমভাবে এর উপকার পায়। হোক না সে বস্তিবাসী কিংবা রাজপ্রাসাদের বাসিন্দা। স্রষ্টার কাছে আমিরে-ফকিরে কোন ভেদাভেদ নেই। একদা হযরত শেখ সৈয়দ খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তী (র.)কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, "স্রষ্টার নৈকট্য লাভের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত কোন্‌টি?" তিনি বলেছিলেন, "নদীর ন্যায় উদারতা, সূর্যের ন্যায় বদান্যতা এবং মাটির ন্যায় আতিথেয়তার চর্চা কর; তবেই খোদার নৈকট্য লাভ করতে পারবে।" শেখ নিজাম (র.) তাঁর নিজ জীবনে এ উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করেছিলেন। একজন সুফি জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, ভৌগোলিক অবস্থান সবকিছুর বাধাকে অতিক্রম করে স্রষ্টার সকল সৃষ্টির প্রতি ভালবাসাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন।

খ. কেবলমাত্র স্রষ্টার জন্যই বেঁচে থাক: শেখ নিজাম (র.) বিশ্বাস করতেন যে, যদি একজন মানুষ কেবলমাত্র স্রষ্টার জন্যই বাঁচতে শেখে, তাহলে সারা বিশ্ব ভালবাসা, শান্তি এবং সম্প্রীতিতে ভরে যাবে এবং মানব সম্পর্কের ভিত্তি পরিবর্তন হয়ে যাবে। মানুষ হচ্ছে স্রষ্টার প্রিয় সৃষ্টি এবং যে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি চায়, সে সকল বিবেচনার ঊর্ধ্বে উঠে সকল মানুষের

কল্যাণের জন্য চেষ্টা চালায়। স্রষ্টার জন্য বাঁচার অর্থ হচ্ছে জীবনের প্রতি এবং জীবনের সমস্যাগুলোর প্রতি মৌলিক পরিবর্তন আনয়নের মাধ্যমে মানব চিন্তা বা মানসিকতা বা মনোবিজ্ঞানের সম্পূর্ণ রূপান্তর সাধন করা। এই আদর্শে যেই অনুপ্রাণিত হবে, সেই আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জনে সমর্থ হবে। স্রষ্টার প্রতি আত্মসমর্পণের মানসিকতা তার মধ্যে তৈরি হবে। জৈবিক তাড়না, ক্ষুধা প্রভৃতিকে জীবনের মহৎ আদর্শের কাছে পদানত করতে শিখবে। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত ঘটনাটি খুবই প্রাসঙ্গিকভাবে তিনি উল্লেখ করেন– কোন এক নদীর তীরে এক দরবেশ বাস করতেন। একদিন উক্ত দরবেশ নদীর অপর তীরে বসবাসকারী অন্য এক দরবেশের জন্য কিছু খাবার নিয়ে যাবার জন্য তাঁর স্ত্রীকে আদেশ দিলেন। তাঁর স্ত্রী বললেন, নদীর পানি অতিক্রম করে অপর তীরে যাওয়া খুবই কষ্টকর বিধায় তিনি খাবার নিয়ে যেতে পারবেন না। দরবেশ বললেন, "যখন তুমি নদীর কাছে যাবে, তখন তুমি নদীর পানিকে বলবে তোমার স্বামীর সম্মানার্থে (যে স্বামী কোনদিন তাঁর স্ত্রীর সাথে ঘুমাননি) পানির উপর দিয়ে একটি রাস্তা করে দিতে।" তাঁর স্বামীর মুখ থেকে এ বাক্যটি শুনে তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলেন এবং মনে মনে বললেন, "আমার গর্ভে এ লোকের কত সন্তান-সন্ততি জন্ম লাভ করেছে। আমার স্বামীর এ আদেশকে আমি কিভাবে চ্যালেঞ্জ করতে পারি?" দরবেশের স্ত্রী খাবারগুলো নিয়ে নদীর কূলে গেলেন এবং পানিকে রাস্তা করে দিতে বললেন সে স্বামীর নামে যে স্বামী তাঁর সাথে ঘুমাননি (তাঁর স্বামীর বক্তব্য অনুযায়ী)। পানি তাঁর কথামত রাস্তা করে দিল। নদী পার হয়ে তিনি দরবেশের সামনে খাবারগুলো রাখলেন। খাবারগুলো খাবার পরে মহিলাটি বললেন, "আমি কিভাবে নদী পার হব?" দরবেশ জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কিভাবে এসেছেন?" মহিলাটি তাঁর স্বামীর বাণীটি শুনালেন। দরবেশ বাণীটি শুনে বললেন, "যান, পানিকে (নদীর) বলেন রাস্তা করে দিতে সে দরবেশের সম্মানার্থে, যে দরবেশ চল্লিশ বছর ধরে কিছু খাননি।" মহিলাটি হতভম্ব হয়ে গেলেন, কথামত নদীর কাছে এলেন এবং দরবেশের উপদেশমত বাক্যটি উচ্চারণ করলেন এবং পানি আগের মতই তার উপরে রাস্তা করে দিল। পূর্ববর্তী দরবেশের কাছে (অর্থাৎ তাঁর স্বামীর কাছে) মহিলাটি ফিরে এসে তাঁর (স্বামীর) চরণে লুটিয়ে পড়ে অনুনয় বিনয় করে বলতে লাগলেন, "আপনার এবং আপনার বন্ধু দরবেশটির উক্ত বাণী দ্বয়ের রহস্য কি তা আমাকে বলুন।" তাঁর স্বামী বললেন, "দেখ! আমি কখনও আমার যৌন ক্ষুধা নিবৃত্ত করার জন্য তোমার সাথে ঘুমাইনি, আমি তোমার যা প্রাপ্য তা প্রদান করার জন্যই তোমার সাথে শুয়েছি। অনুরূপভাবে ঐ দরবেশও কখনও তার পেটের ক্ষুধা নিবৃত্ত করার জন্য বিগত চল্লিশ বছর যাবত কিছু খাননি, তিনি কেবলমাত্র খোদার ইচ্ছা পূরণের শক্তি অর্জনের জন্যই খেয়েছেন।" শেখ নিজাম (র.) কিভাবে নিজের কামনা বাসনাকে পদানত করে খোদায়ী অনুরাগকে জাগ্রত করা যায় তা শিক্ষা দিয়েছেন। যারা এ অভ্যাস আয়ত্ত্ব করেছেন, তাঁরা স্বর্গীয় শান্তি লাভ করতে সমর্থ হয়েছেন। শেখ নিজাম (র.) কখনও ব্যক্তির প্রাকৃতিক প্রবৃত্তি দমনের চেষ্টা করেননি। তিনি স্রষ্টা অনুরাগের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টির মাধ্যমে বস্তুগত আকাঙ্ক্ষাকে গুরুত্বহীন করার জন্য শিষ্যদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। ছোটবেলা থেকে তাঁর শিষ্য আমির খসরু রোমান্টিক ও ছন্দময় কবিতার অনুরক্ত

ছিলেন। আমির খসরু শেখ নিজাম (র.)'র ত্বরিকায় বায়াত গ্রহণের পর তাঁর কবিতার বক্তব্য ও সুর বদলাতে চাইলেন। শেখ নিজাম (র.) আমির খসরুকে তাঁর কবিতায় স্বাভাবিক ছন্দ ও রীতি পরিবর্তন করতে নিষেধ করলেন। অবশ্য সময়ের ব্যবধানে আমির খসরু নিজেই তাঁর কবিতার রোমান্টিক ধারাকে মরমী ধারায় রূপান্তরিত করেন। অনুরূপভাবে, শেখ নিজাম (র.)'র ভাইপো খাজা রফি উদ্দিন চিত্রকলায় পারদর্শী ছিলেন। শেখ নিজাম (র.) এ ব্যাপারে তাঁকে কিছু বলেননি। কিন্তু পরবর্তীকালে শেখ নিজাম (র.)'র আদেশে তিনি যখন কুরআনে হাফেজ হয়ে যান, তখন তিনি নিজেই তাঁর পূর্ব সখ পবির্তন করে ফেলেন।

গ. বস্তুগত দুনিয়াকে বিসর্জন: শেখ নিজাম (র.) দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, একজন ব্যক্তি যদি সকল প্রকার দুনিয়ার মোহ বা বস্তুগত আকর্ষণকে পরিত্যাগ করতে না পারেন, তাহলে স্বর্গীয় জীবন লাভ করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর নয়। এটার অর্থ এ নয় যে, একজনকে বৈরাগ্য অবলম্বন করতে হবে, কিংবা দুনিয়ার সব উত্তম জিনিসগুলো পরিত্যাগ করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে, মনের ঐ সকল প্রবৃত্তিকে পরিত্যাগ করতে হবে যেগুলো মানুষকে বস্তুগত সংগ্রামে এমনভাবে লিপ্ত করে যে, সে আর পরকালের কথা চিন্তা করারও অবকাশ পায়না এবং ক্ষুদ্র পার্থিব স্বার্থ অর্জনের জন্য নিজের সকল শক্তিকে ক্ষয় করে ফেলে। ওয়ার্ডসওয়ার্থের (Wordsworth) মত তিনি অনুভব করতেন যে, 'আয় উপার্জন এবং ব্যয় সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত থেকে আমরা আমাদের শক্তির অপচয় করি। কিন্তু এই পৃথিবীর মাঝে আমাদের যা পাওয়ার তা সামান্যই অবলোকন করে থাকি।'

শেখ নিজাম (র.) বলেন, "দুনিয়াকে বিসর্জন দেয়ার অর্থ এ নয় যে, একজন ব্যক্তি তার সকল কাপড় চোপড় খুলে ফেলবে কিংবা খাদি কাপড় পরবে এবং অলসভাবে বসে থাকবে। বরঞ্চ দুনিয়াকে পরিত্যাগের অর্থ হল ভাল কাপড় পরবে এবং খাবার খাবে। না চাইলেও যদি তার কাছে কোন জিনিস আসে তা গ্রহণ করবে, কিন্তু মওজুদ করবেনা। সে কোন জিনিসের প্রতি লোভ করবেনা কিংবা কোন জিনিসের প্রতি মোহাবিষ্ট হয়ে স্রষ্টাকে ভুলে যাবেনা। কেবলমাত্র এটাই হচ্ছে দুনিয়াকে বিসর্জন।"

শেখ নিজাম (র.) বলেন, "বিশ্বের প্রকৃতি এবং বাস্তবতা'র মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। একজন ব্যক্তি তার পরিবার পরিজনের প্রয়োজন মেটানোর জন্য যে কাজ করেন তা হচ্ছে দুনিয়া বা বিশ্বের প্রকৃতি এবং সম্পদ পুঞ্জীভূত করার লক্ষ্যে মানুষ যখন বস্তুগত কর্মকাণ্ডকে প্রাধান্য দেয় এবং খোদার সম্পর্ক ভুলে যায় তখন সেটা হয়ে যায় বাস্তবতা। একজন ব্যক্তি কেবলমাত্র তার জীবন নির্বাহের জন্য যতটুকু প্রয়োজন তা সঞ্চয় করবে এবং উদ্বৃত্ত সম্পদ গরিব-দুঃখীকে বিলিয়ে দেবে। প্রকৃত সুখ সম্পদ পুঞ্জীভূতকরণে নয়, ব্যয় করাতেই প্রকৃত আনন্দ।"

শেখ নিজাম (র.)'র মতে দুনিয়াতে তিন ধরনের ব্যক্তি দেখা যায়: ১. যারা কেবলমাত্র পার্থিব বস্তু আকাঙ্ক্ষা করে এবং তা সংগ্রহের জন্য তাদের সারাজীবন ব্যয় করে। ২. যারা এ পৃথিবীকে তাদের শত্রু মনে করে এবং সর্বদা এ পৃথিবীর নিন্দা করে। ৩. যারা এ পৃথিবীকে শত্রুও মনে করেনা, বন্ধুও মনে করেনা। শেখ নিজাম (র.)'র মতে এই তৃতীয় ধরনের

লোকই হচ্ছে সর্বোত্তম। এরূপ লোকজন অন্তর্কলহেও লিপ্ত হয়না, তাদের কোন দুশ্চিন্তাও থাকেনা।

ঘ. শান্তি ও অহিংসার বিকল্প নেই: শেখ নিজাম (র.) শান্তি ও অহিংসার দৃঢ় সমর্থক ছিলেন। তাঁর মতে, সন্ত্রাস সমস্যার সমাধান করেনা, সমস্যা বৃদ্ধি করে। ক্ষমা ও সহনশীলতা হচ্ছে মানব সুখের সর্বোত্তম রক্ষা কবচ। তিনি বলেন, "যদি কোন ব্যক্তি তোমার পথে কাঁটা বিছিয়ে দেয় এবং তুমি যদি তার পথে কাঁটা বিছিয়ে দাও, তাহলে সর্বত্র কাঁটা হয়ে যাবে।" শেখ নিজাম (র.) প্রায়শ শেখ আবু সাঈদ আবুল খায়ের এর নিম্নোক্ত কবিতাটি আবৃত্তি করতেন:

"যে আমার বন্ধু নয়, আল্লাহ্ যেন তার বন্ধু হয়;
যে আমার নিন্দা করে, তার জীবন যেন প্লাবিত হয় সুখ ও আনন্দের বন্যায়।
যে আমার পথে বিছিয়ে রাখে কাঁটা শত্রুতাবশতঃ,
তার জীবনের বাগানে যত ফুল ফোটে তা' যেন হয় কাঁটা মুক্ত।"

ঙ. মানব সম্পর্কের ভিত্তি: শেখ নিজাম (র.) মনে করেন যে, একজন ব্যক্তির সাথে অন্য ব্যক্তির সম্পর্ক তিন প্রকারের হতে পারে: ১. একজন ব্যক্তি অন্যান্যদের সাথে ভালও না হতে পারে, মন্দও না হতে পারে। জনবসতিহীন পৃথিবীতে এরূপ অবস্থা হতে পারে। ২. একজন ব্যক্তি কারো কোন ক্ষতি করেনা, সে কেবল মানুষের উপকার করে যায়। ৩. একজন ব্যক্তি অন্যদের প্রতি কেবল ভাল করে এবং কেউ যদি তার ক্ষতি করে, সে ধৈর্য ধারণ করে এবং প্রতিরোধ করেনা। সাধারণত বাস্তবতার জগতে বসবাসকারী জনগণ এ ধরনের মানব সম্পর্ককে অগ্রাধিকার দেয়। উল্লেখ্য, শেখ নিজাম (র.) এই তৃতীয় প্রকারের সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য তাঁর শিষ্যদেরকে উপদেশ দিতেন। মানব প্রকৃতির সুফিবাদী ব্যাখ্যার উপর এ পদ্ধতি বা মানব সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত। সুফিবাদী মানব সম্পর্কের দু'টো দিক রয়েছে: ক. নফ্ছ (বস্তুগত অহমিকা) এবং খ. কলব (আত্মা)। নফ্ছ হচ্ছে দুর্ব্যবহার, শত্রুতা, ঝগড়া-ফ্যাসাদ প্রভৃতির আবাসস্থল। কলব হচ্ছে শান্তি, ত্যাগ ও শুভেচ্ছার কেন্দ্র। যদি নফ্ছের প্রভাবে কর্মরত একজন মানুষ কলবের নির্দেশ মেনে চলে, তবে কলহ-বিবাদ থেমে যাবে। অন্যদিকে নফ্ছ যদি নফ্ছের অধীনস্থ হয়ে যায় তাহলে কলহ ও শত্রুতা বন্ধ হবেনা কোনদিন। প্রত্যেক মানব কার্যাবলীর তিনটি স্তর আছে: ১. জানা, ২. অনুভব করা, এবং ৩. ইচ্ছা করা। সকল কর্মসূচি প্রথম স্তর অর্থাৎ জানার স্তর থেকে শুরু করতে হবে। প্রকৃত জ্ঞান সঠিক কাজের দিকে পরিচালিত করে। শুধু কাজে নয়, চিন্তাধারায়ও শেখ নিজাম (র.) বড় অন্তরের ক্ষমার পদ্ধতি অনুসরণের তাগিদ দিয়েছেন। ধৈর্য এবং সহনশীলতার মাঝে তিনি সামাজিক কল্যাণের বীজ নিহিত বলে মনে করেন। তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে নিম্নোক্তভাবে উপদেশ দিতেন:

ক. যদি একজন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করে এবং প্রতিশোধ নিতে চায়, তখন যার উপর প্রতিশোধ নিতে চায় সে যদি ধৈর্যশীল হয়, তাহলে সে পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

খ. রাগকে দমিয়ে রাখা ঠিক নয়, কারণ তা ভিন্ন অনাকাঙ্ক্ষিত প্রক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে। যে অন্যায় করেছে তাকে ক্ষমা করে দাও এবং রাগকে বিসর্জন দাও। প্রতিশোধ গ্রহণ না করে ক্ষমা করে দেয়াটাই হচ্ছে সমাজে সুখ ও শান্তির পথ।

গ. তুমি যদি কোন ব্যক্তির উপর প্রতিশোধ নেয়া থেকে বিরত হও, তাহলে তোমার ক্ষতি করার জন্য ঐ ব্যক্তির মনোবৃত্তি হ্রাস পাবে।

একদা এক ব্যক্তি শেখ নিজাম (র.) কে বললেন, “লোকজন আপনার সম্পর্কে মসজিদে মিম্বরের পাশে বসে নিন্দা করে। আমরা এটা আর সহ্য করবনা।” শেখ নিজাম (র.) বললেন, “আমি তাদের সবাইকে ক্ষমা করে দিয়েছি। তোমরাও তাদেরকে ক্ষমা করে দাও এবং কখনও তাদের সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করবেনা।”

শেখ নিজাম (র.)’র সহনশীলতা, ধৈর্যশীলতা, সহানুভূতি, মহানুভবতা, উদারতা ও সহমর্মিতা বোধের উপরই তাঁর ত্বরিকার মূল ভিত্তি রচিত হয়েছিল। তিনি তাঁর নিজের উদাহরণের মাধ্যমে শিষ্যদের আচরণকে প্রভাবিত করেছিলেন। তাঁর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার স্বরূপ নিম্নোক্ত বাণীগুলোতে সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে:

১. একজন আধ্যাত্মিক গুরুর পক্ষে তাঁর শিষ্যকে প্রকাশ্যে উপদেশ দেয়া উচিৎ নয়। তাকে আকারে ঈঙ্গিতে বিভিন্ন উদাহরণ, দৃষ্টান্ত, পরামর্শ প্রভৃতির মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া উচিৎ যাতে তার চরিত্র ও আচরণ পরিবর্তিত হয়।

২. যে পাপ করে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয় এবং যে কোন পাপ করেনা উভয়ে তাসাউফের ক্ষেত্রে সমতুল্য।

৩. সুফিবাদে প্রভু এবং ভৃত্যের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। প্রভু বা ভৃত্য নামে কোন শব্দ ও চিশ্‌তীয়া ত্বরিকার নেই। আধ্যাত্মিক চর্চায় সাফল্য লাভ করে একজন ভৃত্য তার প্রভুর গদী দখল করতে পারে।

৪. যদিও খোদার দান অপরিসীম, তথাপি চেষ্টা ছাড়া কোন কিছু অর্জন করা যায়না। সংগ্রাম ছাড়া কোন অবস্থাতেই কিছু লাভ করা যায়না।

৫. কোন ব্যক্তি নিজে যা পছন্দ করেনা সে যেন তাহা কারো জন্য সুপারিশ না করে।

৬. মনে উচ্চাশা থাকা খারাপ নয়। তবে জাগতিক মোহে নিমজ্জিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। যৌন ক্ষুধা এবং জৈব ক্ষুধা যতটুকু সম্ভব পরিহার করা উচিৎ।

৭. আধ্যাত্মিক ক্ষমতা প্রদর্শনের চেষ্টা থেকে বিরত থাকা উচিৎ। আধ্যাত্মিক অর্জন গুপ্ত রাখা উত্তম।

৮. সকল দরিদ্র ও ভাগ্যাহতকে বৈষম্যহীনভাবে খাদ্যদ্রব্য বন্টন করা উচিৎ।

৯. নারীরাও আধ্যাত্মিক ক্ষমতায় পুরুষের সমতুল্য হতে পারে। ত্বরিকতের সিলসিলায় নারী পুরুষে কোন তফাৎ নেই।

১০. আত্মার পরিশুদ্ধি ও ত্বরিকত চর্চার জন্য আধ্যাত্মিক গুরু বা পীরের লেখা বই নিয়মিত পাঠ করা উচিৎ।

১১. নিয়ত পরিষ্কার হলে কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যায়।

১২. প্রত্যেক কাজে (পার্থিব বা পারলৌকিক) শুরুতে কঠিন মনে হয়, কিন্তু সাধনার ফলে পরে তা সহজ হয়ে যায়।

১৩. আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কেবলমাত্র একজন পীর থেকেই নিতে হবে। কেবলমাত্র একটি দরজা ধর এবং তা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর। এটাই হবে ত্বরিকতের অনুসরণীয় নীতি।

১৪. কেরামত হচ্ছে একটি পর্দা যা বাস্তবকে ঢেকে রাখে।

১৫. হালালভাবে উপার্জিত রুটির দ্বারা আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধিত হয় উচ্চ হারে। হারাম উপার্জন আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের অন্তরায়।

১৬. শেষ বিচারের দিনে হালালভাবে অর্জিত আয়ের হিসাব দিতে হবে এবং অবৈধ আয়ের জন্য শাস্তি পেতে হবে।

১৭. সম্পদের পূঞ্জীভবনে নয়, সম্পদের বিতরণেই প্রকৃত আনন্দ নিহিত।

১৮. প্রার্থনা করার সময় আল্লাহ্‌র দয়ার কথা স্মরণ করা উচিৎ। অতীতে কৃত পাপ কর্ম নিয়ে দীর্ঘকাল অনুশোচনা করা উচিৎ নয়।

১৯. একাকী খাবার খাওয়া উচিৎ নয়।

২০. রোজা হল নামাযের অর্ধেক এবং বাকী অর্ধেক হল ধৈর্য।

২১. একই হৃদয়ে বা অন্তরে খোদার ভালবাসা এবং টাকার ভালবাসা একসাথে বাস করতে পারেনা।

২২. মানব সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা কাঙ্ক্ষিত নয়। মানুষের সাথে মেলা মেশা করা উচিৎ এবং মানুষের লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করা উচিৎ।

২৩. দু'জনের মধ্যে যখন কথা কাটাকাটি হয় তখন রেগে যাওয়া উচিৎ নয়।

২৪. অন্তর থেকে হিংসা-ঘৃণা, শত্রুতা উপড়ে ফেলা উচিৎ।

২৫. যে মানুষের সেবা করে সেই মানুষের নেতা হবার উপযুক্ত।

২৬. আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় সন্তুষ্ট থাকাই হচ্ছে জীবনের শান্তি ও সন্তুষ্টির চাবিকাটি।

২৭. আত্মপ্রবঞ্চনা থেকে মুক্তি পাওয়াই হচ্ছে সালাতের উদ্দেশ্য। যে স্বার্থপর ও অহঙ্কারী, সে কখনও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ লাভ করতে পারবেনা।

২৮. প্রত্যেক সম্পদেরই যাকাত আছে। জ্ঞান ও শিক্ষার যাকাত হচ্ছে ইহার প্রয়োগ ও অনুশীলন।

২৯. মানুষের সাথে আল্লাহ্‌র সম্পর্ক হচ্ছে ন্যায় বিচার ও প্রাচুর্যের সম্পর্ক।

৩০. অসাধুতা ও অসৎ আচরণ নগর বা শহরের ধ্বংসের কারণ।

৩১. আত্মসমালোচনা সত্তর বছরের ইবাদতের চাইতে উত্তম।

৩২. যে কোন দর্শনার্থী বা মেহমানকে কিছু আপ্যায়ন করা উচিৎ। কিছু না থাকলে এক গ্লাস পানি হলেও খাওয়ানো উচিৎ।

৩৩. মানুষকে দয়া পরবশ হতে হবে এবং মানুষের সাথে মানুষের আলাপচারিতা হবে নিষ্কলুষ এবং ক্ষমাসুন্দর।

৩৪. নামায বা সালাতের উদ্দেশ্য হচ্ছে স্রষ্টার ভালবাসা অর্জন। দোযখের ভয় কিংবা স্বর্গের লোভে নামায পড়া কাম্য নয়।

৩৫. সকলের নাজাতের জন্য মুনাজাত বা দোয়া করা উচিৎ। এ ব্যাপারে কোন পক্ষপাতিত্ব যেন করা না হয়।

৩৬. সততাই হচ্ছে স্থায়ী সুনাম অর্জনের একমাত্র পথ।

৩৭. অন্যের চাটুকারিতা ও তোষামোদের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত কাব্য ও পাণ্ডিত্য মূল্যহীন। কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র প্রশংসাই হবে একজন মুমিনের আসল কর্তব্য।

৩৮. যে ব্যক্তি শিশুদের ভালবাসতে জানেনা, সে বয়োজ্যেষ্ঠদেরকেও ভালবাসতে পারেনা।

৩৯. অন্যের দোষত্রুটি প্রকাশ না করে গোপন রাখা উচিৎ।

৪০. দাসকে মুক্তি দান করা হচ্ছে স্বর্গীয় পুরস্কারের কাজ।

৪১. যে ব্যক্তি নিজেকে ভাল এবং ধার্মিক মনে করে; সে আসলেই খারাপ অবস্থায় আছে।

৪২. আধ্যাত্মিক সংযম ও বিনয় আধ্যাত্মিক উত্তেজনা বা মাতলামির চাইতে শ্রেষ্ঠ।

দশম অধ্যায়

শাসন কার্যে নিয়োজিত শাসক বা সুলতানগণ এবং রাষ্ট্র সম্পর্কে শেখ নিজাম (র.)'র মনোভাব

শেখ ফরিদ গঞ্জেশকর (র.)'র ভাষায় শাসকগোষ্ঠী ও রাষ্ট্র সম্পর্কে চিশ্‌তীয়া ত্বরিকার অনুসারী বুজুর্গদের দৃষ্টিভঙ্গী নিম্নোক্তভাবে প্রকাশ পেয়েছে: "যদি তুমি তোমার পূর্বসূরীদের ন্যায় আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধন করতে চাও, তা হলে রাজার রক্তের সম্পর্ক বা রাজপুত্রের পরিচয় ভুলে যাও। নিজেকে একজন নগণ্য মানুষ হিসেবে বিবেচনা কর। নিজেকে একজন জনগণের সেবক মনে কর।" চিশ্‌তীয়া ত্বরিকার সকল ওলীগণও এ মনোভাব পোষণ করতেন। তাঁরা সরকারের কোন সাহায্য, বৃত্তি কিংবা মঞ্জুরী নিতেও অস্বীকার করতেন। চিশ্‌তীয়া সুফি সাধকের এ মনোভাবের পশ্চাতে বিভিন্ন কারণ ছিল। যথা: বাস্তবভিত্তিক, আইনগত, ঐতিহাসিক প্রভৃতি। প্রথমত: চিশ্‌তীয়া ওলীরা মনে করতেন যে, একজন সাধকের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ অর্জনের পথে সরকারি সাহায্য বা অনুদান এবং রাজনীতি বড় অন্তরায়। সরকারি সেবায় মা'রেফাত অর্জন অসম্ভব। তাঁরা মনে করেন, প্রকৃত পক্ষে সরকারি সেবা গ্রহণ করা হল নিজের আধ্যাত্মিক মৃত্যু পরোয়ানায় স্বাক্ষর করা। দ্বিতীয়ত: সরকারি সেবা এখন আর ধর্ম সেবা রূপে বিদ্যমান নেই। এটা এখন গোত্র সেবা এবং শ্রেণী স্বার্থ সেবায় পরিণত হয়েছে। তৃতীয়ত: হযরত ইমাম গাজ্জালী (র.)'র ভাষায়, রাজা-বাদশাহদের প্রায় সম্পূর্ণ আয় হচ্ছে হারাম উৎস থেকে অর্থাৎ শরীয়াহ্ সম্মত নয় এমন উৎস থেকে। ফলশ্রুতিতে এ সকল উৎস থেকে প্রাপ্ত আয় দিয়ে যে সেবা সরকার প্রদান করে তাও বেআইনী অর্থাৎ আইনসিদ্ধ নয়। চতুর্থত: খোলাফায়ে রাশেদীনের পর থেকে সুলতানী আমল পর্যন্ত যত রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে উঠেছে সেগুলোর বেশিরভাগই তথাকথিত ধর্ম নিরপেক্ষ (Secular) এবং ধর্মীয় আদর্শের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

সরকারি সংগঠন এবং আইন-আদালত সম্পূর্ণরূপে ইসলামী আদর্শের বিপরীত। ইমাম গাজ্জালী (র.)'র মতে, এ সকল অবস্থা থেকে মুক্ত থাকার একমাত্র উপায় হচ্ছে রাজার সংশ্রব থেকে দূরে থাকা। পঞ্চমত: একজন সুফি যদি শাসক শ্রেণী এবং আমলাদের সাথে জড়িত হয়ে যান, তাহলে তিনি সম্পূর্ণরূপে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবেন। তিনি আর সুফি দলভুক্ত থাকবেন না এবং আমলাতন্ত্রের (Bureaucratic machinery) অংশ হয়ে যাবেন। ষষ্ঠত: তিনি যখন শাসকদের বিলাসিতা এবং রাজ দরবারের জাঁকজমকপূর্ণ অবস্থা প্রত্যক্ষ করবেন, তখন তিনি বস্তুগত প্রাচুর্যের দিকে আকৃষ্ট হবেন এবং উচ্চাভিলাষী হয়ে যাবেন।

এরূপ অবস্থায় যে রাজার সেবায় বা সরকারি চাকুরীতে আত্মনিয়োগ করবেন, তিনি তাঁর আত্মাকে আর নিজের আত্মা বলে মনে করতে পারবেননা। শেখ নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.) বিভিন্ন গল্প ও উদাহরণের মাধ্যমে তাঁর শিষ্যদেরকে উপরোক্ত কারণগুলোর যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করতেন এবং তাঁর পূর্বসূরী প্রকৃত সুফিদের অনুসরণ করার জন্য উপদেশ দিতেন।

অলীদের এ নীতি অজ্ঞতা বা সামাজিক সমস্যার প্রতি উদাসীন্যের ফল নয়। মানুষের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবের জন্য এবং পাপ থেকে বাঁচার নিমিত্তে যে পদ্ধতি অবলম্বন করা দরকার সে পদ্ধতির ক্ষেত্রে সরকারি চাকুরী বা সেবাকে সুফিরা একটি বড় অন্তরায় হিসেবে মনে করেন। অবশ্য সরকারি সেবা বা চাকুরী থেকে দূরে থাকা কেবলমাত্র ঐ সকল বয়োজ্যেষ্ঠ সুফি সাধকদের জন্যই প্রযোজ্য যাঁরা সিলসিলার আধ্যাত্মিক কাজে নিজের জীবনকে সর্বাত্মকভাবে উৎসর্গ করেছেন। যাঁরা সিলসিলার বিকাশ এবং শিষ্যদের হেদায়েত কার্যের জন্য খলীফা নিযুক্তি হননি কিংবা খেলাফতনামা পাননি, তাঁদের জন্য এ নীতি প্রযোজ্য নয়। আমীর খসরু এবং আমির হাসান সিজ্জী রাজ দরবারের সাথে জড়িত ছিলেন। সেজন্য শেখ নিজাম (র.) তাঁদেরকে খলীফা নিযুক্ত করেন নি। সুফিরা সরকারি সেবা বা চাকুরী (Government Service) থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার কারণে জনগণের সামাজিক ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রচুর সময় পেতেন। সুফিদের মতে, নৈতিকভাবে দীন (Morally starved) এরূপ সমাজ বেশি দিন ঠিকতে পারেনা। সুতরাং জনগণের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য সুফিদের আত্মনিয়োগ করা উচিৎ।

শেখ নিজাম (র.) তাঁর পূর্বসূরীদের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন এবং সারা জীবন রাজ দরবার থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন। তিনি শাসকবর্গ থেকে কোন জায়গীর কিংবা বৃত্তি গ্রহণ করেন নি। তিনি তাঁর সিনিয়র শিষ্যদেরকে যে খেলাফত নামা দিতেন তাতে লেখা থাকত, "তুমি রাজ দরবারে যাবেনা এবং রাজা-বাদশাহদের থেকে কোন উপহার, উপঢৌকন কিংবা পুরস্কার নেবেনা।" কোন খলীফা যদি এ নির্দেশ থেকে সামান্যতম বিচ্যুতি দেখাত, শেখ নিজাম (র.) তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতেন। আওয়াধের অধিবাসী কাজী মুহিউদ্দিন কাসানীকে শেখ নিজাম (র.) খেলাফত নামা প্রদান করেছিলেন। তাতে লেখা ছিল: "দুনিয়া এবং এ দুনিয়ার যশ-সম্মানকে পরিত্যাগ কর এবং আল্লাহ্‌র রাস্তা ধর। দুনিয়ার দিকে এবং পার্থিব দুনিয়ার জন্য পাগল মানুষের দিকে মনোযোগ দিওনা। জায়গীরদারী কিংবা রাজার দান গ্রহণ করোনা। যদি মুসাফির তোমার কাছে আসে এবং তাদেরকে দেয়ার মত তোমার যদি কিছু না থাকে, তবে সেটাকে আল্লাহ্‌র আশীর্বাদ মনে কর। তুমি যদি এরূপভাবে চল, তাহলে তুমি আমার খলীফা।"

মুহিউদ্দিনের পরিবার ছিল কাজী (বিচারক) পরিবার। সুলতান আলাউদ্দিন খলজি মুহিউদ্দিন কাসানীকে আওয়াধের কাজী পদে নিয়োগ করার জন্য এবং তাঁকে কিছু জায়গীর ভূমি ও উপহার প্রদানের নিমিত্ত এক ফরমান পাঠালেন। মুহিউদ্দিন কাসানী ফরমানটি সাথে নিয়ে শেখ নিজাম (র.)'র সাথে পরামর্শ করার জন্য দিল্লীতে আসলেন। শেখ নিজাম (র.) ফরমানের কথা শুনে বিমর্ষ হলেন এবং বললেন, "নিশ্চয় এ পদের জন্য তোমার অন্তরে কোন

আকাঙ্ক্ষা ছিল। এজন্যই তোমার কাছে এ ফরমানটি এসেছে।” শেখ নিজাম (র.) কাল বিলম্ব না করে শাস্তি স্বরূপ মুহিউদ্দিন কাসানী থেকে খেলাফত নামা ফিরিয়ে নিলেন এবং এক বছরের জন্য খেলাফত স্থগিত করলেন। শেখ নিজাম (র.)'র অভিমত হল যে, যে ব্যক্তি জনগণকে খোদা প্রাপ্তির পথ দেখাবার দায়িত্ব প্রাপ্ত, সে ব্যক্তি যদি সরকারি কোন পদ বা দায়িত্ব নেয় তাহলে তার আধ্যাত্মিক দায়িত্ব পালন বাধাগ্রস্ত হবেই।

শেখ নিজাম (র.) প্রায়শ কিছু ঘটনার কথা স্মরণ করতেন যেগুলোর ক্ষেত্রে তাঁর গুরু দুনিয়াবী কর্তৃপক্ষের সাথে সংযোগ না রাখার জন্য দৃঢ় ও সুস্পষ্ট মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন। সাইয়েদী মওলা নামে এক দরবেশ বলবনের শাসনামলে জুরজান (Jurjan) থেকে ভারতে এসেছিলেন এবং শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জেশকর (র.)'র সাথে আজোধানে (Ajodhan) কিছুকাল অবস্থান করেছিলেন। যখন তিনি দিল্লী যাবার জন্য শেখ ফরিদ (র.)'র অনুমতি চাইলেন তখন শেখ ফরিদ (র.) বললেন, “তুমি দিল্লীতে যাচ্ছ। তোমার জন্য দরজা খোলা। তুমি যশ ও খ্যাতি অর্জন কর। তুমি ভাল করে জান যে, তোমার জন্য ভাল কোন্‌টি। কিন্তু আমার একটি উপদেশ মনে রাখ। আমির এবং মালিকদের (রাজা-বাদশাহ) সাথে মিশোনা। তোমার বাসায় তাদের আসাটাকে দুর্যোগ বা বিপর্যয় মনে কর। যে দরবেশ মালিক ও আমিরদের সাথে মেলামেশার জন্য দরজা উন্মুক্ত করবে, সে ধ্বংস হয়ে যাবে।” সাইয়েদী মওলা শেখ নিজাম (র.)'র উপদেশকে অগ্রাহ্য করল এবং ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন বিপদের সম্মুখীন হল। ব্যারনীয় ষড়যন্ত্রে (Baronia conspiracy) জড়িত থাকার শাস্তি স্বরূপ জালালুদ্দিন খলজি তার বুকের উপর হাতী চড়িয়ে তার দেহ পিষ্ট করে দেন। শেখ কুতুব উদ্দিন বখতিয়ার কাকী (র.)'র শিষ্য শেখ বদরুদ্দীন গজনভী সম্পর্কেও এরূপ একটি ঘটনা জানা যায়। শেখ বদরুদ্দিন গজনভী মালিক নিজাম উদ্দিন খারিতাদারের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। খারিতাদার তাঁর জন্য একটি খানকাহ্‌ নির্মাণ করে দেন এবং তাঁর যাবতীয় তছরুপাতের এক মামলায় কারাবন্দি হন। এর ফলে শেখ বদরুদ্দীন গজনভীর খানকাহ্‌য় দারুন আর্থিক সংকট দেখা দেয়। শেখ বদরুদ্দিন উপায়ান্তর না দেখে শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জেশকর (র.) কে তাঁর আধ্যাত্মিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে এ সমস্যার সমাধানের জন্য পত্র লেখেন। শেখ ফরিদ (র.) এতে দারুন অসন্তুষ্ট হন, শেখ বদরুদ্দিনের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন এবং বলেন যে, পূর্বসূরী বুজুর্গদের আদর্শ থেকে বিচ্যুতির কারণে শেখ বদরুদ্দিনের এ দশা হয়েছে।

শেখ নিজাম (র.)'র প্রতি জালালুদ্দিন খলজির মনোভাবঃ শেখ নিজাম (র.) ছোটবেলা থেকেই তাঁর গুরু শেখ ফরিদ (র.)'র পথ অনুসরণ করে আসছিলেন। বলবনের শাসনামলে তিনি যশ ও খ্যাতি অর্জন করে ধীরে ধীরে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনের পথে অগ্রসর হচ্ছিলেন। জালালুদ্দিন খলজি যখন ক্ষমতায় আসেন তখন শেখ নিজাম (র.) দিল্লীর একজন বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব। সুলতান জালাল উদ্দিন খলজি খানকাহর খরচাদি নির্বাহের জন্য শেখ নিজাম (র.) কে কিছু জায়গীর দেবার প্রস্তাব করেন। শেখ নিজাম (র.) প্রস্তাবটি নাকচ করে দিয়ে বললেন, ফলের বাগান এবং জায়গীর দেখাশুনার জন্য দরবেশের সময় নাই। তিনি

তাঁর ভক্তদের মনের দৃঢ়তা পরীক্ষা করার জন্য প্রস্তাবটি তাদের সামনে পেশ করলেন। তারা প্রাচুর্যের পরিবর্তে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যকে বেছে নিলেন। বিশেষ করে কিরমানী পরিবারের সদস্যরা এ প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করায় তিনি অতিশয় খুশী হলেন। পরবর্তীকালে এ সিদ্ধান্ত খানকাহ্র নীতিমালা হিসেবে অনুসৃত হতে থাকে। জালাল উদ্দিন খলজি শেখ নিজাম (র.)'র সাথে দেখা করতে চাইলেন, কিন্তু শেখ নিজাম (র.) তা ভদ্রভাবে নাকচ করে দিলেন। অতঃপর সুলতান জালাল উদ্দিন খলজি শেখ নিজাম (র.) কে না জানিয়ে খানকাহ্ পরিদর্শন করতে মনস্থ করলেন। শেখ নিজাম (র.) বললেন, "আমার ঘরের দু'টো দরজা আছে। সুলতান যদি এক দরজা দিয়ে ঢুকেন আমি অন্য দরজা দিয়ে বের হয়ে যাব।" সুলতান শেখ নিজাম (র.)'র সাথে আকস্মিকভাবে পূর্ব ঘোষণা ছাড়া দেখা করার পরিকল্পনা করলেন। সুলতানের মশবদার (পবিত্র কুরআনের রাজকীয় কপি সংরক্ষক) আমির খসরু বিষয়টি শেখ নিজাম (র.) কে জানিয়ে দিলেন। শেখ নিজাম (র.) সুলতানের সাথে সাক্ষাৎ না করার জন্য অজোধানে তাঁর পীরের মাজার জেয়ারতের জন্য রওয়ানা হয়ে গেলেন। সুলতান যখন জানলেন যে, আমির খসরু এ গোপন তথ্য ফাঁস করেছেন, তখন তিনি আমির খসরুকে ভর্ৎসনা করলেন। "সুলতানের আদেশ না মানার কারণে আমার জীবন ঝুঁকির সম্মুখীন হয়েছিল, কিন্তু পীর শেখ নিজাম (র.)'র সাথে মিথ্যা অভিনয় করলে আমি ঈমান হারাতাম", বললেন আমির খসরু। আমির খসরুর কথা শুনে সুলতান হতভম্ব হয়ে গেলেন। যদিও শেখ নিজাম (র.) সুলতান বা রাজা বাদশাহের জন্য তাঁর সাথে দেখা করার দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর দোয়া নিতে আসা পদস্থ কর্মচারী (Nobles), মালিক, সরকারি কর্মকর্তা, সামরিক লোক প্রমুখদেরকে তাঁর কাছে দেখা করার সুযোগ থেকে তিনি বঞ্চিত করেননি। গরীব ও নিঃস্ব লোকেরা যখন তাঁর সাথে দেখা করতে আসত, তখন তিনি খুশী হতেন এবং মনোযোগ সহকারে তাদের দুঃখ-দুর্দশার কথা শুনতেন। কিন্তু পদস্থ সরকারি কর্মকর্তারা যখন তাঁর কাছে আসতেন তখন তিনি দুঃখ-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে মন্তব্য করতেন, "এ সকল লোকেরা আমার মত ফকীরের সময় নষ্ট করছে।" অবশ্য অনেক পদস্থ কর্মচারী, রাজপুত্র, মালিক প্রমুখ তাঁর ত্বরিকায় বায়াত গ্রহণ করেছিলেন।

সুলতান আলাউদ্দিন খলজির সাথে শেখ নিজাম (র.)'র সম্পর্ক: সুলতান আলাউদ্দিন খলজি যখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন তখন শেখ নিজাম (র.)'র যশ ও খ্যাতি শীর্ষে উপনীত হয়েছে। এ সময়ে রাজপুত্র থেকে শুরু করে রাজ দরবারের কর্মচারী, পণ্ডিতবর্গসহ সকল শ্রেণীর লোক তাঁর কাছে দোয়া চাওয়ার জন্য দলে দলে আসতে থাকে। অনেক সরকারি কর্মচারী তাদের চাকুরী ছেড়ে দিয়ে তাঁর সিলসিলায় বায়াত গ্রহণ করেন এবং আত্মার উন্নতির সাধনায় নিমগ্ন হন। কিছু কিছু দুশমন রাজ কর্মচারী হিংসাবশত সুলতানকে নালিশ করল যে শেখ নিজাম (র.)'র জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির ফলে রাজনৈতিক পরিণতি ভয়াবহ হবে। সুলতান আলাউদ্দিন খলজি বিষয়টি আমলে নিয়ে শেখ নিজাম (র.) কে একটি পত্র লিখে জানালেন যে, এখন থেকে সকল বিষয়ে সুলতানের সাথে পরামর্শ করে শেখ নিজাম (র.) কে কাজ করতে হবে। খিজির খান পত্রটি শেখ নিজাম (র.)'র কাছে নিয়ে গেলেন যা শেখ নিজাম (র.) খুলেও

দেখলেন না। শেখ নিজাম (র.) বললেন, "আমরা দরবেশ, রাষ্ট্রীয় কাজে আমাদের করার কিছু নেই। আমি শহরের এক কোণে জনপদ থেকে দূরে বসতি স্থাপন করেছি এবং সুলতান ও মুসলিমদের জন্য প্রার্থনা করে আমার সময় কাটাই। সুলতান যদি তা পছন্দ না করেন, তাহলে তা আমাকে বলতে বল। আমি চলে যাব এবং অন্যত্র বসতি স্থাপন করব। আল্লাহ্‌র দুনিয়ায় যায়গার অভাব নাই।" এ উত্তরের ফলে সুলতান আশ্বস্ত হলেন যে, শেখ নিজাম (র.)'র কোন রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা নেই। এ সন্দেহ যখন দূর হল, তখন শেখ নিজাম (র.)'র প্রতি সুলতানের শ্রদ্ধা বেড়ে গেল এবং তাঁর আধ্যাত্মিক ক্ষমতায় বিশ্বাস স্থাপন করলেন।

খানকাহ্‌তে গোয়েন্দাগিরিঃ এক পর্যায়ে সুলতান আলাউদ্দিন খলজি শেখ নিজাম (র.)'র খানকাহ্‌তে কী কাজ হয়, লঙ্গর খানায় বিনামূল্যে খাবার কিভাবে বিতরণ হয়, খাবার কোথা থেকে আসে ইত্যাদি জানার জন্য গোয়েন্দা পাঠালেন। যেখানে সুলতান দু'জন লোককে একসাথে বসে খানা খেতে অনুমতি দেননা, সেখানে খানকাহ্‌তে অনেক লোককে কিভাবে একসাথে খাওয়ানো হয় তা তাঁর কাছে উদ্বিগ্নের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। একদিন শেখ নিজাম (র.) জানতে পারলেন যে, খাজা মোহাম্মদ ইমামের পাশে উপবিষ্ট লোকটি হচ্ছে একজন গোয়েন্দা। শেখ নিজাম (র.) তাঁকে কিছুই বললেন না, বরঞ্চ তার জন্য তেহরীসহ এক বাসন খাবার আনতে বললেন। সুলতান লঙ্গরখানার কাজকর্মে অসন্তুষ্ট হলেন। শেখ নিজাম (র.) কে সুলতানের অসন্তুষ্টির কথা জানানো হল। শেখ নিজাম (র.) এতে ভ্রূক্ষেপও করলেন না, বরঞ্চ মোবাশ্বিরকে ডেকে বললেন, "যারা রোজা রেখেছে তাদের জন্য কেক, হালুয়া ও সমুচার ব্যবস্থা কর সেহেরী খাবার জন্য।" সুলতান অবশ্য কোন প্রতিক্রিয়া দেখালেন না। খানকাহ্‌র আধ্যাত্মিক পরিবেশ জাগতিক পরিবেশ থেকে এত আলাদা যে সুলতান বিষয়টি নিয়ে আর বাড়াবাড়ি করলেন না। সুলতানের সন্দেহ ক্রমশ হ্রাস পেতে লাগল। সুলতানের রেশনিং ব্যবস্থা ও নিয়ন্ত্রণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও সুলতান শেখ নিজাম (র.)'র খানকাহ্‌ এবং লঙ্গর খানার কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করেননি। যা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ একটি বিষয়।

জিয়াউদ্দিন বারনী বলেন, যদিও সুলতান শেখ নিজাম (র.)'র সাথে একবারও দেখা করেননি, তাঁর শাসনামলে তিনি শেখ নিজাম (র.) সম্পর্কে কোন কটূক্তি করেননি যা শেখ নিজাম (র.)'র জন্য বিরক্তির কারণ হয়। শেখ নিজাম (র.)'র জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত দুশমনেরা সুলতানকে বলতে লাগল, "শেখ নিজাম (র.) অনেক উপঢৌকন পান, হাজার হাজার লোক তাঁর খানকাহ্‌তে জমায়েত হয়, অনেক লোককে তিনি খানা পরিবেশন করেন ইত্যাদি ইত্যাদি।" কিন্তু সুলতান আলাউদ্দিন খলজি তাতে কর্ণপাত করেননি। শাসনামলের শেষ দিকে সুলতান শেখ নিজাম (র.)'র একজন বিশ্বস্ত ভক্তে পরিণত হন, যদিও উভয়ের সাথে কখনও প্রত্যক্ষ যোগাযোগ হয়নি।

খিজির খান ও সাদী খান প্রসঙ্গঃ সুলতান আলাউদ্দিন খলজি যখন শেখ নিজাম (র.)'র আধ্যাত্মিকতা, মানবতা ও নৈতিকতায় মুগ্ধ হলেন, তখন তিনি যুবরাজ খিজির খান ও সাদী খানকে বায়াত গ্রহণের জন্য শেখ নিজাম (র.)'র নিকট পাঠালেন। যুবরাজদ্বয় শেখ নিজাম

(র.)'র খানকাহ্তে বেশ কয়েকবার আসলেন এবং শেখ নিজাম (র.)'র হাতে বায়াত গ্রহণের জন্য বহু অনুনয়-বিনুনয় করে অনুমতি চাইলেন। কিন্তু শেখ নিজাম (র.) তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থাকলেন। তিনি বললেন, "আপনারা রাজার ছেলে। আপনারা রাজকীয় সুযোগ-সুবিধায় লালিত পালিত হয়েছেন। আপনাদের জন্য শাসনকার্য পরিচালনা করা, সামরিক অভিযান করা, রাজ্য জয় করা ইত্যকার কাজকর্ম মানায়। অন্যদিকে আমার দরবার বা আস্তানা হল দারিদ্র্য, সংযম, আত্মত্যাগ এবং ভোগান্তির জায়গা। আপনারা এসব সইতে পারবেন না।" তারপরও যখন তাঁরা হাল ছাড়লেন না, তখন শেখ নিজাম (র.) তাঁদেরকে তাঁদের পিতার অনুমতি নিতে বললেন। যখন সুলতান আলাউদ্দিন খলজি তাঁদেরকে সমর্থন দিলেন, শেখ নিজাম (র.) তাঁদেরকে বায়াত গ্রহণ করালেন। অতঃপর গিয়াসপুরের খোলা মাঠে একটি ভোজ সভার আয়োজন করার জন্য যুবরাজদ্বয় শেখ নিজাম (র.)'র অনুমতি নিলেন। এটা একটা বিশাল ভোজসভা ছিল। সুলতান সভার প্রস্তুতির জন্য ও খাবার পরিবেশনের জন্য তাঁর পদস্থ কর্মচারীদেরকে দায়িত্ব দিলেন যারা সাত দিন-সাত রাত খেটে সকল প্রস্তুতি সমাপ্ত করলেন। সুলতান যুবরাজদেরকে তাঁদের নিজ হাতে তস্তরী ও হাত ধোয়ার ব্যবস্থা করতে এবং শরবত ও পান খাওয়াতে নির্দেশ দিলেন। যুবরাজগণ স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রা ভর্তি থলে অতিথিদের সামনে রাখলেন। খিজির খান ও সাদী খান ছাড়াও আরও ৪/৫ জন যুবরাজ মেহমানদারীতে অংশ নিলেন। শেখ নিজাম (র.) ভোজ সভায় আসলেন। ভোজ শেষে সেমা মাহফিল শুরু হল। তাহাজ্জুদের নামাযের সময় শেখ নিজাম (র.) সভাস্থল ত্যাগ করলেন সারা রাত সেমা মাহফিল উপভোগ করে। খিজির খান একদা শেখ নিজাম (র.) কে একটি অতি মূল্যবান মণির (Jewel) মালা উপহার দিয়েছিলেন যার প্রতিটি দানা দিয়ে একটি বড় শহর কেনা যেত। শেখ নিজাম (র.) মালাটি গ্রহণ করলেন, কিন্তু যখন তিনি জানলেন যে, মালাটি অতি মূল্যবান মণি খচিত, তখন তা তিনি আঙ্গিনায় ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

শেখ নিজাম (র.)'র প্রতি রাণীর ভক্তিঃ যুবরাজ খিজির খান ও সাদী খানের মাতা রাণী মালিকা জাহানও শেখ নিজাম (র.)'র ভক্ত হয়ে পড়েন। তিনি তাঁর পুত্রদ্বয়কে শেখ নিজাম (র.)'র কাছে তাঁর জন্য দোয়া চাইতে বললেন, শেখ নিজাম (র.) তাঁর খাদেম ইকবালকে কয়েক টুকরা রুটি আনতে বলেন এবং তাতে দোয়া পড়ে মালিকা জাহানের জন্য পাঠান।

সুলতানের অন্য এক স্ত্রী ছিলেন সুলতান মুইজউদ্দিনের কন্যা। যখন তিনি জানতে পারলেন যে শেখ নিজাম (র.)'র একজন ভক্ত অর্থাভাবে তার মেয়েকে বিয়ে দিতে পারছেন না, তখন দ্বিতীয় রাণী ঐ লোকটির জন্য বিরাট অংকের টাকা দান স্বরূপ পাঠালেন।

সুলতান আলাউদ্দিন খলজি তাঁর শাসনামলের শেষ দিকে শেখ নিজাম (র.)'র প্রতি ভীষণ অনুরক্ত হয়ে পড়েন। নিম্নোক্ত ঘটনাগুলো থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়:

১. সুলতান মালিক নায়েবকে দক্ষিণাঞ্চল বিজয়ের জন্য অভিযানে পাঠালেন। চল্লিশ দিন যাবৎ তিনি সেনাবাহিনীর কোন সাফল্যের খবর পেলেন না। এতে সুলতান বিচলিত হয়ে উঠলেন। দিল্লীর মালিক এবং আমিরগণ সন্দেহ করতে লাগলেন যে, হয়ত সেনাবাহিনী বিদ্রোহ করেছে, নতুবা পরাজিত হয়েছে। সুলতান মালিক কারাবেগ (Qara Beg) এবং

বায়ানার (Bayana) কাজী মুগিজ উদ্দিনকে শেখ নিজাম (র.)'র নিকট পাঠালেন এবং বললেন, "শেখ নিজাম (র.) কে আমার সালাম জানাবে এবং বলবে যে, ইসলামের সেনাবাহিনীর কোন খবর না পেয়ে আমি চিন্তিত। ইসলামের প্রতি আমার থেকে আপনার [শেখ নিজাম (র.)'র] ভালবাসা অনেক বেশি। আপনার কলবের আলোতে সব কিছু দেখা যায়। আপনি আমার সেনাবাহিনী সম্পর্কে কোন ভাল খবর দিন।" সুলতান আরও বললেন, "শেখ নিজাম (র.) উত্তরে যা বলবেন, হুবহু তা আমাকে বলবে।" শেখ নিজাম (র.) সব কথা শুনে সেনাবাহিনীর বিজয় ও রাজার জয়ের গল্প বর্ণনা করলেন। শেখ নিজাম (র.) আরও বললেন, "এটা কি বিজয়? আমি আরও বড় বিজয়ের জন্য অপেক্ষা করছি।" সংবাদ বাহক সব কথা সুলতানকে জানালেন। সুলতান শেখ নিজাম (র.)'র কথায় অত্যন্ত খুশি হলেন। তিনি তাঁর রুমালের কোণায় একটি গিরা (Knot) দিলেন এবং বললেন, "আমি শেখ নিজাম (র.)'র বাণী আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করলাম। আমি জানি যে শেখ নিজাম (র.)'র পবিত্র মুখ থেকে কোন ভুল কথা বের হতে পারেনা।" এরপর থেকে সুলতানের কাছে একের পর এক রাজ্য জয়ের খবর এবং অভিযানের সাফল্য আসতে থাকে। এতে শেখ নিজাম (র.)'র প্রতি সুলতানের বিশ্বাস উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। অভিযান থেকে সুলতান প্রচুর সম্পদ (booty) লাভ করেন যা তিনি জনগণের কল্যাণে ব্যয় করেন।

২. শেখ নিজাম (র.)'র জন্য সুলতান ফলের বাগান, জমি এবং প্রচুর দ্রব্য সামগ্রী উপহার হিসেবে মঞ্জুর (Grants) করেন। কিন্তু শেখ তাঁর পূর্বসূরীর ন্যায় এ সকল গ্রহণ করতে অসম্মতি জানান। সুলতান অনিচ্ছা সত্ত্বেও তা মেনে নেন।

৩. আলাউদ্দিন যুবরাজ থাকাকালে খাজা মূয়ীদউদ্দিন তাঁর দেখাশুনা করতেন। যুবরাজ আলাউদ্দিন তাঁকে খুব ভালবাসতেন। যুবরাজ আলাউদ্দিন যখন সিংহাসনে বসেন এবং সুলতান পদে অভিষিক্ত হন, তখন তিনি খাজা মূয়ীদ উদ্দিনকে তাঁর দরবারে ডেকে পাঠান। কিন্তু তখন খাজা মূয়ীদ উদ্দিন শেখ নিজাম (র.)'র শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন এবং দরবেশের জীবন যাপন করছেন। সুলতান শেখ নিজাম (র.)'র কাছে দূত মারফত অনুরোধ জানালেন খাজা মূয়ীদ উদ্দিনকে তাঁর রাজ দরবারে পাঠাতে। শেখ নিজাম (র.) রাজী হলেন না। দূত অবাক হয়ে বললেন, "শ্রদ্ধেয় হুজুর! আপনি কি অন্যদেরকেও আপনার মত বানাতে চান?" শেখ নিজাম (র.) উত্তর দিলেন, "আমার থেকে আরও অনেক ভাল বানাতে চাই।" সুলতান বিষয়টা নিয়ে আর বাড়াবাড়ি করলেন না।

৪. মালিক কিরন [সিকারের (shikar) আমির] আলাউদ্দিন খলজির একজন বিশ্বস্ত প্রশাসক ছিলেন। তিনি শেখ নিজাম (র.)'র শিষ্যত্ব বরণ করার পর শেখ নিজাম (র.) এর সকল ঋণগ্রস্ত শিষ্যের ঋণ পরিশোধ করে দিয়েছেন আজীবন। শেখ নিজাম (র.)'র শিক্ষাই তাঁকে এ দানশীলতার কাজে অনুপ্রাণিত করেছে।

৫. মালিক হুসাম উদ্দিন কলঘ (Qalagh) আলাউদ্দিন খলজির ভাগিনা ছিলেন। তিনি শেখ নিজাম (র.)'র হাতে বায়াত গ্রহণ করলেন এবং শেখ নিজাম (র.) কে তাঁর বাসায় দাওয়াত করলেন। শেখ নিজাম (র.) দাওয়াত কবুল করলেন। মালিক হুসাম উদ্দিন তাঁর সকল

সম্পত্তি, ঘোড়া, স্বর্ণ, রূপা, মূল্যবান পাথর প্রভৃতি সংগ্রহ করলেন এবং সেগুলোকে দু'ভাগ করলেন– একভাগ তাঁর মাতাকে দিলেন এবং আর একভাগ তাঁর গুরু শেখ নিজাম (র.)'র তরফে (in the name of) দান করে দিলেন। শেখ নিজাম (র.)'র তাঁর বাসায় আগমণকে চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য তাঁর সকল ক্রীতদাসকে আজাদ করে দিলেন। শেখ নিজাম (র.) একটি পাল্কী করে তাঁর বাড়িতে আসলেন এবং দু'তিনটি আঙ্গিনা অতিক্রম করে দরবার হলে পৌঁছলেন। দামী কার্পেট দিয়ে দরবার হলের পথ আবৃত করে দেয়া হল যাতে বেহারাদের (পাল্কী বহনকারী) পদধূলি কার্পেটে পড়ে। এই কার্পেটগুলো বেহারাদেরকে দিয়ে দেয়া হলো। শেখ নিজাম (র.) মালিক হুসাম উদ্দিনকে আন্তরিকভাবে দোয়া করলেন।

৬. মালিক কিরবক (Qir Bak) সুলতান আলাউদ্দিন খলজির আর একজন বিখ্যাত প্রশাসক ছিলেন। একদিন এক আগন্তুক তাঁর দু'টো কন্যার বিয়ের জন্য শেখ নিজাম (র.)'র দোয়া চাইলেন। শেখ নিজাম (র.) একটি কাগজে তার (আগন্তুকের) আবেদনটি লিখলেন এবং কাগজটি নিয়ে মালিক কিরবককে দিতে বললেন। কিরবক তার মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করলেন এবং লোকটিকে তাঁর সকল সম্পদ হস্তান্তর করলেন। পরের দিন কিরবক যখন রাজ দরবারে গেলেন, তখন সুলতান এ ব্যাপারে জানতে চাইলেন। সুলতান বিষয়টি জানলেন কি করে তা নিয়ে তিনি যদিও একটু বিস্মিত হলেন, কিন্তু তিনি অকপটে ঘটনাটি বর্ণনা করলেন। সুলতান তাঁর মহত্ত্বের প্রশংসা করলেন এবং তিনি যে দান করেছেন তার দশগুণ বেশি সম্পদ তাকে দান করলেন।

৭. মাওলানা শরাফ উদ্দিন জামাকল সুলতান আলাউদ্দিন খলজির ভাইপোর শিক্ষক ছিলেন। তিনি শেখ নিজাম (র.)'র হাতে বায়াত গ্রহণের জন্য বারবার অনুরোধ করলেন, কিন্তু শেখ নিজাম (র.) রাজী হলেন না। শেখ নিজাম (র.)'র দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য তিনি একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। তিনি কিছু খাবার রান্না করলেন, খাবারগুলো একটি পাত্রে রেখে মাথায় নিলেন এবং পাত্রটিকে রশি দিয়ে ঘাড়ের চতুর্দিকে বাঁধলেন এবং এক মাইলেরও অধিক পথ হেঁটে খাবারটি মাথায় নিয়ে শেখ নিজাম (র.)'র কাছে আসলেন। শেখ নিজাম (র.) তাঁকে বায়াত করালেন এবং সিলসিলায় ভর্তি করলেন।

৮. সুলতান মাওলানা আলাউদ্দিনকে (যিনি অত্যন্ত ধর্মপরায়ন ও বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন) জৈনের (Jhain) কাজী পদে নিয়োগ দান করেন। তিনি সোহরাওয়ার্দী ত্বরিকার অনুসারী ছিলেন। একজন প্রশাসককে তাঁর কাছে বিচারের জন্য আনা হয় এমন একটি অপরাধের জন্য যার শাস্তি হওয়া উচিৎ মৃত্যুদণ্ড। কাজী তাঁকে ফাঁসি দিলেন। সুলতান যখন এ খবর শুনলেন, তিনি রাগে ফেটে পড়লেন। সুলতান কাজীকে শিকল বেঁধে তাঁর সামনে উপস্থিত করার জন্য আদেশ দিলেন। রাজ দরবারে আসার পথে তিনি কোনভাবে সুলতানের আজ্ঞাবহ কর্মকর্তাকে রাজী করালেন তাঁকে শেখ নিজাম (র.)'র নিকট নিয়ে যাবার জন্য। কাজী শেখ নিজাম (র.)'র নিকট দোয়া চাইলেন ক্ষমা পাওয়ার জন্য, কারণ তিনি শরীয়াহ্ নীতিমালা অনুযায়ী বিচার করেছেন। পরের দিন কাজীকে সুলতানের সামনে উপস্থিত করা হলে

অপ্রত্যাশিতভাবে সুলতান তাঁকে মুক্তি দিলেন এবং একটি প্রশংসাসূচক সম্মাননা প্রদান করলেন।

৯. যখন কুতলুঘ খাজা (Qutlugh Khwaja) বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে দিল্লী আক্রমণ করলেন এবং কিলির যুদ্ধ (battle of Kili) সংঘটিত হল, তখন শেখ নিজাম (র.) সুলতানকে আধ্যাত্মিকভাবে সাহায্য করলেন এবং তিনি বিজয়ী হলেন। যুদ্ধের সময় শেখ নিজাম (র.) শহরের বাইরে কোথাও গেলেন না। কুতলুঘ আদেশ দিলেন যে, কেউ যেন ঘোড়া নিয়ে ভারত ভূখণ্ডে প্রবেশ না করে। সুলতান আলাউদ্দিন আদেশ দিলেন যে, কোন ক্রীতদাসকে যেন মঙ্গোলীয় ভূখণ্ডে নিয়ে যাওয়া না হয়। একজন ভারতীয় মঙ্গোলীয় ভূখণ্ড থেকে ঘোড়া ক্রয় করে ভারতে পাচার করার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছিল। ভারতীয় ঘোড়া পাচারকারীকে হাতে নাতে ধরে ফেলা হল এবং কুতলুঘ খাজার সামনে তাকে উপস্থিত করা হল। পাচারকারী যখন নিজেকে শেখ নিজাম (র.)'র শিষ্য বলে পরিচয় দিল, কুতলুঘ তাকে মাফ করে দিলেন। তখন পাচারকারী বলল, "বাড়িতে ফিরে শেখ নিজাম (র.)'র কাছে যাব এবং তাঁর কাছে আমার অপরাধের জন্য ক্ষমা চাইব।"

খিজির খান ও সাদী খানের ফাঁসি: আলাউদ্দিন খলজির রাজত্বের শেষের দিকে তাঁর রাজকীয় কর্তৃত্ব দ্রুত হ্রাস পায় এবং মসনদের পশ্চাতে মালিক কাপুরের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। তাঁর ক্ষমতা সুসংহত করার জন্য মালিক কাপুর প্রধান প্রধান প্রশাসককে ক্ষমতাচ্যুত করেন এবং খিজির খান ও সাদী খানকে গোয়ালিয়র দুর্গে কারাবন্দি করেন। আলাউদ্দিন খলজি ১৩১৬ সালের ৪ঠা জানুয়ারি (৭ই শাওয়াল, ৭১৫ হিজরি) মৃত্যুবরণ করেন। আলাউদ্দিন খলজির মরদেহ কবরে নামানো হচ্ছে ঠিক এমন সময় মালিক কাপুর খিজির খান ও সাদী খানের চোখ উপড়ে ফেলার জন্য মালিক সুম্বুলকে (Sumbul) গোয়ালিয়র দুর্গে পাঠান। ১৪ই এপ্রিল, ১৩১৬ সালে (২০শে মহর্‌রম, ৭১৬ হিজরি) মোবারক খলজি সিংহাসনে বসেন। মাত্র তিন মাসের মাথায় মালিক কাপুর শিহাব উদ্দিন ওমর নামক এক শিশুকে সিংহাসনে বসান এবং মোবারক খলজিকে অপসারণ করেন। অতঃপর তিনি আলাউদ্দিন খলজির পরিবারের উপর নৃশংস অত্যাচার চালান। মোবারক খলজি থেকে দুই অন্ধ যুবরাজ খিজির খান ও সাদী খানের ফাঁসির আদেশ লিখিয়ে নেন মালিক কাপুর এবং তা কার্যকর করান ১৩১৮ ইং সনে। যখন যুবরাজদের চোখ উপড়ে ফেলা হচ্ছিল, তখন কোন একজন বলছিল, "শেখ নিজাম (র.)'র শিষ্য হয়ে তোমাদের লাভ কী হল?" যুবরাজদ্বয় উত্তর দিলেন, "ওহে ভ্রান্ত বিপথগামী বিচারিক। শেখ নিজাম (র.)'র শিষ্যত্ব বরণ করায় আমাদের কোন ক্ষতি বা দুর্ভাগ্য হয়নি। বরঞ্চ তাঁর বায়াত গ্রহণ করায় আমরা পার্থিব জগতের খারাপ কাজে সম্পৃক্ত না হয়ে এবং অনর্থক নির্দোষ ব্যক্তিদের রক্ত না ঝরানোর পাপ থেকে ও কারও সম্পত্তি অবৈধভাবে আত্মসাৎ করার দায় থেকে বেঁচে গেছি। শেখ নিজাম (র.) আমাদেরকে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত অন্যায়ের শাস্তি থেকে আমাদেরকে পরিত্রাণ লাভের পথ দেখিয়েছেন। যদি কেউ একজন বিশ্বাসী মুসলমানকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে, তার বাসস্থান জাহান্নাম। সেখানে সে চিরকাল থাকবে। যারা অন্যায়ভাবে এতিমের সম্পত্তি গ্রাস করে, তারা যেন

তাদের শরীরে লাগা আগুন ভক্ষণ করে। আমাদের বাহ্যিক দৃষ্টি চলে গেলেও আল্লাহ্ যদি আমাদের অন্তর্চক্ষু খুলে দেন, সেটাই হবে আমাদের প্রতি শেখ নিজাম (র.)'র আশীর্বাদ। কারণ আমরা শেখ নিজাম (র.)'র পবিত্র হাত ধরেছি এবং আমাদের সকল বিষয়ে তাঁর উপর আস্থা স্থাপন করেছি। আমরা আশা করি যে, কাল কিয়ামতের ময়দানে আমরা শেখ নিজাম (র.)'র পতাকাতলে থাকব।"

১৩১৫ ইং থেকে ১৩১৯ ইং পর্যন্ত (৭১৫ হি.–৭১৯ হি.) সময়কালে শেখ নিজাম (র.) রাজনৈতিক কোন ঘটনা কিংবা খিজির খান ও সাদী খানের ফাঁসি সম্পর্কে কিছুই বলেন নি। বহু শাসক সিংহাসনে বসেছেন, সিংহাসন ছেড়েছেন, রাজপুত্রগণ ক্ষমতার জন্য লড়াই করেছেন। কিন্তু শেখ নিজাম (র.) এসব নাটকীয় রাজনৈতিক উত্থান-পতন নিয়ে কোন মন্তব্য করেননি।

সুলতান মোবারক খলজির সাথে শেখ নিজাম (র.)'র সম্পর্ক: সুলতান মোবারক খলজি হলেন একজন ব্যর্থ, নির্বুদ্ধি এবং সাধারণ শ্রেণীর ব্যক্তি যিনি তাঁর পিতার সকল নীতি ও আদর্শ এবং বিশ্বাস থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্যুত একজন নামমাত্র শাসক। তিনি খলীফা উপাধি গ্রহণ করেছিলেন যা পূর্ববর্তী কোন সুলতান গ্রহণ করেননি এবং তিনি দিল্লীকে 'দারুল খিলাফাহ্' বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন। তিনি শেখ নিজাম (র.) এর প্রতি খারাপ মনোভাব পোষণ করতেন যেহেতু শেখ নিজাম (র.) খিজির খানের আধ্যাত্মিক গুরু ছিলেন। তিনি রাজ দরবারে বসে শেখ নিজাম (র.)'র বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক মনোভাব দেখাতেন এবং বিভিন্ন প্রকারের কটূক্তি করতেন। এ অসৎ বদমেজাজী ও দুষ্টু লোকটি ঘোষণা করেন, "যে শেখ নিজাম (র.)'র পবিত্র মস্তক তাঁর কাছে এনে দিতে পারবে, তাকে এক হাজার টাকা (টংকা) পুরস্কার দেয়া হবে"।

রাজদরবারের পদস্থ কর্মকর্ত যথা: মালিক, আমির, নোবল প্রমুখ শেখ নিজাম (র.)'র সাথে যেন খানকাহ্তে গিয়ে দেখা করতে না পারেন সেজন্য সুলতান মোবারক নির্দেশ জারি করেন। তিনি (সুলতান মোবারক) মনে করলেন যে, এর ফলে শেখ নিজাম (র.)'র আয় কমে যাবে এবং লঙ্গরখানা বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু তাঁর সে প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। মোবারক যখন দেখলেন যে, এর ফলে শেখ নিজাম (র.)'র খরচাদির পরিমাণ দ্বিগুণ বেড়ে গিয়েছে, তখন তাঁর আফসোসের সীমা রইলনা। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। সুলতান মোবারকের রাজ কর্মচারী তালবগ ইয়াগদা এ সময়ে শেখ নিজাম (র.)কে একশত স্বর্ণমুদ্রা উপহার দিলেন, কিন্তু শেখ নিজাম (র.) তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালেন। ইয়াগদা খুবই দুঃখ প্রকাশ করলেন। শেখ নিজাম (র.) অবশেষে একটি স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণ করলেন। ইয়াগদা শেখ নিজাম (র.) কে আরও কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রা নেয়ার জন্য অনুরোধ করলেন, কিন্তু শেখ নিজাম (র.) সম্মত হলেন না। সম্ভবতঃ শেখ নিজাম (র.) এই ভেবে নিলেন না যে, এর ফলে সুলতান কিংবা ইয়াগদা মনে করতে পারে যে তাদের দানেই লঙ্গরখানা চলে। ইয়াগদা শেখ নিজাম (র.) কে অত্যধিক শ্রদ্ধা করতেন এবং তাঁর উদারতা ও দরিদ্রের প্রতি অনুকম্পা এবং দানশীলতাকে প্রশংসা করতেন। শেখ নিজাম (র.)'র এ আদর্শ দ্বারা তিনি প্রভাবিত

হয়েছিলেন এবং গরিব-দুঃখীকে সাহায্য করার জন্য অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন। ইয়াগদা রাজ দরবার থেকে ৭০,০০০ টাকা (টংকা) সুলতান মোবারকের আমলে প্রণোদনা হিসেবে পেয়েছিলেন এবং এর সম্পূর্ণটা গরিব-দুঃখীর জন্য বিলিয়ে দিয়েছিলেন। একদিন সুলতান মোবারক নেশাগ্রস্ত অবস্থায় শেখ নিজাম (র.)'র সিলসিলার চিহ্ন বহনকারী টুপিটি ইয়াগদার মাথা থেকে নামিয়ে ফেলার জন্য আদেশ দেন। সুলতান পর পর তিনবার আদেশ দিলেন এবং খোপ থেকে তরবারী বের করলেন, কিন্তু ইয়াগদা তাঁর পীর শেখ নিজাম (র.)'র পবিত্র হস্ত দ্বারা তাঁর মাথায় পরিয়ে দেয়া টুপিটি নামিয়ে গুরুকে (শেখ নিজাম (র.)কে অসম্মান করতে পারলেন না। ইয়াগদার মনের দৃঢ়তা দেখে সুলতান মোবারক খুশী হলেন এবং বললেন, "মুরীদকে এরূপই হতে হয়।" মোবারক ইয়াগদাকে রাজভাতা বাড়িয়ে দিলেন এবং তাঁকে প্রশংসাসূচক সম্মাননা প্রদান করলেন। ইয়াগদা বিষয়টি শেখ নিজাম (র.)কে জানালেন এবং প্রাপ্ত সকল ভাতা লঙ্গর খানার জন্য দান করলেন। শেখ নিজাম (র.) খাদেম ইকবালকে ইয়াগদার জন্য কিছু আনতে বললেন। ইকবাল হাতের কোষ (handful) ভর্তি করে অনেকগুলো স্বর্ণমুদ্রা আনলেন এবং সেগুলো ইয়াগদার কোলে ছুঁড়ে মারলেন। অতঃপর শেখ নিজাম (র.) ইয়াগদা কর্তৃক প্রদত্ত টাকাগুলো ফেরৎ দিয়ে বললেন, "এগুলোর দরকার নেই।"

শেখ নিজাম (র.)কে অবমাননা করার জন্য সুলতান মোবারকের পদক্ষেপ: শেখ নিজাম (র.)কে অসম্মান করার জন্য সুলতান মোবারক একটি বার্তা পাঠিয়ে বললেন, "শেখ রুকুনুদ্দিন সুদূর মুলতান থেকে এসে আমার সাথে দেখা করতে পারে, অথচ আপনি দিল্লীতে বসবাস করে আমার সাথে রাজ দরবারে এসে দেখা করতে পারেন না। এটা কেমন কথা?" শেখ নিজাম (র.) ক্ষমা চাইলেন এবং সুলতানকে জানালেন যে, তাঁর সিলসিলাহ্‌ভুক্ত অলি-বুজুর্গদের রাজদরবারে যাওয়ার রেওয়াজ নেই। সুলতান বারবার শেখ নিজাম (র.)'র শান্তিপূর্ণ জীবনে হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করলেন, ফলে শেখ নিজাম (র.) খুবই বিরক্ত হলেন। শেখ নিজাম (র.) অবশেষে হাসান আলী সিজ্‌জী মারফত সুলতানের পীর শেখ জিয়াউদ্দিন রুমীর কাছে নিম্নোক্ত মর্মে একটি বার্তা পাঠালেন: "আপনি সুলতানকে বলুন তিনি যেন দরবেশদেরকে উত্ত্যক্ত না করেন। দরবেশদেরকে উত্ত্যক্ত করার কাজ থেকে বিরত থাকলে সুলতানের উভয় জাগতিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হবে।" কিন্তু শেখ রুমী অসুস্থ্ থাকায় শেখ নিজাম (র.)'র বক্তব্য সুলতানকে পৌঁছানো যায়নি। কিছুদিন পর শেখ রুমী ইন্‌তিকাল করেন এবং ইন্‌তিকালের তিনদিন পর আয়োজিত তাঁর চেহলাম বা ফাতেহাখানিতে সুলতানের সাথে শেখ নিজাম (র.)'র মুখোমুখি দেখা হয়। সুলতান মোবারক খলজি শেখ নিজাম (র.)'র প্রতি উত্তেজিত মনোভাব দেখান এবং শেখ নিজাম (র.)'র সালামের জবাব পর্যন্ত দিলেন না।

সুলতান মোবারকের লম্পট জীবন এবং শেখ নিজাম (র.)'র উপদেশ: সিংহাসনে আরোহনের পর থেকে সুলতান মোবারক নারী, মদ, জুয়াসহ যত প্রকার বদভ্যাস থাকতে পারে সবগুলোর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন। সুলতানের চরম নৈতিক অবক্ষয় ও অধঃপতন দেখে

শেখ নিজাম (র.) আফসোস করলেন এবং তাঁর পীর রুকুনুদ্দিন রুমীর চেহলামে তাঁকে দেখা পেয়ে উপদেশ না দিয়ে পারলেন না। শেখ নিজাম (র.) মহানবী (দ.)'র নিম্নোক্ত হাদীসটি আবৃত্তি করলেনঃ "যে কেউ কোন সভায় কারো সাথে কিছুক্ষণের জন্য বসে; তাঁকে আল্লাহ্ তায়ালা জিজ্ঞাসা করবেন, সে সভায় উপস্থিত লোকদের প্রতি আল্লাহ্ তায়ালার প্রদত্ত দায়িত্ব তিনি পালন করেছেন কিনা।" সুলতান এ হাদীস শোনার পর কী প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন তা জানা যায়নি। তবে সুলতানের জন্য এর থেকে প্রাসঙ্গিক এবং ভাল উপদেশ আর কিছু হতে পারত না।

শেখ নিজাম (র.)'র জনপ্রিয়তা হ্রাস করার জন্য সুলতানের পদক্ষেপঃ সবচেয়ে বেশি যে জিনিসটা সুলতানকে শেখ নিজাম (র.)'র প্রতি ঈর্ষান্বিত করে তুলেছিল সেটা হল শেখ নিজাম (র.)'র জনপ্রিয়তা। শেখ নিজাম (র.)'র জনপ্রিয়তা হ্রাস করার জন্য সুলতান মুলতান থেকে শেখ রুকুনুদ্দিন ফতেহ্কে এনে জনগণকে শেখ নিজাম (র.) থেকে বিচ্ছিন্ন করার প্রচেষ্টা চালান। কিন্তু শেখ রুকুনুদ্দিন ছিলেন শেখ নিজাম (র.)'র শ্রেষ্ঠ বন্ধু এবং শেখ নিজাম (র.) কে দিল্লীর একজন সর্বোত্তম ব্যক্তি বলে মনে করতেন। সুলতানের পরিকল্পনা ব্যর্থ হল। অতঃপর সুলতান শেখজাদা জাম (Jam) নামে একজন ব্যক্তিকে [যিনি শেখ নিজাম (র.)'র বিরোধী] সরকারিভাবে স্বীকৃত অলি হিসেবে প্রচার করেন এবং আশা করেছিলেন যে, লোকজন শেখ নিজাম (র.)'র পরিবর্তে শেখজাদা জাম (Shaikhjada Jam) কে ভক্তি শ্রদ্ধা করবেন। এ চেষ্টাও সফল হয়নি। শেখ নিজাম (র.)'র খানকাহ্য় লোকজনের আনাগোনা আরও বেড়ে গেল।

মসজিদে মিরীতে নামায পড়তে শেখ নিজাম (র.)'র অসম্মতিঃ সুলতান মোবারক দিল্লীতে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন এবং মসজিদটির নাম দেন 'মসজিদে মিরী'। সুলতান রাজধানীর শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদেরকে মসজিদে প্রথম জামাতে নামায আদায় করার জন্য আমন্ত্রণ জানান। সুলতান শেখ নিজাম (র.) কেও উক্ত জামাতে অংশগ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু শেখ নিজাম (র.) অপারগতা প্রকাশ করে ক্ষমা চান এবং বলেন, "আমার বাড়ির নিকটস্থ মসজিদের দাবী আমার উপর অনেক বেশি।" শেখ নিজাম (র.)'র উত্তরে সুলতান অত্যন্ত বিরক্ত হন, কিন্তু শেখ নিজাম (র.) তাঁর সিদ্ধান্তে অনড় থাকেন।

রাজাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য রাজ দরবারে যেতে শেখ নিজাম (র.)'র অসম্মতিঃ সে সময়ে দিল্লীতে প্রত্যেক মাসের প্রথম দিবসে আলেম-ওলামা, অলি-বুজুর্গ ও পদস্থ ব্যক্তিবর্গ (Nobles) রাজ দরবারে উপস্থিত হয়ে সুলতানকে শুভেচ্ছা ও অভ্যর্থনা জানানোর রেওয়াজ ছিল। শেখ নিজাম (র.) সুলতান আলাউদ্দিন খলজির শাসনামলে কোনদিন তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে যাননি এবং সুলতান আলাউদ্দিন খলজি তা আশাও করেননি। কিন্তু সুলতান মোবারক শেখ নিজাম (র.)কে রাজ দরবারে উপস্থিত করানোর জন্য জেদ ধরেছিলেন। শেখ নিজাম (র.) তাঁর খাদেম ইকবালকে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে রাজ দরবারে পাঠান। সুলতান এটাকে গুরুতর অপরাধ হিসেবে নেন এবং পরবর্তী মাসে শেখ নিজাম (র.) যদি নিজে স্বয়ং রাজ প্রাসাদে না আসেন তা'হলে তাঁকে শাস্তি দেবার হুমকি দেন। সুলতান সৈয়দ কুতুব

উদ্দিন গজনভী, শেখ ইমাদ উদ্দিন তুসী, শেখ ওয়াহিদ উদ্দিন কানজী, মাওলানা বুরহান উদ্দিনসহ বেশ কয়েকজন সম্মানিত ব্যক্তিকে সুলতানের আদেশ অমান্য করার পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়ার জন্য শেখ নিজাম (র.)'র নিকট পাঠান। লোকজন সুলতানের এ ধরনের হীন মনোভাবের কথা জানতে পেরে দারুণ ক্ষেপে গেলেন। সারা দিল্লী শহরে নাগরিক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু শেখ নিজাম (র.) মোটেও চিন্তিত হলেন না এবং ধৈর্য ধারণ করলেন। কিন্তু একদিন শেখ নিজাম (র.) তাঁর মায়ের কবরের পাশে গেলেন, চোখের জল ফেললেন এবং বললেন, "আগামী চান্দ্র মাসের (Lunar month) প্রথম তারিখে যদি সুলতানের জীবনাবসান না হয়, তাহলে আমি আপনার কবরের পাশে আর আসবনা।" চিন্তাশীল লোকজন সুলতান এবং শেখ নিজাম (র.)'র মাঝে এ বিবাদের ভয়াবহ পরিণতির আশঙ্কা করলেন। পরবর্তী মাসের প্রথম তারিখ যতই ঘনিয়ে আসতে লাগল, সকলে শেখ নিজাম (র.)কে প্রথম তারিখে রাজদরবারে সুলতানের নিকটে যাবার জন্য অনুনয় বিনয় করতে লাগলেন। কারণ তারা আশঙ্কা করছিলেন যে, না গেলে পরিণতি ভয়াবহ হবে যেহেতু সুলতান বদমেজাজী লোক। শেখ নিজাম (র.) লোকজনের অনুরোধে কান দিলেন না এবং শান্ত থাকলেন। ভক্তকুল যখন বার বার পীড়পীড়ি করতে লাগলেন, তখন শেখ নিজাম (র.) বললেন, "গত রাত আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, একটি ষাঁড় আমার দিকে তেড়ে আসছে। আমি তার শিং ধরে ফেলেছি এবং তাকে পেছনে ঠেলে দিয়েছি।" শিষ্যরা এ স্বপ্নকে শেখ নিজাম (র.)'র কোন ক্ষতি না হবার ঈঙ্গিত বলে মনে করলেন এবং কিছুটা আশ্বস্ত হলেন। খাদেম ইকবাল রাজদরবারে শেখ নিজাম (র.) কে নিয়ে যাবার জন্য পাল্কী আনবার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। কিন্তু শেখ নিজাম (র.) তাঁকে দৃঢ়ভাবে বললেন, "অন্য কিছু কর।" কেউ কেউ শেখ নিজাম (র.) কে তাঁর পীর শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জেশকর (র.)'র রূহানী সাহায্য কামনা করার জন্য প্রস্তাব করলেন। শেখ নিজাম (র.) বললেন, "সামান্য একটি দুনিয়াবী ব্যাপারে আমার পীরের সহায়তা চাওয়াকে আমি লজ্জাকর মনে করি।" খানকাহ্‌র অধিবাসীগণ এবং দিল্লীর জনগণ অতি উৎকণ্ঠায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত করতে লাগলেন এবং যে কোন মুহূর্তে সুলতানের তরফ থেকে সমন বা পরোয়ানা জারির আশঙ্কা করতে লাগলেন। কিন্তু ঘটনার মোড় নিল ভিন্ন দিকে। কয়েক ঘণ্টা অতিবাহিত হতে না হতেই পারওয়ারিসের (Parwaris) হাতে সুলতানের জীবনের যবনিকাপাত হল। শেখ নিজাম (র.)'র মুনাজাতের ফলশ্রুতিতেই সুলতানের এ করুণ পরিণতি ঘটেছে বলে সুফি সাধকগণ মনে করেন। যদিও আপাত দৃষ্টিতে ঘাতক পারওয়ারিস (Parwaris) এর জন্য দায়ী।

সুলতান গিয়াস উদ্দিন তুঘলকের সাথে শেখ নিজাম (র.)'র সম্পর্ক: সুলতান গিয়াস উদ্দিন তুঘলকের সাথে শেখ নিজাম (র.)'র সম্পর্ক ভাল ছিলনা। এর প্রধান কারণগুলো নিম্নরূপ:

১. মোবারক আততায়ীর হাতে নিহত হবার পর খসরু খান ক্ষমতার মসনদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি দিল্লীর অলি বুজুর্গ ও ওলামাদের সমর্থন পাওয়ার জন্য প্রচুর অর্থ তাঁদেরকে বিলিয়ে দেন। তিনি শেখ নিজাম (র.) কে ৫০,০০০ টংকা (Tanka) পাঠান। শেখ নিজাম (র.) টংকাগুলো গরীব-দুঃখীদের মাঝে বিতরণ করে দেন। যখন গিয়াস উদ্দিন তুঘলক ক্ষমতায়

আসেন, তখন তিনি খসরু খান কর্তৃক বিলিকৃত সকল অর্থ পুনরায় ফেরৎ দেয়ার জন্য দান গ্রহীতাদেরকে আদেশ দেন। কিন্তু শেখ নিজাম (র.) তা ফেরৎ দিতে অসম্মতি জানান। টাকাগুলো জনগণের (বায়তুল মাল) সম্পদ। তাই তিনি এ টাকাগুলো জনগণকে বিলিয়ে দিয়েছেন। তা ফেরৎ দেয়া সম্ভব নয়। এতে সুলতান বিরক্ত হন।

২. শেখ নিজাম (র.) তাঁর সিলসিলাহ্ভুক্ত পূর্বসূরী অলিদের অনুসরণে সেমা মাহফিল করতেন। আলেম সমাজ এতে আপত্তি জানায়। শেখজাদা হুসাম উদ্দিন ফারজাম, কাজী জালাল উদ্দিন সোরানজি, নায়েব হাকিম-ই মামলাকাত সুলতানের পক্ষ নেন এবং শেখ নিজাম (র.)'র বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার জন্য সুলতানকে প্ররোচিত করেন। বিষয়টি আলোচনা করার জন্য সুলতান আলেমদের এক সভা ডাকেন। সভায় শেখ নিজাম (র.) ও যোগদান করেন। শেখ নিজাম (র.) সেমার পক্ষে হাদীসের উদ্ধৃতি দিতে চাইলে বিরুদ্ধবাদী আলেমরা বাধা দেন। এতে শেখ নিজাম (র.) বিরক্ত হন। বিশদ আলোচনার পরও সুলতান সেমা মাহফিলের বিরুদ্ধে নির্দেশ জারি করতে রাজী হলেন না। অবশ্য জনসমক্ষে উন্মুক্ত ময়দানে সেমা মাহফিলকে নিরুৎসাহিত করা হয়। এর ফলে সুলতান এবং ওলামাদের মধ্যে সম্পর্কের টানা পোড়ন সৃষ্টি হয়।

৩. বঙ্গ অভিযানের পর যখন সুলতান প্রত্যাবর্তন করছিলেন, তখন তিনি রাজধানী দিল্লীতে পৌঁছার আগে শেখ নিজাম (র.) কে দিল্লী ছাড়ার জন্য নির্দেশ পাঠালেন। রাজকীয় নির্দেশ পাওয়ার পর শেখ নিজাম (র.) মন্তব্য করেছিলেন, 'দিল্লী এখনও অনেক দূর' (হুনুজ দিল্লী দূর আস্ত)। যুবরাজ জুনা খান, উলুগ খান (ভাবী সুলতান মোহাম্মদ বিন তুঘলক) সুলতানকে আফগানপুরে সংবর্ধনা জানানোর জন্য বিশাল আয়োজন করলেন। সুলতানকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য তাড়াহুড়ো করে কাঠের যে মঞ্চ তৈরি করা হয় তা হঠাৎ করে ভেঙে পড়ল এবং কাঠের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের কবর রচিত হল। কোন কোন লেখক অভিমত প্রকাশ করেন যে, শেখ নিজাম (র.) সুলতানের মৃত্যুর এক মাস পূর্বে ওফাতপ্রাপ্ত হন। কথাটি সত্য নয়। শেখ নিজাম (র.) ওফাতপ্রাপ্ত হন রবিউস সানি (৭২৫ হি.) মাসের ১৮ তারিখে এবং সুলতান গিয়াস উদ্দিন তুঘলক মারা যান রবিউল আউয়াল (৭২৫ হি.) মাসে। এ প্রসঙ্গে কেউ কেউ এ অভিমতও প্রকাশ করেন যে, সম্ভবতঃ গিয়াস উদ্দিন তুঘলকের মৃত্যুর পশ্চাতে উলুগ খান (মোহাম্মদ বিন তুঘলক) এর ষড়যন্ত্র ছিল, কারণ মোহাম্মদ বিন তুঘলক যুবরাজ থাকাকালে শেখ নিজাম (র.)'র ভক্ত ছিলেন এবং তাঁর কাছে নিয়মিত আসা যাওয়া করতেন। কিন্তু এ অভিমত ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত হয়নি। নিম্নের বর্ণনা লক্ষ্যণীয়: একদা মোহাম্মদ বিন তুঘলক যখন যুবরাজ অবস্থায় শেখ নিজাম (র.)'র দরবারে আসেন, তখন খাদেম ইকবাল বলেন, 'হুজুর! উলুগ খান এসেছেন।' শেখ নিজাম (র.) বললেন, 'বল, সুলতান এসেছেন।' খাদেম ইকবাল পর পর তিনবার বললেন, 'হুজুর! উলুগ খান এসেছেন।' শেখ নিজাম (র.) প্রতিবারই বললেন, 'বল, সুলতান এসেছেন।' অতঃপর শেখ নিজাম (র.) খাদেম ইকবালকে বললেন, 'লালা! আমি কি তোমাকে 'সুলতান এসেছেন' বলতে বলিনি?' ইত্যবসরে উলুগ খান শেখ নিজাম (র.)'র সামনে উপস্থিত হলেন

এবং শেখ নিজাম (র.)'র মন্তব্য শুনলেন। যুবরাজ দাঁড়িয়ে শেখ নিজাম (র.) কে শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রস্থান করলেন। সুলতান গিয়াস উদ্দিন তুঘলক যখন লখনৌটি (Lakhnauti) তে ছিলেন, তখন যুবরাজ উলুগ খান শেখ নিজাম (র.)'র স্বাস্থ্য সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতে তাঁর দরবারে এসেছিলেন। শেখ নিজাম (র.) তখন ভীষণ অসুস্থ ছিলেন। শেখ নিজাম (র.) উলুগ খানকে তাঁর খাটে বসতে বললেন। উলুগ খান শ্রদ্ধাবনত চিত্তে ইতস্তত করছিলেন। শেখ নিজাম (র.) তিনি খাটে বসছেন না দেখে বললেন, "আমরা আপনাকে খাটে বসার জন্য আদেশ দিচ্ছি।" ফলে উলুগ খান খাটে না বসে পরলেন না। তবে তিনি তাঁর শরীরের অর্ধেক অংশ খাটের বাইরে রেখে এক কোণায় কোনমতে বসলেন। অতঃপর শেখ নিজাম (র.) খাদেম ইকবালকে একটি চেয়ার আনতে বললেন এবং তাতে খাজা জাহানকে বসতে বললেন। তখন উলুগ খান খাজা জাহানকে বললেন, "শেখ নিজাম (র.) আমাকে সিংহাসন দিয়েছেন এবং আপনাকে ওজারতের চেয়ার দিয়েছেন।" উল্লেখ্য যে, বাহমানী রাজ্যের (Bahmani Kingdom) প্রতিষ্ঠাতা আলাউদ্দিন বাহমান শাহ্ সম্পর্কেও শেখ নিজাম (র.) অনুরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

এ সকল ঘটনা প্রবাহ যথা: যুবরাজের শেখ নিজাম (র.)কে দেখতে আসা, শেখ নিজাম (র.)'র উলুগ খান সম্পর্কে মন্তব্য, মঞ্চ ভেঙে যাওয়া প্রভৃতিকে সুলতান গিয়াস উদ্দিন তুঘলকের মৃত্যুর জন্য স্বর্গীয় শাস্তি বলে কেউ কেউ মনে করেন এবং এর পশ্চাতে শেখ নিজাম (র.)কে সুলতান গিয়াস উদ্দিন তুঘলক কর্তৃক মানসিক কষ্ট দেয়াকে কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। অন্যদিকে যারা শেখ নিজাম (র.)'র চরিত্র ও স্বভাব-প্রকৃতি সম্পর্কে অবগত নন, তারা সুলতানের মৃত্যুর পশ্চাতে কিছু ষড়যন্ত্র আছে বলে মনে করে থাকেন। বিশ্লেষকদের মতে উপরোক্ত দু'টো অভিমতের কোনটিই গ্রাহ্য নয়। শেখ নিজাম (র.) কখনও সুলতানকে অভিশাপ দেননি। ওই সময়ে শেখ নিজাম (র.) শেখ নিজাম (র.) এত অসুস্থ ছিলেন যে, তিনি লোকজনের সাথে খুব বেশি কথা-বার্তাও বলতেন না। সুলতানের মৃত্যুর জন্য দুর্ঘটনাজনিত কারণে মঞ্চ ভেঙে যাওয়া দায়ী এবং এর পশ্চাতে কোন মানুষের অসৎ উদ্দেশ্যের প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

মুহাম্মদ বিন তুঘলকের শাসনামলে কিছু কিছু অভিযানের ক্ষেত্রে সুলতান (মুহাম্মদ বিন তুঘলক) শেখ নিজাম (র.)'র রূহানী সাহায্য ও দোয়া কামনা করেন। কিশলু খানের বিরুদ্ধে অভিযানের সময় শেখ নিজাম (র.)'র দোয়া পরামর্শ নেয়ার জন্য সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক শেখ নিজাম (র.)'র শিষ্য কুতুব দবিরকে তাঁর [শেখ নিজাম (র.)] কাছে পাঠান। এ অভিযানে সুলতান জয়লাভ করেন শেখ নিজাম (র.)'র দোয়ার ফজিলতে। সুতারাং এটা বিস্ময়কর যে, শেখ নিজাম (র.)'র কোন কোন সিনিয়র শিষ্য সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের হাতে যাতনা ভোগ করেন। কারণটা হল আদর্শগত। সুলতান ইবনে তাইমিয়ার আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে রাষ্ট্র ও ধর্মকে যমজ সন্তানের মত মনে করতেন এবং প্রত্যাশা করতেন যে, সুফিরা সুলতানের নিয়ন্ত্রণাধীনে সরকারি চাকুরী ও কাজ গ্রহণ করুক। কিন্তু চিশ্‌তীয়া সিলসিলায় সুফিরা রাজনীতি পরিহারপূর্বক সরকারি চাকুরী থেকে বিরত থাকাকে তাঁদের

নীতি হিসেবে গ্রহণ করেন। ফলে তাঁরা সুলতানের আহ্বানে সাড়া দেননি। তাই সুলতানের সাথে চিশ্‌তীয়া ত্বরিকার সুফিদের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়।

শেখ নিজাম (র.) কে যে সকল খেতাবে ভূষিত করা হয় সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সুলতানুল মশায়েখ, সুলতানুল আওলিয়া প্রভৃতি। এ সকল খেতাব মধ্যযুগে লোকজন গভীরতম শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসেবে দেখত। লোকজন মহত্ত্ব, শান-শওকত, গৌরব, সম্মান প্রভৃতি একমাত্র শাসকবর্গের একচেটিয়া অধিকার তা স্বীকার করতনা। রাজনৈতিক অঙ্গনে শাসকবর্গ যে মর্যাদার অবস্থানে ছিল, আধ্যত্মিক অঙ্গনে সুফি সাধকদের মর্যাদা কোন অংশে তার চাইতে বেশি ছাড়া কম ছিলনা। আমীর খসরু সুলতান জালাল উদ্দিন খলজিকে বলেছিলেন, “আপনাকে অমান্য করলে আমার মস্তক হারাবার আশঙ্কা আছে, কিন্তু আমি যদি আমার আধ্যাত্মিক গুরুর প্রতি অশ্রদ্ধা পোষণ করি তাহলে আমার ঈমান হারাব যা হারাবার জন্য আমি কখনও প্রস্তুত নই। আমার কাছে আমার মুর্শিদই বড়।” বেলায়তের ধারণা সুফি দরবেশদের মর্যাদাকে আরও উচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত করে এবং কুতুব, আবদাল, আওতাদ প্রভৃতি শ্রেণী বিন্যাসকে স্বীকৃতি দেয়।' যখন বাবা ফরিদ গঞ্জেশকর (র.) শেখ নিজাম (র.) কে সমগ্র হিন্দুস্তানের আধ্যাত্মিক কর্তৃত্ব দান করেন, তখন এর মাধ্যমে তিনি আধ্যাত্মিক জগতের সিলসিলায় উল্লেখিত বেলায়তের মর্যাদার স্তরের কার্যকারিতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন বলে প্রতীয়মান হয়। যখন ফিরোজ শাহ্‌ তুঘলক শেখ নাছির উদ্দিন চেরাগ এর সাথে দেখা করতে আসেন, তখন তিনি (নাছির উদ্দিন চেরাগ) তাঁকে (ফিরোজ শাহ্‌ তুঘলক) কিছুক্ষণ বাইরে অপেক্ষা করতে বলেন। ফিরোজ শাহ্‌ এর সাথে তাতার খানও ছিলেন। ফিরোজ শাহ্‌ তাতার খানকে বললেন, “আমরা রাজা নই। প্রকৃত রাজা হচ্ছেন তিনি (নাছির উদ্দিন চেরাগ)।” সুফি সাধকদের মর্যাদা নিয়ে সুলতানদের অসন্তোষ সুস্পষ্ট ছিল। আমীর খসরু তাঁর গুরু শেখ নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.)'র শানে নিম্নোক্ত পংক্তি রচনা করে তাঁকে সকল ক্ষণস্থায়ী জাগতিক শাসকবর্গের ঊর্ধ্বে উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত করেন:

“শেখ নিজাম (র.) হলেন সিংহাসন ও মুকুট বিহীন সম্রাট,
জগতের শাসকবর্গ তাঁর পদধূলা নেবার আশায় রয়েছেন দণ্ডায়মান।”

আমীর খসরু তাঁর এ পংক্তিদ্বয় আলাউদ্দিন খলজির মত সুলতানের সামনে ঘোষণা করেছিলেন, যিনি শেখ নিজাম (র.)'র আধ্যাত্মিক ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতনও ছিলেন, ঈর্ষান্বিতও ছিলেন।

একাদশ অধ্যায়

অমুসলিমদের সাথে শেখ নিজাম (র.)'র সম্পর্ক

অমুসলিমদের সাথে শেখ নিজাম (র.)'র সম্পর্ক দু'টো নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল:
(১) সকল মানুষ একই আল্লাহ্র সৃষ্টি। সুতরাং মানুষের সাথে ব্যবহারের ক্ষেত্রে আল্লাহ্র রাস্তা অবলম্বন করতে হবে। (২) চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, রোদ, বৃষ্টি প্রভৃতি উপকার/ অবদান প্রত্যেক মানুষ সমভাবেই পায়। কোন বৈষম্য হয়না। অতএব, জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে কোন মানুষের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ করা যাবে না। নিম্নোক্ত দু'টো ঘটনা থেকে শেখ নিজাম (র.)'র এ নীতির বাস্তবতা লক্ষ্যণীয়: (১) একদিন সকাল বেলায় শেখ নিজাম (র.) তাঁর জামাত খানার ছাদ থেকে দেখতে পেলেন যে, হিন্দুরা যমুনা নদীর তীরে মূর্তি পূজা করছে। তখন তিনি মন্তব্য করলেন: "প্রত্যেক লোকের একটা ধর্ম এবং একটা উপাসনালয় আছে।" সহিষ্ণুতার আদর্শে অনুপ্রাণিত এ মন্তব্য মধ্যযুগীয় ভারতীয় সংস্কৃতির প্রকৃতভাবের প্রতিফলন ঘটায়। বিভিন্ন ধর্মের সহঅবস্থান এবং বহুমুখী জীবনধারার সুস্পষ্টরূপ এ মন্তব্যের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। এ মন্তব্যের দ্বারা এটা প্রতীয়মান হয় যে, বিভিন্ন ধর্ম হচ্ছে একই লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিভিন্ন পথসমূহ।

(২) 'আল্লাহ্ তায়ালা বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বৈষম্য করেন না' এর সমর্থনে শেখ নিজাম (র.) হযরত ইব্রাহিম (আ.)'র নিম্নোক্ত ঘটনাটির উল্লেখ করেন: তিনি বলেন, হযরত ইব্রাহিম (আ.) কখনও মেহমানের সাথে ভাগ না করে খাবার খেতেন না। অর্থাৎ তিনি মেহমান ছাড়া খাবার খেতেন না। তিনি মেহমানের খোঁজে মাইলের পর মাইল হাঁটতেন। একদিন তিনি বহুধর্মে বিশ্বাসী একজন লোকের সাক্ষাৎ পেলেন। তিনি লোকটাকে মেহমান হিসেবে দাওয়াত দিতে এবং তার সাথে খাবার ভাগ করে খেতে ইতস্তত করছিলেন। তখন আল্লাহ্র তরফ থেকে ওহী নাযিল হল, "ওহে ইব্রাহিম! আমি লোকটাকে জীবন দিতে পারি আর তুমি লোকটাকে খাবার দিতে পারনা?" শেখ নিজাম (র.) মানুষকে পরমত সহিষ্ণুতা, ধৈর্য ও ভালবাসা, মানবতা শিক্ষা দেবার জন্য বিভিন্ন দৃষ্টান্ত বর্ণনা করতেন। নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা হল:

(১) হাসান সিজ্জী সেনাবাহিনীতে চাকুরী করতেন। কিছু সময় ধরে তিনি বেতন পাচ্ছিলেন না। এজন্য তিনি খুব চিন্তিত ছিলেন। শেখ নিজাম (র.) তাকে শান্তনা দিতে একজন ব্রাহ্মণের ঘটনার অবতারণা করলেন। কোন এক শহরে এক ব্রাহ্মণ থাকত। তার অনেক সম্পদ ছিল। সরকার তার সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করল। ফলে সে কপর্দকহীন হয়ে গেল।

একদিন সে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। তার এক বন্ধুর সাথে পথিমধ্যে দেখা হল। বন্ধু জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কেমন আছ?" লোকটি উত্তর দিল, "খুব ভাল আছি।" বন্ধু বলল, "তোমার সকল সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তারপরও তুমি সুখে আছ? তোমার সুখের উৎস কি?" লোকটি বলল, "আমার কাছে এখনও পবিত্র পৈতাটি আছে।"

(২) মরুভূমির এক আরবি লোক প্রার্থনা করছিল "আমার প্রতি এবং মুহাম্মদ (দ.)'র প্রতি দয়া কর। অন্য কাউকে তোমার দয়ায় অন্তর্ভুক্ত করনা।" মহানবী (দ.) তা জানতে পেরে লোকটিকে বললেন, আল্লাহ্‌র দয়াকে সীমাবদ্ধ করনা। আল্লাহ্‌র দয়া সকলের জন্য।"

(৩) গুজরাটে এক দরবেশ একজন সেমা পাগল মজ্‌জুব ফকিরের দেখা পেলেন। তিনি তাঁর সাথে অবস্থান করলেন। এক রাত্রে দরবেশটি অজু করার জন্য পানির কূপ থেকে পানি আনতে গেলেন। কূপের মালিক যে কোন লোককে পানি তোলার জন্য অনুমতি দেননা। যেহেতু দরবেশকে তিনি আগে থেকে চিনতেন, সেজন্য দরবেশকে অনুমতি দিলেন। বহু মহিলা কলসী নিয়ে কূপের ধারে দাঁড়িয়েছিল। একজন বৃদ্ধা মহিলা তার কলসীটি পানি ভর্তি করে দেবার জন্য দরবেশকে বলল; দরবেশ তা করলেন। অতঃপর একের পর এক বহু মহিলা তাদের কলসী দরবেশকে দিল এবং দরবেশ সেগুলো পানি ভর্তি করে দিলেন। দরবেশ যখন তাঁর কামরায় ফিরে আসলেন সেমা পাগল লোকটি তখনও ঘুমুচ্ছে। দরবেশ যখন নামায পড়তে শুরু করলেন, তখন সেমা পাগল লোকটি ঘুম থেকে জেগে উঠল এবং চীৎকার দিয়ে বলল, "আধ্যাত্মিক ফয়েজ লাভ করার জন্য মহিলাদের কলসীগুলো পানিভর্তি করে দেয়াটাই ছিল আসল কাজ।"

(৪) খাজা হামিদ উদ্দিন নাগোরী একজন হিন্দুকেও অলি বলেছিলেন। কারণ হিন্দু লোকটি বিশ্বাস করত যে মানুষের শেষ পরিণতি কী হবে সেটা একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালাই জানেন। সুতরাং কারো সম্বন্ধে চূড়ান্ত বিচারের মালিক একমাত্র আল্লাহ্।

এ সকল দৃষ্টান্ত শেখ নিজাম (র.) তাঁর শিষ্যদের বিভিন্ন সমাবেশে তুলে ধরতেন এবং এ দৃষ্টান্তসমূহ থেকে অন্যধর্ম ও ধর্মাবলম্বীর প্রতি তাঁর উদার মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, শেখ নিজাম (র.)'র দরবারে হিন্দু যোগী, সাধু সন্ন্যাসীরা দোয়া বা আশীর্বাদ নিতে আসতেন এবং তিনি তাদেরকে সমাদর করতেন।

দ্বাদশ অধ্যায়

মানুষ হিসেবে শেখ নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.)

শেখ নিজাম (র.)'র সারা জীবন ছিল গভীর মানবতা ও নৈতিক আদর্শসমৃদ্ধ চিন্তা-চেতনায় ভরপুর। আমীর খসরু তাঁকে শরফ-ই আদম (মানুষের গৌরব) নামে অভিহিত করেছেন। Shakespeare এর ভাষায় আমরা তাঁর সম্পর্কে নিম্নোক্ত উক্তি করতে পারি:

"যাঁর জীবন ছিল প্রশান্তি ও বিনয়ের আধার,
সকল গুণাবলীর সে এক অপূর্ব সমাহার।
প্রকৃতি দাঁড়িয়ে বলে আলোর ফানুস,
ওহে বিশ্ব দেখ! ইনিইতো সেই মানুষ।"

নির্যাতিত, নিপীড়িত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, ভাগ্যাহত, দরিদ্র ও নিঃস্ব মানুষের জন্য তাঁর হৃদয় ছিল চির উদার ও সহানুভূতিশীল। তিনি মানুষের দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে পারতেন না। তিনি মানুষের কষ্টকে নিজের কষ্ট মনে করতেন এবং মানুষের কষ্ট লাঘবের জন্য, মানুষের সেবা করার জন্য খোদায়ী করুণা কামনা করতেন। শেখ নিজাম (র.) প্রায়শ বলতেন, "শেখ জোনায়েদ (র.) মদীনার অলি-গলিতে খোদাকে পেয়েছেন। লোকজন যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করতেন, "কীভাবে?" তিনি বলতেন, "কারণ দুঃখী এবং নিঃস্ব মানুষের মাঝেই খোদাকে পাওয়া যায়।" অর্থাৎ দুঃখী মানুষের সেবা করলে খোদার নৈকট্য লাভ করা যায়।

একদা শেখ নিজাম (র.)'র সাথে খাজা আজিজ উদ্দিন নৈশ ভোজে যোগদান করেছিলেন। ভোজ শেষে খাজা আজিজ উদ্দিন কথা প্রসঙ্গে বললেন, "দিল্লীর লোকজন মনে করে, আপনি সবচেয়ে সুখী। আপনার কোন দুঃখ নেই।" উত্তরে শেখ নিজাম (র.) বললেন, "এ পৃথিবীতে আমার মত দুঃখ-কষ্ট আর কারও নেই। হাজার হাজার মানুষ আমার কাছে আসে এবং তাদের দুঃখ-কষ্টের কথা জানায়। তাদের কষ্টে আমর বুক ফেটে যায়, আত্মা অসহনীয় কষ্ট পায়। আমি সর্বদা দুঃখ-ভারাক্রান্ত থাকি।" শেখ ফরিদ উদ্দিন নাগোরীর মতে, "সমগ্র দিল্লী শহরে শেখ নিজাম (র.)'র মত মানব দরদী তখন কেউ ছিলনা।" শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জেশকর (র.) প্রায়শ আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করতেন, "হে খোদা! আমাকে মানব-দরদী বানিয়ে দাও।"

শেখ নিজাম (র.)'র ব্যক্তিত্বঃ শেখ নিজাম (র.)'র ব্যক্তিত্ব ছিল অতীব আকর্ষণীয়। তাঁর অবয়ব ছিল লম্বা, আকৃতি ছিল সুদর্শন, রং ছিল ফর্সা, দাড়ি ছিল সুদীর্ঘ, চোখ ছিল লাল নিদ্রাভরা ঢুলু ঢুলু এবং মাথার উপরে ছিল বিরাট পাগড়ী। সব মিলিয়ে এক আধ্যাত্মিক পবিত্রতার আভা প্রতিভাত হোত তাঁর সারা মুখমণ্ডলে। তাঁর সম্মান এবং মর্যাদা ছিল পরিমাপের ঊর্ধ্বে। তাঁর শিষ্য আমির খসরু শেখ নিজাম (র.)'র পাশে বেশিক্ষণ স্বাভাবিকভাবে বসে থাকতে পারতেন না। তাঁর স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পাবার জন্য আমির খসরু প্রায়শ বাহির থেকে ঘুরে আসতেন। আমির খসরু মাওলানা বোরহান উদ্দিন চেরাগকে বলেছেন, "শেখ নিজাম (র.)'র সামনে আসলে আমার হৃদয়ে কম্পন শুরু হয়। আমির খসরু কবিতার ছন্দে এর কারণটি নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করেনঃ

"সূর্যের সামনে যদি রাখা হয় আয়না,
সে আয়নাতে নিজের চেহারা দেখা যায়না।"

বলাবাহুল্য, শেখ নিজাম (র.)'র সামনে কথা বলতে অনেক সিনিয়র শিষ্যরাও সাহস পেতনা। মাওলানা হুসাম উদ্দিন মুলতানীসহ প্রত্যেক ভক্ত তাঁর সামনে মাটির দিকে চোখ নিবদ্ধ করে দাঁড়িয়ে কিংবা বসে থাকতেন। কিন্তু শেখ নিজাম (র.)'র প্রতি ভক্তদের ভালবাসা ও অনুরাগ সব অনুভূতিকে প্লাবিত করে দিত প্রতিনিয়ত। তাঁর শিষ্য মাওলানা নিজাম শেখ নিজাম (র.)কে একদা দেখতে আসলেন। জনগণ এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দিলেন, "আমি যখন বাড়ীর পথে রাওয়ানা হলাম তখন শেখ নিজাম (র.)'র অবয়ব আমার চোখে ভাসতে লাগল। তাই তাঁকে সম্মান ও শ্রদ্ধা জানানোর জন্য ফিরে এলাম। এটা আমার অবশ্য করণীয়।" খাজা তাজ উদ্দিন যখন শেখ নিজাম (র.)'র নাম শুনতেন, তখন তাঁর চোখ থেকে অশ্রু বিগলিত হোত ভালবাসা ও ভক্তির ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে। হাসান সিজ্‌জীর ভাইপো খাজা সামছুদ্দীন নামাযে দাঁড়াবার প্রারম্ভে শেখ নিজাম (র)'র চেহারা দেখতে পেতেন। প্রকৃত পক্ষে শেখ নিজাম (র.) শুধু তাঁর ভক্তদের কাছে নয়, দিল্লীর জনসাধারণের কাছেও ছিলেন অত্যন্ত ভালবাসার পাত্র। তাঁরা সকলে শেখ নিজাম (র.)কে বিপদ ও দুর্যোগে তাঁদের আশ্রয়স্থল মনে করত।

শেখ নিজাম (র.)'র বাসগৃহঃ শেখ নিজাম (র.) তাঁর জামাত খানার ছাদে ছোট্ট একটি কক্ষে বাস করতেন। একটা বিপদজনক কাঠের সিঁড়ি দিয়ে তিনি তার কক্ষে উঠতেন এবং কক্ষ থেকে নামতেন। তাঁর কক্ষের মেঝেতে মাদুর বিছানো ছিল। শেখ নিজাম (র.) এবং তাঁর শিষ্যরা মাদুরের ওপর বসতেন। তাঁর খাটটি এমনভাবে রাখা হয়েছিল যাতে শেখ নিজাম (র.)'র চেহারা সর্বদা কাবা শরিফের দিকে থাকে। গ্রীষ্মকালীন রাতে এবং বর্ষাকালে খাটটি খোলা ছাদের ওপরে রাখা হোত এবং খাটের ওপরে একটি মশারী টাঙ্গানো থাকত।

শেখ নিজাম (র.)'র পোশাকঃ শেখ নিজাম (র.) মোটা হাতা বিশিষ্ট লম্বা কোর্তা পরিধান করতেন। তিনি নৈশকালীন পোশাকও পরতেন। তাঁর পাগড়ীটি ছিল সাতগজ কাপড় দিয়ে

মোড়ানো। তাঁর গুরু শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জেশকর (র.) যে পোশাক পরতেন, তিনিও হুবহু সে ধরনের পোশাক পরতেন।

শেখ নিজাম (র.)'র খাবারঃ শেখ নিজাম (র.) খুবই স্বল্প আহার করতেন। ইফতারের সময় সবজি বা করলা দিয়ে সামান্য ভাত বা রুটি খেতেন। ইফতার করে যখন তিনি দোতলায় তাঁর কক্ষে যেতেন তখন গোলাপ জলে রাখা ডালিমের কয়েকটি দানা খেতেন এবং বাকীগুলো উপস্থিত লোকদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন। দর্শনার্থী ও মেহমানদেরকে বিভিন্ন প্রকার ফল ও শরবত দ্বারা আপ্যায়ন করতেন। সেহরীর সময় ২ থেকে ৩ গ্রাস ভাত খেতেন। ক্ষুধার্ত ও দরিদ্রদের কথা মনে উঠলে তিনি এক গ্রাস ভাত খেয়ে উঠে যেতেন। মাংস বা তেহ্‌রী কদাচিৎ সামান্য পরিমাণে খেতেন। বেশির ভাগ সময় মাংস খেতেন না। অন্যদেরকে খেতে দেখলে আনন্দ পেতেন। শেখ নিজাম (র.) কোন কোন সময় পান খেতে ভালবাসতেন।

শিশুদের প্রতি শেখ নিজাম (র.)'র ভালাবাসাঃ শেখ নিজাম (র.) ছোট ছোট ছেলে মেয়েদেরকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। ইফতার ও সেহ্‌রীর জন্য আনীত উদ্বৃত্ত ফল-মূলাদি শিশুদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন। নবজাতক শিশুদেরকে কোলে নিয়ে তিনি আশীর্বাদ করতেন, তাঁর থুথু মোবারক শিশুদের মুখে পুরে দিতেন এবং তাদের নাম রাখতেন। তিনি তাদের 'বিছমিল্লাহ্‌ উৎসব' সম্পাদন করতেন।

নারীদের প্রতি শেখ নিজাম (র.)'র শ্রদ্ধাঃ শেখ নিজাম (র.) বিবাহিত ছিলেন না, কিন্তু তাই বলে নারীদের প্রতি বিতশ্রদ্ধ ছিলেন না। তিনি নারীদেরকে সম্মান করতেন এবং তাদেরকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। তিনি নারীদের ধর্মীয় অনুরাগের প্রশংসা করতেন এবং তাদের জন্য দোয়া করতেন। তিনি বলতেন, "পুরুষ-স্ত্রী বড় কথা নয়। ধার্মিকতাই হচ্ছে আসল গুণ। বাঘ যখন গুহা থেকে বের হয়, তখন কেউ বাঘটি পুরুষ না স্ত্রী বাঘ সে নিয়ে মাথা ঘামায় না।" শিশুদের চরিত্র গঠনের জন্য তিনি নারীর ভূমিকার ওপর গুরুত্ব আরোপ করতেন। শেখ নিজাম (র.) তাঁর মাতাকে তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের আলোকবর্তিকা মনে করতেন।

রুগ্ন ও অসুস্থ ব্যক্তির জন্য শেখ নিজাম (র.)'র অনুকম্পাঃ শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও অসুস্থ বন্ধু-বান্ধব ও শিষ্যদের শারীরিক অবস্থার তিনি প্রতিনিয়ত খবরাখবর নিতেন। আলী জান্দার থেকে কাজী মুহিউদ্দিন কাসানীর অসুস্থতার খবর শুনে শেখ নিজাম (র.) তাঁর বাড়িতে গেলেন এবং তাঁর খোঁজ খবর নিলেন। জনাব কাসানী মারা যাবার পর শেখ নিজাম (র.) আলী জান্দারকে বললেন, "তুমি যদি আমাকে কাসানীর অসুস্থতার খবর না জানাতে এবং আমি যদি কাশানীকে দেখতে না যেতান, তাহলে রোজ কেয়ামত পর্যন্ত আমি মনে শান্তি পেতাম না।"

মাওলানা জিয়াউদ্দিন সুন্নামী শেখ নিজাম (র.)'র সেমা মাহফিলের সমালোচনা করতেন। সুন্নামী অসুস্থ হয়ে পড়লে শেখ নিজাম (র.) তাঁর অসুস্থতার খবর শুনে তাঁকে দেখতে

গেলেন। মাওলানা সুন্নামী তাঁর আগমনের খবর শুনে শেখ নিজাম (র.)'র আসার পথে দরজার সামনে তাঁর খাদেমদেরকে তাঁর মাথার পাগড়ী বিছিয়ে দিতে বললেন। শেখ নিজাম (র.) নিজহাতে পাগড়ীটি তুলে নিলেন এবং নিজের মাথায় দিলেন। কিছুদিন পর মাওলানা সুন্নামী মারা গেলেন। শেখ নিজাম (র.) তাঁর মৃত্যুর খবর শুনে বললেন, "আহ্! এ মানুষটি শরীয়তকে অগ্রাধিকার দিতেন। আজ তিনিও চলে গেলেন।"

যারা শেখ নিজাম (র.)'র ঘোর শত্রু ছিলেন এবং তাঁর সমালোচনায় মুখর ছিলেন, তাদের কবরেও তিনি জিয়ারত করতে যেতেন। ছাজ্জু (Chajju) নামক এক ব্যক্তি সর্বদা শেখ নিজাম (র.)'র নিন্দা করতেন এবং তাঁর অশুভ কামনা করতেন। কিন্তু যখন ছাজ্জু মারা গেলেন, শেখ নিজাম (র.) তাঁর কবর জেয়ারত করলেন।

সামাজিক সম্পর্ক জনিত সমস্যার প্রতি শেখ নিজাম (র.)'র দৃষ্টিভঙ্গী: সমাজের অস্থিরতা দূর করার জন্য শেখ নিজাম (র.)'র মতে আত্ম-শৃঙ্খলা এবং আত্মসমালোচনাই হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। অন্যরা যখন তাঁকে দোষারোপ করত, তখন তিনি নিজের মধ্যে দোষ খুঁজতেন। যখন কেউ তাঁর দোষ খুঁজত, তখন তিনি নিজেকে সংশোধন করার জন্য এটা একটা স্বর্গীয় সুযোগ বলে মনে করতেন। তাঁর পদ্ধতিটি তিনি নিম্নোক্তভাবে ব্যাখ্যা করতেন।

"কোন ব্যক্তি যখন আমার মধ্যে দোষ খুঁজে কিংবা আমাকে দোষারোপ করে, তখন আমাকে আমার অন্তরে দোষ খুঁজতে হবে এবং দেখতে হবে আমার অন্তরে দোষ বিদ্যমান আছে কিনা। যদি আমি দোষী হই, তাহলে আমি লজ্জিত না হয়ে সংশোধিত হবার চেষ্টা করি। যদি আমার মধ্যে দোষ খুঁজে না পাই, তাহলে আমি খোদার কাছে শুকরিয়া জানাই। কারণ আল্লাহ্ আমাকে পাপ থেকে রক্ষা করেছেন। অন্যদের দোষ ধরা আমার উচিৎ নয়।" বলাবাহুল্য, এ পদ্ধতিটির সাথে মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার কাল মৃত্যু (মউতে আছওয়াদ)'র পরিপূর্ণ মিল রয়েছে।

শেখ নিজাম (র.)'র জীবনে প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধ গ্রহণের কোন স্থান ছিলনা। তিনি অন্যায়কারীকে সর্বদা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখতেন। তিনি পাপকে ঘৃণা করতেন, পাপীকে নয়। তিনি খাজা কুতুব উদ্দিন বখতিয়ার কাকী (র.) ও কাজী হামিদ উদ্দিন নাগোরী (র.)'র দৃষ্টান্ত তুলে ধরে বলতেন, "পাপীকে যদি অবহেলা করি, তাহলে কে তাদের দেখাশুনা করবে? তিনি বলতেন, হযরত আলী (রা.)'র আদর্শ ছিল অন্যের দোষ গোপন করা। যদি কেউ তাঁকে তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বলতেন, তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিতে বলতেন।"

শেখ নিজাম (র.)'র আচরণের মডেল: শেখ নিজাম (র.)'র আচরণের মডেল হলেন মহানবী (দ.)। শেখ নিজাম (র.) জীবনে কোনদিন মহানবী (দ.)'র সুন্নাহ্‌কে অবহেলা করেন নি। শেখ নিজাম (র.)'র মহানবী (দ.) এর হাদীস সম্পর্কে গভীর পড়াশুনা ছিল। তিনি জীবনে কোনদিন সুন্নাহ্ থেকে বিচ্যুত হন নি। তাঁর শিষ্যদের প্রতিও মহানবী (দ.)'র সুন্নাহকে

অনুসরণ করার জন্য তাঁর কঠোর নির্দেশ ছিল। যখন শেখ নিজাম (র.)'র মাতা তাঁর জামাতার ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে তাঁর মেয়ের বিবাহ-বিচ্ছেদ কামনা করছিলেন, তখন মহানবী (দ.)'র একটি হাদীস উল্লেখ করে শেখ নিজাম (র.) তার বিরোধিতা করেছিলেন। তাঁর সম্পর্কে আমির খসরু বলেন,

"পবিত্রতার পথে থাকে যে জন, রসূলের পথে চলে সেই মহাজন।"

পণ্ডিত (Scholar) হিসেবে শেখ নিজাম (র.): শেখ নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.) ছিলেন ধর্মতত্ত্ব ও সুফিবাদের ওপর একজন বিদগ্ধ পণ্ডিত, উচ্চ শিক্ষিত, অসংখ্য বই-পুস্তক পড়ুয়া, তীক্ষ্ণধী সম্পন্ন উচ্চ মার্গের জ্ঞানী ব্যক্তি। দিল্লীর শিক্ষিত সমাজে তাঁর উচ্চ মর্যাদা ছিল সর্বজন স্বীকৃত। সে সময়ে পূর্বাঞ্চলের ইসলামী জগতে দিল্লী ছিল জ্ঞান চর্চার প্রধান কেন্দ্র। বারনী (Barani) বলেন, "There were scholars in Delhi, each a master in his subject, the like of whom could not be found in Bukhara, Samarqand, Baghdad, Egypt, Khwarizm, Damascus, Tabriz, Ispahan, Rum (Constantinople), or anywhere in the inhabited globe." অর্থাৎ: দিল্লীতে পণ্ডিতবর্গরা ছিলেন যাঁর যাঁর নিজ নিজ বিষয়ে গভীর বুৎপত্তিসম্পন্ন এবং তাঁদের সমকক্ষ পণ্ডিতবর্গ তখন বোখারা, সমরকন্দ, বাগদাদ, মিশর, খাওয়ারিজম, দামেস্ক, তাবরিজ, ইস্পাহান, রুম (কনস্টানটিনোপল) কিংবা মানব অধ্যুষিত বিশ্বের অন্য কোথাও তখন পাওয়া যেতনা। এ সকল পণ্ডিতদের কেই কেউ ইমাম গাজ্জালী এবং রাজিবর সমকক্ষ ছিলেন বলে অভিমত প্রকাশ করা হয়। (তারিখ-ই ফিরোজ শাহী, পৃঃ ৩৫২-৩)। বলাবাহুল্য, এ সকল পণ্ডিতদের শীর্ষ স্থানে ছিলেন খাজা নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.)। বারনীর মতে সে সময়ে দিল্লীতে ৪৬ জন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন যাদেরকে দিল্লীর বুদ্ধিজীবী স্তম্ভ (intellectual pillars) বলা হয়। এ সকল পণ্ডিতদের মধ্যে কাজী মুহিউদ্দিন কাসানী, মাওলানা ওয়াজি উদ্দিন সামছ উদ্দিন ইয়াহিয়া, মাওলানা ফখরুদ্দীন জার্‌রাদী, মাওলানা সমরকন্দী ছিলেন শেখ নিজাম (র.)'র শিষ্য। শেখ নিজাম (র.) অত্যন্ত নাম করা তার্কিক (debator) ছিলেন। এজন্য তাঁকে 'মাহফিল সিকান' (breaker of assemblies) এবং 'বাহাজ' কারী (debator) বলা হতো। কিন্তু শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জেশকর (র.)'র শিষ্যত্ব বরণ করার পর শেখ নিজাম (র.) বিতর্ক থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করেন। যে কোন বিষয় নিয়ে তিনি যখন আলাপ করতেন, তখন দর্শক-শ্রোতা তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনায় মুগ্ধ হয়ে যেতেন। শেখ নিজাম (র.) খলীফা ওমর বিন আবদুল আজিজ (রা.)'র একটি বাণী উদ্ধৃত করে বলতেন, "মানুষ যখন জ্ঞান অর্জন করে, তখন সে জনগণের চোখে শ্রদ্ধার পাত্র হয়। আর যখন সে তার জ্ঞান বাস্তবে প্রয়োগ করে, তখন সে আল্লাহ্‌র কাছে প্রিয় হয়।" তিনি বলতেন, "জ্ঞান অর্জনে একজন জ্ঞানী যে আনন্দ পায় সেটা একজন রাজার রাজ্য জয়ের চাইতে অনেক বেশি। একজন জ্ঞানীর অন্তরে যদি স্রষ্টার অনুরাগ না থাকে, তবে সে জ্ঞানের কোন মূল্য নেই। আল্লাহ্ মহৎ কাজকে পছন্দ করেন এবং সংকীর্ণতাকে অপছন্দ করেন। একজন জ্ঞানীর হেকমত বা কৌশল সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের জন্য উচ্চ আকাঙ্ক্ষা থাকা উচিৎ।"

শেখ নিজাম (র.) কেবলমাত্র উপদেশ দিয়ে ক্ষান্ত হতেন না, তিনি নিজের জীবনে তা চর্চা করতেন। তিনি বই পড়াকে খুবই ভালবাসতেন। তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এ অভ্যাস বজায় রেখেছিলেন। তিনি রাত জেগে বই পড়তেন, নোট লিখতেন এবং বই সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য লিখতেন। তিনি তাঁর গ্রন্থাগারটি ছাত্রদের জন্য ওয়াক্ফ করে গেছেন। এ গ্রন্থাগার থেকে কিছু কিছু বই আখী সিরাজ লক্ষ্ণৌতে নিয়ে যান। তিনি কুরআনী শিক্ষাকে উৎসাহ দিতেন। তিনি কুরআন মুখস্থ করার ওপর বিশেষ জোর দিতেন। বাবা ফরিদ (র.) শেখ নিজাম (র.)কে কুরআন শরিফ মুখস্থ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং তিনি তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। শেখ নিজাম (র.)'র মতে, "জিকিরের চাইতে কুরআন তেলাওয়াত কলব জারির জন্য খুবই কার্যকরী। অবশ্য জিকিরের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক উন্নতি তাড়াতাড়ি হয়, কিন্তু এ উন্নতি হারাবার ঝুঁকি থাকে। কিন্তু কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে যে উন্নতি হয় তা হারাবার ঝুঁকি নেই। শেখ নিজাম (র.)'র মতে, কুরআন তেলাওয়াতের দ্বারা চার প্রকারের ফজীলত অর্জিত হয়। এগুলো হলো: (১) সাধারণ জনগণের জন্য এবাদতের ফজীলত, (২) বিশেষ শ্রেণীর ঈমানদারের জন্য ইশারাত (ইঙ্গিত বা সংকেত) অর্জনের ফজীলত, (৩) আওলিয়াদের জন্য আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ও স্বর্গীয় করুণা লাভের ফজীলত এবং (৪) নবীদের জন্য হাকায়েক (সত্য স্তর বা true maxims) অর্জনের ফজিলত। তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে এমনভাবে কুরআন তিলাওয়াত করতে বলতেন যাতে খোদা তাদের অন্তরকে আলোকিত করেন। হাদীস শাস্ত্রের প্রতি শেখ নিজাম (র.)'র বিশেষ ঝোঁক ছিল। মুহাদ্দিস হিসেবে তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। দুই হাজার হাদীস তাঁর মুখস্থ ছিল। কেউ ভুল হাদীস বললে তিনি তা বর্জন না করে বলতেন, এটা প্রধান হাদীস গ্রন্থে পাওয়া যায়না।" শেখ নিজাম (র.) ইজতিহাদ (Fresh interpretation of law) পছন্দ করতেন এবং কোন জুরীর মতামতকে সর্বশেষ ব্যাখ্যা হিসেবে আঁকড়ে ধরে থাকতেন না। তিনি মহানবী (দ.)'র সুন্নাহ্‌র আলোকে সেমা মাহফিলের পক্ষে যুক্তি দিতেন। অন্যদিকে দিল্লীর আলেমগণ ইমাম আবু হানিফার রায়কে প্রাধান্য দিতেন এবং মহানবী (দ.)'র সুন্নাহ্‌র যুক্তি মানতেন না। ওলামারা চীৎকার দিয়ে বলতেন, "ওহে শেখ নিজাম (র.)! আপনি মুজতাহিদ নন, আপনি হচ্ছেন মুকাল্লিদ (জুরী কর্তৃক প্রদত্ত আইনের অনুসারী)। আপনি আবু হানিফার মতামত উপস্থাপন করুন।" শেখ নিজাম (র.) বিজ্ঞ ওলামাদের এরূপ অনমনীয় মনোভাবে দুঃখিত হতেন এবং আশঙ্কা করতেন যে, মহানবী (দ.)'র সুন্নাহ্‌কে উপেক্ষা করার কারণে দিল্লীর ওলামাদের ওপর খোদার গজব নেমে আসতে পারে। উল্লেখ্য, ওলামাদেরকে মুহাম্মদ বিন তুঘলক দিল্লী থেকে দৌলতাবাদে স্থানান্তরিত হতে বাধ্য করেন। ওলামাদের এ স্থানান্তরকে মীর খুরদ শেখ নিজাম (র.) কর্তৃক আশঙ্কাকৃত খোদায়ী শাস্তি বা গজব হিসেবে অভিহিত করেছেন।

ধর্মীয় বিজ্ঞানে গভীর জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টির জন্য শেখ নিজাম (র.)কে ইসলামী আইন ব্যাখ্যা করা এবং জুরীর কাজ (মুজতাহিদ) সম্পাদনের জন্য উপযুক্ত বিবেচনা করা হোত। শেখ নিজাম (র.) সেমা মাহফিল সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফার মতামত গ্রহণ না করলেও তাঁকে

গভীর শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। তিনি বলতেন, "ইমাম আযম আবু হানিফা সাতজন সাহাবীর সাথে দেখা করেছিলেন যা ঐসময়কার প্রজন্মের জন্য অসীম ভাগ্যের ব্যাপার। কুরআন ও হাদীস গ্রন্থ ছাড়াও বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে শেখ নিজাম (র.) প্রচুর পড়াশুনা করতেন। তাঁর পঠিত পুস্তকসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল– ১. ইমাম গাজ্জালীর এহ্ইয়াউ উলুমুদ্দিন, ২. ইজাজ উল বায়ান, ৩. আখার উল নায়ারাইন, ৪. আদাব-উল মুহাক্কিকিন, ৫. মা'য়ালিম-ই লুবাব, ৬. রাজী প্রণীত আরবাঈন, ৭. গাজ্জালী প্রণীত আরবাঈন, ৮. খাজা সানাই প্রণীত ফখরী নামা, ৯. তফছির-ই ইমাম নাছিরী, ১০ রহুল আরওয়া, ১১. শাফিয়ী, ১২. উমদা, ১৩. সোহরাওয়ার্দী রচিত আওয়ারিফ উল মা'য়ারিফ, ১৪. আবু তালিব মক্কী প্রণীত কুত্ উল কুলুব, ১৫. কাফি, ১৬. জামাখশারী প্রণীত কাশ্শাফ, ১৭. কাজী হামিদ উদ্দিন প্রণীত লাওয়ায়িব ও লাওয়ামা, ১৮. কশ্ফ উল মাহজুব, ১৯. মীর সাদ উল ইবাদ, ২০. মাশারিখ উল আনওয়ার, ২১. মকতুবাত-ই আইনুল ফুজ্জাত হামাদানী, ২২. মুলাক্কাছ, ২৩. তফছির ই মালিকী, ২৪. বায়দাবী, ২৫. মাজমা উল বাহরাইন, ২৬. গাজ্জালী প্রণীত জাওয়াহির উল কুরআন, ২৭. মারগিনানী রচিত হিদায়া, ২৮. গাজ্জালী রচিত কিমিয়ায়ে সা'আদাত, ২৯. রিসালাহ-ই কুশাইরিয়া, ৩০. তফসির-ই হাকীক, ৩১. আবু শাকুর সালমী রচিত তামহিদাদ, ৩২. হিজর-ই ইয়ামানী, ৩৩. হিজর ই কাফী, ৩৪. হাকিম তিরমিজী প্রণীত নাওয়াদিরুল উসুল, ৩৫. শরহে আতহার নাওয়ারাঈন, ৩৬. মজিদ উদ্দিন বাগদাদী রচিত তোহ্ফাত উল বির্রাত, ৩৭. জামীউল উসূল ফি আহাদীত ইর রসূল ইবন আখির প্রভৃতি। উল্লেখ্য যে, বর্ণিত পুস্তকগুলো তখনকার সময়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক হিসেবে দিল্লীর সুধী মহলে বিবেচিত হোত। শেখ নিজাম (র.) কথায় কথায় কবিতার ছন্দ উচ্চারণ করতেন যেগুলো আলোচনার সাথে খুবই প্রাসঙ্গিক ছিল। তাঁর গুরু শেখ ফরিদ (র.)'র কাছে চিঠি লেখার সময় তিনি কবিতার উদ্ধৃতি দিতেন এবং শেখ ফরিদ (র.) তা মুখস্থ করে ফেলতেন। শেখ নিজাম (র.) শেখ সাদী (র.)'র কবিতার ভক্ত ছিলেন। বিবি ফাতিমা সাম নামক এক নারী যখন সেমা মাহফিলে কবিতার ছন্দ উচ্চারণ করতেন, তখন শেখ নিজাম (র.) বিমোহিত হয়ে যেতেন। আমীর খসরু বলেন, "জ্ঞানে আলোকিত দুই জগৎ যাঁর, শেখ নিজাম (র.) ভিন্ন কেউ নয় আর।"

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সুফিসাধক হিসেবে শেখ নিজাম (র.)

ইসলামী সুফিবাদের আদর্শ ও ঐতিহ্যকে সমন্বিত করে সামনের দিকে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে শেখ নিজাম (র.) গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তিনি ত্রয়োদশ শতাব্দীর ইসলামী সুফিবাদের পুরোধা শেখ শিহাব উদ্দিন সোহরাওয়ার্দী (র.), শেখ মুহিউদ্দিন ইবনুল আরবী (র.) এবং মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমী (র.) এর আদর্শকে একীভূত করে একটি কার্যকর চালিকা শক্তিতে রূপান্তরিত করেন। বাবা ফরিদ (র.) সুফি আন্দোলনকে একটি গণ আন্দোলনে রূপান্তর করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন। শেখ নিজাম (র.) এ উদ্যোগকে পরিপূর্ণতার দিকে নিয়ে যান। সারা ভারতে তিনি চিশ্‌তীয়া ত্বরিকার চর্চার জন্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। সুফিবাদের বিকাশে শেখ নিজাম (র.)'র সাফল্যের কারণ হল– ১. জ্ঞানের কার্যকর ব্যবহার, ২. ইশ্‌ক বা স্রষ্টার প্রতি ভালোবাসা, ৩. আকল বা বুদ্ধি (বাস্তব প্রায়োগিক কৌশল)। বলাবাহুল্য, এ তিনটি গুণ হযরত শিহাব উদ্দিন সোহরাওয়ার্দী (র.), হযরত মুহিউদ্দিন ইবনুল আরবী (র.) এবং হযরত জালাল উদ্দিন রুমী (র.)'র মধ্যেও বিদ্যমান ছিল। বিশ্বের ধর্মসমূহের ধারণাগুলোর মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য মুহিউদ্দিন ইবনুল আরবী (র.) সেতু নির্মাণ করেন, মাওলানা রুমী (র.) ইশ্‌ক বা স্রষ্টার প্রতি অনুরাগকে সুফিবাদের চালিকা শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং শেখ শিহাব উদ্দিন সোহরাওয়ার্দী (র.) সুফিবাদী জীবন যাত্রার বিকাশ এবং খানকাহ্‌ প্রতিষ্ঠার জন্য নীতিমালা প্রদান করেন। এ তিন মণীষীর অবদানকে একত্রিত করে ব্যক্তি এবং সমাজের কল্যাণের জন্য একটি সমন্বিত কর্মসূচী গ্রহণ করার কাজটি করেন শেখ নিজাম (র.)। তাঁদের অবদানের ওপর ভিত্তি করে সুফিবাদের বার্তাটি জনগণের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্য সুফি কাঠামোর অধীনে আন্দোলন পরিচালনার কৌশলটি প্রয়োগ করেন শেখ নিজাম (র.)। ফলে সারা ভারতে শত শত খানকাহ্‌ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং হাজার হাজার শিষ্য চিশ্‌তিয়া ত্বরিকার বিকাশে কার্যকর ভূমিকা রাখেন। এ সময় থেকে খিলাফত নামায় সজরা (ছিলছিলার ক্রমসূত্র বা Spiritual genealogy) উল্লেখ করার রেওয়াজ চালু হয় যাতে করে ওফাতপ্রাপ্ত পূর্বসূরী অলী বুজুর্গদের জীবন চরিত ও ত্বরিকার সাথে একটি ঐতিহাসিক যোগসূত্র স্থাপন করা যায়। আমির খসরুর মতে, "শেখ নিজাম (র.) তাঁর পূর্বসূরী বুজুর্গদেরকে নিদ্রা থেকে জাগিয়ে তোলেন।" সমসাময়িক কালের সুফি সাধকগণ তাঁকে জুনায়েদ-ঈ সানি, শেয়খুল ওয়াক্‌ত, গাউসুল আজম' প্রভৃতি লকবে ভূষিত করেন এবং তাঁর আধ্যাত্মিক মর্যাদা ও অর্জনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করেন। (তথ্যসূত্রঃ মজনুন লায়লা, পৃ. ১৩, নুহ সিপিহর, পৃ. ২৫, মাকতুবাতে শেখ ফরিদ নাগোরী,

পৃ. ২৭০)। দক্ষিণ এশিয়ার ইসলামী সুফিবাদের ইতিহাসে শেখ নিজাম (র.)'র জীবন ছিল একটি জল প্রপাত (Water fall) স্বরূপ। তিনি পুরাতন সুফিবাদী ঐতিহ্যকে নুতন সামাজিক শক্তিতে রূপান্তর করেন। তিনি মানবতার উৎকর্ষ সাধনের জন্য, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য, ব্যক্তির আত্মাকে সামাজিক আন্দোলনে রূপ দেয়ার জন্য, সুফিবাদী চর্চায় শৃঙ্খলা আনয়ন করেন। আমির খসরুর মতে, "আল্লাহ্ তায়ালা শেখ নিজাম (র.)কে অন্যের বোঝা লাঘব করার জন্য পাঠিয়েছেন। খোদা সচেতন ব্যক্তিত্ব গঠন করাই ছিল শেখ নিজাম (র.)'র আদর্শের মূল লক্ষ্য।" তিনি বিশ্বাস করতেন যে, কেউ যদি তার অন্তরে খোদার প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করতে পারে, তাহলে সে আর পাপের পথে যাবেনা। তাঁর মতে, আল্লাহ্ হচ্ছেন সর্ববেষ্টনকারী।

আল্লাহ্র দানে যেমন জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে কোন বৈষম্য নেই, তদ্রূপ সুফিদের মধ্যেও জাতি, ধর্ম, বর্ণ, স্থান, কাল, পাত্র ভেদে কোন বৈষম্য থাকতে পারেনা। শেখ নিজাম (র.) সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এ নীতি মেনে চলতেন এবং সকলের প্রতি ভালবাসা ও সহানুভূতি প্রকাশের ক্ষেত্রে কোন তারতম্য করতেন না। শেখ নিজাম (র.) বিশ্বাস করতেন যে, যে মানুষের হৃদয়ে কষ্ট দেয় সে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করতে পারবেনা। আল্লাহ্কে পাওয়ার অন্যতম সুনিশ্চিত পথ হচ্ছে মানুষের হৃদয়ে আনন্দ দেয়া। তিনি সকল মানুষের দুঃখ-কষ্টের কথা ধৈর্যসহকারে শুনতেন এবং সান্ত্বনা দিতেন ও সমবেদনা জানাতেন।

শেখ নিজাম (র.)'র গুরুভক্তি ছিল অতুলনীয়। তাঁর পীর শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জেশকর (র.)'র প্রতি তাঁর প্রণতি, ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল। কিছুদিন পর পর তাঁর পীরের ব্যবহৃত পোশাক স্পর্শ করে তিনি তাঁর বায়াত নবায়ন করতেন। তাঁকে সমাহিত করার সময় তাঁর পীরের ব্যবহৃত পোশাক তাঁর কবরে দেয়া হয়। যদিও তাঁর সামনে মাথা নোয়নোকে তিনি পছন্দ করতেন না, তথাপি তাঁর পীর বাবা ফরিদ (র.) তাঁর শিষ্যদেরকে ওইরূপ করতে নিষেধ করেন নি বিধায় তিনিও তা নিষেধ করেন নি। কারণ তা' নিষেধ করলে পীরের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা হবে। একদিন এক দর্শনার্থী শেখ নিজাম (র.)কে বাবা ফরিদ (র.) এবং শেখ বাহাউদ্দিন জাকারিয়া (র.)'র মধ্যে কার আধ্যাত্মিক ক্ষমতা বেশি তা জানতে চাইলেন। শেখ নিজাম (র.) বললেন, "তাঁদের সমতুল্য ব্যক্তিই কেবল এর উত্তর দিতে পারে।" দর্শনার্থী এতে সন্তুষ্ট না হয়ে বার বার জানার জন্য পীড়াপীড়ি করলে শেখ নিজাম (র.) বলেন, "যখন আমার পীর শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জেশকর (র.) অজ্দ করতে করতে জজ্বাতি হালতে তন্ময় হয়ে যেতেন, তখন তিনি চীৎকার করে বলতেন, ইয়া হাবিব! ইয়া হাবিব! (অর্থাৎ ওহে প্রিয়তম! ওহে প্রিয়তম!) আর যখন শেখ বাহাউদ্দিন জাকারিয়া (র.) অজ্দ করতে করতে ভাবে তন্ময় হয়ে যেতেন, তখন তিনি চীৎকার করে বলতেন, 'ইয়া গফুর! ইয়া গফুর! (অর্থাৎ ওহে মার্জনাকারী! ওহে মার্জনাকারী!) এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য কোথায় তা আপনি নির্ধারণ করুন।" শেখ নিজাম (র.) মানুষকে হিদায়েত দানের জন্য অনুপম ও কার্যকর পদ্ধতি অবলম্বন করেন। তিনি কোন বিশেষ সমস্যার প্রত্যক্ষ আলোচনা এড়িয়ে চলতেন।

তিনি বিভিন্ন উদাহরণ ও ঘটনা বর্ণনা করে পরোক্ষভাবে শিষ্যদেরকে শিক্ষা দিতেন যা শিষ্যদের হৃদয়ে স্থায়ী ও কার্যকরী প্রভাব বিস্তার করত। তিনি বলতেন, "উপদেশের চাইতে দৃষ্টান্ত ভাল।"

তাঁর মতে, ওলামা এবং দরবেশের মধ্যে পদ্ধতিগত পার্থক্য আছে। ওলামারা উপদেশ এবং পরামর্শ দিয়ে ক্ষান্ত হন, কিন্তু দরবেশরা উপদেশ দিয়ে ক্ষান্ত হননা। দরবেশগণ যে কোন কিছু উদাহরণ দিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে এবং কাজে প্রয়োগ করে তা বাস্তবে দেখিয়ে দিয়ে মানুষকে পরিশুদ্ধ করেন। তিনি নিজের জীবনে কোন ঘটনা ঘটেছে কিংবা তিনি নিজে তা অনুসরণ করেছেন, সেটা প্রকাশ না করে তিনি বলতেন, জনৈক দরবেশের ক্ষেত্রে এরূপ ঘটেছে, জনৈক দরবেশ এরূপ করেছেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

শেখ নিজাম (র.) বলতেন, "যতটুকু সম্ভব ইশারা ঈঙ্গিত, উদাহরণের মাধ্যমে মানুষকে হেদায়েত করা উচিৎ, বর্ণনা কিংবা বিবৃতি দিয়ে নয়।"

শিক্ষক হিসেবে শেখ নিজাম (র.): আধ্যাত্মিক জীবনকে মন্দের বিরুদ্ধে ক্রমাগত সংগ্রামে ব্যস্ত রাখার কাজে নিয়োজিত রেখে সঙ্কুচিত করাটা শেখ নিজাম (র.) সমীচীন মনে করতেন না। তিনি একজন সুফিসাধক হিসেবে সীমাতিরিক্ত আধ্যাত্মিক সাধনা কারও উপর চাপিয়ে দিয়ে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করতে চাইতেন না। তিনি তাঁর শিষ্যদের অতিরিক্ত নামায কিংবা অনুশোচনার বোঝা চাপিয়ে দিতেন না। তাঁর পদ্ধতি ছিল মানুষের মধ্যে ভালো বোধকে জাগিয়ে তোলা এবং তাদের আত্মাকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দায়িত্বের প্রতি সাড়াপ্রবণ করে তোলা। অধ্যাপক মুহাম্মদ হাবিবের মতে, "শেখ নিজাম (র.)'র জীবন ছিল মানব প্রকৃতির এমন একটি গবেষণালব্ধ নীতি আবিষ্কার করার সাধনা, যার মাধ্যমে এটা প্রমাণ করা যায় যে, মানবাত্মার সর্বোত্তম মুক্তি বা শান্তি পার্থিব জীবনের প্রতি আকর্ষণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কিংবা এর প্রতি উদাসীনতার মধ্যে নিহিত নয়, বরঞ্চ ব্যক্তি ও তার পরিবেশকে সহানুভূতির সাথে পরিচিহ্নিত করার জন্য স্বর্গীয় অনুরাগ বা মহব্বতের সর্বোত্তম প্রবৃদ্ধি বা বিকাশের মধ্যেই নিহিত। (সূত্রঃ Politics and Society during the Early Medieval Period (collected works of M. Habib) edited by K. A. Nizami, P. 311).

শেখ নিজাম (র.) তাঁর শিষ্যদেরকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার ওপর নির্ভর করতে বলতেন যা মাইজভাণ্ডারী দর্শনের ফানা আনিল এরাদা (স্রষ্টার ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেয়া) এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি ঋণগ্রস্ততা পরিহার করতে বলতেন এবং কারও অভিভাবক হিসেবে কাজ করার দায়িত্ব গ্রহণ না করার জন্য উপদেশ দিতেন। তাঁর মতে, এগুলোর ফলে সমাজে বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হয়। বলাবাহুল্য, এ দুটো নীতি ছিল তাঁর পীর শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জেশকর (র.)'র নীতি।

শেখ নিজাম (র.)'র মতে, আধ্যাত্মিক সিলসিলায় অলৌকিকতা বা কারামত প্রদর্শন গুরুত্বপূর্ণ নয়। ফাওয়ায়িদ উল ফুয়াদ গ্রন্থে শেখ নিজাম (র.)'র কোন কারামতের বর্ণনা পাওয়া যায়না। অবশ্য শেখ নিজাম (র.) অন্যদের কারামতের কথা বর্ণনা করতেন। এগুলো তিনি বর্ণনা করতেন তাঁদের আধ্যাত্মিক ক্ষমতা প্রদর্শন করার জন্য নয়, তাঁদের নীতিমালা ও নৈতিক শিক্ষা মানুষের মাঝে তুলে ধরার জন্য। তিনি বলতেন, "সুফিবাদের একশতটি স্তর আছে, তন্মধ্যে কারামত প্রদর্শনের ক্ষমতার স্তরটি হল সপ্তদশ স্তর। এ স্তরে থেমে গেলে একজন সুফি সাধক আরও ৮৩টি স্তর কীভাবে অতিক্রম করবে?" (Faw'id-ul Fu'ad, P. 117)।

শেখ নিজাম (র.) আন্তরিকভাবে প্রদত্ত ও কোন শর্ত ছাড়া দান (futuh বা unsolicited gifts) গ্রহণ ও বন্টনের আদর্শ-নীতির দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। শেখ নিজাম (র.) অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যে দিনাতিপাত করেছেন। দিনের পর দিন অঋতক্ত থেকেছেন। তাঁর গৃহের দরজায় একটি লাউয়ের খোল (hollow gourd) টাঙ্গানো ছিল। ওই খোলে লোকজন কিছু দান করত যা দিয়ে তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন বছরের পর বছর। যখন রোজা রাখা এবং উপবাস করা তাঁর জীবনের অংশ হয়ে দাঁড়াল, তখন তাঁর সমক্ষে দানশীলতার দরজা খুলে গেল। কিন্তু তিনি নিজেকে প্রাপ্ত দানসমূহের বন্তন্‌কারী এজেন্সী হিসেবেই মনে করতেন। তাঁর প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন দান সামগ্রী নিজের কাছে তিনি রাখতেন না। সব দান বা ফুতুহ্ বিলিয়ে দিতেন। তিনি শর্তযুক্ত কিংবা স্বার্থযুক্ত (অর্থাৎ দানের পশ্চাতে কোন মকসুদ বা মতলব হাসিলের চাহিদা বা উদ্দেশ্য এমন) কখনও গ্রহণ করতেন না; এমনকি সে দান যদি কোন সুলতান কিংবা কোতোয়ালের তরফ থেকেও হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, দিল্লীর কোতোয়াল মালিক নিজাম উদ্দিন টাকার থলি নিয়ে শেখ নিজাম (র.)'র পদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়েছিলেন এবং তা গ্রহণ করার জন্য কাকুতি-মিনতি করেছিলেন, কিন্তু তিনি তা ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। (সূত্রঃ Faw'id-ul Fu'ad, P. 125)। জামাতখানার স্টোর রুমে দৈনন্দিন ভোগ্য পণ্যের যে উদ্বৃত্ত থাকত, তা প্রতি সপ্তাহ অন্তে বিলিয়ে দেয়া হোত। বিশাল দানের (উপহার সামগ্রী) অন্তর্প্রবাহ ও বহির্প্রবাহের মধ্যে থেকেও শেখ নিজাম (র.)'র এসবের প্রতি বিন্দুমাত্র লোভ ছিলনা। সুফিদের একটি প্রবাদ এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। প্রবাদটি হল: 'রাজহাঁস পানিতে থাকে, কিন্তু সে যখন পানি থেকে ডাঙ্গায় উঠে তখন এর পালক থাকে শুকনা'।

সমসাময়িককালের সুফি সাধকগণ শেখ নিজাম (র.)'র বহুমুখী আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের কথা স্বীকার করেছেন। সৈয়দ জাফর মক্কী আল হোসাইনীর মতে, "হযরত বড়পীর শেখ সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (ক.) এবং শেখ নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.) উভয়ের মর্যাদা (status) অনুপম (unique)। উভয়ে আল্লাহ্‌র প্রিয়। ফতুহাতে ফিরোজশাহীতে ফিরোজ শাহ তুঘলক শেখ নিজাম (র.)কে 'মাহবুবে ইলাহী' বলে উল্লেখ করেছেন।

শেখ নিজাম (র.)'র বহুমুখী লকবের তাৎপর্য ও বিশেষত্ব:

শেখ নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.)'র মূল নাম (original name) কী ছিল? তাঁর নামের সাথে কী কী খেতাব যুক্ত করা হয়? তাঁকে 'অলি' না বলে 'আওলিয়া' (বহু বচন) কেন বলা হয়? এ সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা প্রয়োজন মনে করছি যাতে তাঁর আধ্যাত্মিক মর্যাদা সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি করা যায়। 'ফাওয়ায়িদ উল ফুয়াদ' গ্রন্থে তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে 'শেখ নিজাম উদ্দিন' হিসেবে এবং নামের সাথে খেতাব ব্যবহার করা হয়েছে 'মালিক উল ফুকারা', 'কুতুবুল আকতাব', 'খাতেম-উল মাশায়েখ', 'খাতেম-উল মুজতাহিদীন' এবং 'সুলতানুল আওলিয়া'। (সূত্রঃ Faw'id-ul Fu'ad, P. 1, 41, 90, 114, 218)।

সিয়ার-উল আওলিয়া গ্রন্থে শেখ নিজাম (র.)কে নিম্নোক্তভাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে:

সুলতানুল মাশায়েখ নিজাম-উল-হক ওয়াল হাকিকত ওয়াল সরওয়াদ দ্বীন ওয়ারিস আল আওলিয়া ওয়াল মুরসালিন সৈয়দ সুলতানুল আওলিয়া নিজাম উদ্দিন মোহাম্মদ মাহবুবে ইলাহী বিন সৈয়দ আহমদ বিন সৈয়দ আলী আল বোখারী (র.) (Siyar-ul-Auliya, P. 92,170)। দুরার-ই-নিজামী গ্রন্থে তাঁকে নিজামুল হক ওয়া শরওয়াদ দ্বীন মোহাম্মদ বিন মোহাম্মদ বিন আহমদ বিন আলী আল বোখারী (র.) নামে উল্লেখ করা হয়েছে। (Durar-i-Nizami, P. 1,2)। খায়ের উল মাজালিস গ্রন্থে তাঁকে 'কুতুবুল আকতাব', 'শায়খুল আলম' 'শায়খুল ইসলাম' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। (Khair-ul-Majalis, P. 5,9)। জিয়া উদ্দিন বারনী এবং সামস-ই-সিরাজ তাঁকে 'শায়খুল ইসলাম' বলে উল্লেখ করেছেন 'তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী' গ্রন্থে (পৃ. ২৮, ৮৩, ৩৪১, ৫০০)। ইবনে বতুতা তাঁকে নিজাম উদ্দিন বাদাউনী বলে উল্লেখ করেছেন। (রিহ্লা, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩)।

মাওলানা জামি তাঁকে শেখ নিজাম উদ্দিন আওলিয়া নামে অভিহিত করেন। (নাফাহাত উল উন্ছ, পৃ. ৪৫২)। জামালী তাঁকে 'মালিক উল মাশায়েখ ওয়াল আওলিয়া' বা 'সুলতানুল মাশায়েখ' নামে অভিহিত করেছেন। (সিয়ার-উল আরেফীন, পৃ. ৯১, ৪৬, ১৯)। মাওলানা কামাল উদ্দিন জাহিদ কর্তৃক তাঁকে যে শিক্ষাগত সনদ পত্র দেয়া হয় তাতে তাঁর নাম লেখা হয় নিজাম উদ্দিন মোহাম্মদ বিন আলী (সিয়ার উল আওলিয়া, পৃ. ১০৪)। সুতরাং এটা পরিষ্কার যে তাঁর মূল নাম ছিল মোহাম্মদ। শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জেশকর (র.) তাঁকে যে খেলাফতনামা প্রদান করেন তাতে তাঁর নাম লেখা হয় নিজাম-উল-মিল্লাত ওয়াদ দ্বীন মোহাম্মদ বিন আহমদ (সিয়ার উল আওলিয়া, পৃ. ১১৭)। মাওলানা শামছ উদ্দিন ইয়াহিয়া সাহেবকে খেলাফত নামা প্রদান করার সময় শেখ নিজাম (র.) তাঁর নাম লেখেন নিজাম উদ্দিন মোহাম্মদ। (সিয়ার-উল আওলিয়া, পৃ. ৪৪৯)। বাদাউনের এক শিক্ষক তাঁকে সম্বোধন করতেন বাবা মোহাম্মদ হিসেবে। সুতরাং বুঝা গেল যে, নিজাম উদ্দিন হল তাঁর অন্যতম উপাধি এবং তা তাঁর বাল্যকাল থেকেই প্রচলিত। জামাল কিয়াম উদ্দিন বর্ণনা করেন যে, শেখ নিজাম (র.)'র শৈশবকালে এক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি তাঁর বাড়ির দরজায় এসে তাঁকে

মাওলানা নিজাম উদ্দিন বলে ডাক দেন। শেখ নিজাম (র.) ডাক শুনে বিচলিত হন এবং অনুভব করেন যে, কোন গায়েবী আওয়াজ তাঁকে এ নামে ডেকেছেন। (কিয়াম উল আকায়েদ, পৃ. ১৫)। এ ঘটনার পর থেকেই তাঁকে সবাই নিজাম উদ্দিন বলে ডাকতে থাকেন। এমনকি তাঁর মাতাও তাঁকে এ নামে ডাকতে শুরু করেন। আমির খসরুর মতে, "যখন থেকে শেখ নিজাম (র.) শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জেশকর (র.)'র শিষ্যদেরকে ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত করতে শুরু করেন, তখন থেকে তাঁর উপধি হয় 'নিজাম'। 'জামাল কিয়াম উদ্দিন তাঁকে কুতুবুল আলম নিজাম উল হক ওয়াদ দ্বীন নামে অভিহিত করেন। এখন দেখা যাক তাঁকে 'অলি' না বলে 'আওলিয়া' বলা হয় কেন? কেউ কেউ বলেন, 'সুলতানুল আওলিয়া' বা 'নিজাম-ই আওলিয়া'র অংশ হিসেবে তাঁকে 'আওলিয়া' বলা হয়। কিন্তু এ যুক্তি গ্রহণযোগ্য মনে হয়না; কারণ 'উপাধি'র কিছু অংশ রাখা এবং কিছু অংশ বাদ দেয়ার রীতি সচরাচর দেখা যায়না। কোন কোন লেখক 'অলি' শব্দ ব্যবহার না করে তাঁর ক্ষেত্রে 'আওলিয়া' (বহুবচন) ব্যবহার করাতে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। প্রকৃত পক্ষে, কোন ব্যক্তির কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্য বা গুণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করার জন্য আরবি ভাষায় বহুবচন ব্যবহৃত হয়। দিল্লীর শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্‌র পুত্র শাহ্ আবদুল আজিজ আরবি ভাষায় একজন সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি বলেন, "কোন গুণের গুরুত্ব বুঝানোর জন্য বহুবচন ব্যবহার করার রেওয়াজ আছে আরবি ভাষায়। যেমন, পবিত্র কুরআনে ইব্রাহিম (আ.)কে 'উম্মাহ্' বলা হয়েছে। খাজা ওবায়দুল্লাহ্ 'আবরার' হিসেবে পরিচিত হয়েছেন এবং কা'ব (Ka'b) 'আহ্বার' হিসেবে অভিহিত হয়েছেন।" (Shifa al-Alil, being translation with commentary of Shah Waliullah's Qaul-ul-Jamil, Matba-I-NIzami, Kanpur, 1291 AH, P.135)। তাঁর নামের সাথে 'আওলিয়া' শব্দটি ষোড়শ শতাব্দী থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। প্রকৃত পক্ষে, তাঁর ওফাতের পূর্বে ও পরে তিনি বহু লকবে ভূষিত হয়েছেন। তবে তাঁর জীবদ্দশায় যে দু'টি লকব খুবই জনপ্রিয় ছিল এবং বর্তমানেও খুব বেশি আলোচিত সে দু'টি লকব হল:

১. সুলতানুল মাশায়েখ এবং ২. মাহবুবে ইলাহী। এ দু'টির মধ্যে প্রথম লকবটি অলি হিসেবে তাঁর মর্যাদা নির্দেশক এবং দ্বিতীয় লকবটি আল্লাহ্‌র চোখে তাঁর অবস্থান নির্দেশক।

শেখ নিজাম (র.)'র পারিবারিক জীবন:

শেখ নিজাম (র.)'র একজন বড় বোন ছিলেন। তাঁর বিবাহ সুখের হয়নি। স্বামীর সাথে বনিবনা ছিলনা। এজন্য শেখ নিজাম (র.)'র মাতা খুবই চিন্তিত ছিলেন। শেখ নিজাম (র.) বিবাহ করেননি। তাঁর বোনের ছেলে মেয়েদেরকে অত্যন্ত স্নেহের সাথে তিনি লালন পালন করেন। শেখ নিজাম (র.)'র পাঁচ জন আত্মীয়ের কথা আমীর খুরদ্ বর্ণনা করেছেন। তাঁরা হলেন– ১. খাজা রফিউদ্দিন হারুন, ২. খাজা তকি উদ্দিন নুহ্, ৩. খাজা আবু বকর, ৪. মাওলানা কাশেম এবং ৫. খাজা আবু বকরের পুত্র খাজা আজিজ উদ্দিন। খাজা রফি উদ্দিন হারুন শেখ নিজাম (র.)'র প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে বড় হন। তিনি তাঁকে হাফেজে কুরআন বানান। তাঁকে ছাড়া শেখ নিজাম (র.) নৈশ আহার করতেন না। শেখ নিজাম (র.) তাঁকে অত্যধিক ভালবাসতেন এবং তাঁর সাথে প্রাণ খুলে কথা বলতেন।

খাজা তকি উদ্দিন নুহ্ ছিলেন খাজা রফি উদ্দিনের ছোট ভাই। তিনি মেধাবী ছিলেন। তিনি অত্যন্ত ধার্মিক ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি হাফেজে কুরআন ছিলেন এবং প্রতি শুক্রবার রাতে সম্পূর্ণ কুরআন শরিফ তেলাওয়াত করতেন। শেখ নিজাম (র.) তাঁর জ্ঞান পিপাসা ও ধার্মিকতার প্রশংসা করতেন। একদা শেখ নিজাম (র.) তাঁকে তাঁর প্রার্থনা ও রেয়াজতের উদ্দেশ্য কী জিজ্ঞাসা করলেন। খাজা নুহ্ বললেন, "কেবলমাত্র আপনি [শেখ নিজাম (র.)] দীর্ঘায়ু লাভ করুন এটাই আমার কামনা।" এ কথা শুনে শেখ নিজাম (র.)'র হৃদয় তাঁর প্রতি ভালবাসায় বিগলিত হয়ে গেল। একদা শেখ নিজাম (র.) ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তিনি খাজা নুহ্‌কে ডেকে খেলাফত দান করলেন এবং নিম্নোক্তভাবে উপদেশ দিলেন–

"তোমার কাছে যত সম্পদ আসবে তা ব্যয় করে ফেলবে। নিজের কাছে রেখে দেবেনা। তোমার কাছে যদি কিছু না থাকে, তবে দুঃখিত হবেনা। আল্লাহ্ তোমাকে তা দিয়ে দেবেন। কারও অশুভ কামনা করোনা। কারও জন্য খোদার কাছে বদ্‌দোয়া করোনা। কারও দ্বারা অত্যাচারিত ও নিপীড়িত হলে বিনিময়ে তাকে ভালবাসা দিও এবং ক্ষমা করিও। কারও বৃত্তি গ্রহণ করোনা, কারণ দরবেশরা বৃত্তি গ্রহণ করতে পারেনা। তুমি যদি আমার উপদেশ মেনে চল, তাহলে রাজা তোমার দুয়ারে আসবে।" কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত খাজা নুহ্ যক্ষা রোগে আক্রান্ত হয়ে শেখ নিজাম (র.)'র জীবদ্দশায় অকালে ইন্তিকাল করেন। শেখ নিজাম (র.) এতে অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিলেন। উল্লেখ্য, খাজা রফিউদ্দিন হারুন এবং খাজা তকি উদ্দিন নুহ্ সম্পর্কে শেখ নিজাম (র.)'র ভাগিনা ছিলেন।

খাজা আবু বকরের সাথে শেখ নিজাম (র.)'র কিরূপ আত্মীয়তা ছিল তা সিয়ার উল আওলিয়াতে বর্ণিত হয়নি। কিন্তু খাজা আবু বকর সর্বদা শেখ নিজাম (র.)'র খেদমতে থাকতেন। তিনি ক্রমাগতভাবে রোজা রাখতেন। কোন কোন সময় তিনি বহুদিন ধরে রোজা খুলতেন না। জুমার দিন কিলুগড়ীর জামে মসজিদে তিনি শেখ নিজাম (র.)'র জায়নামায বহন করে নিয়ে যেতেন। তিনি সেমা মাহফিলে মাঝে মাঝে এত জজ্‌বাতি হালে চলে যেতেন যে, তিনি নিজের গায়ের জামা পর্যন্ত খুলে বাদ্য যন্ত্র-বাদক কিংবা গায়কদেরকে দিয়ে দিতেন।

মাওলানা কাশিম বিন ওমর ছিলেন শেখ নিজাম (র.)'র ভাগিনার পুত্র। বার বছর বয়সে তিনি কুরআনে হাফেজ হন। তিনি লতায়েফ উল তফসির শীর্ষক কুরআনের তফসির লেখেন। তিনি মাওলানা জালাল উদ্দিনের ছাত্র ছিলেন এবং পঞ্চাশ বছরকাল তাঁর সান্নিধ্যে কাটিয়ে ছিলেন। তিনি হেদায়া, বাজদাবী, কাশ্‌শাফ, মাশারিখ এবং মাসাবিহ্ প্রভৃতি সম্পর্কে অধ্যয়ন করেন এবং মাওলানা জালাল উদ্দিন থেকে সনদপত্র লাভ করেন। খাজা আজিজ উদ্দিন ছিলেন খাজা আবু বকরের পুত্র এবং ধার্মিকতা ও পাণ্ডিত্যে তিনি স্বনাম খ্যাত ছিলেন। তিনি মজ্‌মুয়াউল ফাওয়ায়িদ গ্রন্থে শেখ নিজাম (র.)'র কথোপকথনসমূহ লিপিবদ্ধ করেন। প্রতি শুক্রবার রাতে তিনি এক খতম কুরআন তেলাওয়াত করতেন। শেখ নিজাম (র.)'র

একটি প্রধান শিক্ষা ছিল মানুষকে কুরআন হেফজ বা মুখস্থ করায় উদ্বুদ্ধ করা। শেখ নিজাম (র.) তাঁর ভাগিনাবৃন্দ এবং শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জেশকর (র.)'র আওলাদদেরকে কুরআনে হাফেজ বানানোর জন্য একজন অভিজ্ঞ ও প্রতিভাবান হাফেজ নিযুক্ত করেন।

শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জেশকর (র.)'র নাতি-নাতনীর তত্ত্বাবধানকারী হিসেবে শেখ নিজাম (র.): তাঁর ভাগিনাগণ ছাড়া শেখ ফরিদ (র.)'র কয়েকজন নাতি-নাতনীকেও তিনি আদর যত্ন দিয়ে লালন পালন করেছেন। বাবা ফরিদ (র.)'র সর্ব কনিষ্ঠা কন্যা বিবি ফাতেমাকে মাওলানা বদরুদ্দীন ইছহাক বিয়ে করেন। বাবা ফরিদ (র.)'র জামাত খানায় অবস্থানকালে মাওলানা বদরুদ্দীন ইছহাক শেখ নিজাম (র.) কে অত্যন্ত আদর-যত্ন করতেন। বদরুদ্দীন ইছহাক মারা যাবার পর তাঁর দুই ছেলে মোহাম্মদ ইমাম এবং মুহাম্মদ মুসার লেখা পড়ার জন্য শেখ নিজাম (র.) খুবই চিন্তিত হলেন। তিনি তাদেরকে দিল্লীতে নিয়ে আসার জন্য চিন্তা করলেন, কিন্তু তাঁর সে সামর্থ্য ছিলনা। একজন মুলতানী বণিক তাঁর জন্য দুই থলে স্বর্ণমুদ্রা আনলেন। তিনি উপহারগুলো গ্রহণ করে সৈয়দ মুহাম্মদ কিরমানীর হাতে দিলেন। এক থলে স্বর্ণ মুদ্রা তিনি কিরমানীকে তাঁর নিজের প্রয়োজনে ব্যয় করতে বললেন এবং অন্য আর এক থলে স্বর্ণ মুদ্রা ব্যয় করে মাওলানা ইছহাকের পরিবারকে দিল্লীতে এনে বসবাসের ব্যবস্থা করে দেয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। মাওলানা ইছহাকের পরিবার যখন দিল্লী আসলেন, তখন তিনি তাঁদের থাকা খাওয়ার সুবন্দোবস্ত করলেন। কতগুলো মতলববাজ দুষ্ট প্রকৃতির লোক গুজব ছড়াল যে, শেখ নিজাম (র.) মাওলানা ইছহাকের বিধবা স্ত্রী বিবি ফাতেমাকে বিয়ে করার জন্য তাঁকে অজোধান থেকে দিল্লীতে নিয়ে এসেছেন। যখন শেখ নিজাম (র.) এ ধরনের গুজব শুনলেন, তখন তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হলেন এবং অজোধানের উদ্দেশ্যে দিল্লী ত্যাগ করলেন। অজোধান থেকে শেখ নিজাম (র.) দিল্লী প্রত্যাবর্তন করার আগেই বিবি ফাতেমা মারা গেলেন। তাঁর দুই সন্তানকে (পুত্র) লালন-পালনের ভার শেখ নিজাম (র.) নিজেই গ্রহণ করলেন। তাঁদেরকে লেখাপড়া ও প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করলেন। বিবি ফাতেমার বড় ছেলে খাজা মুহাম্মদ ইমাম একজন হাফেজে কুরআন এবং বড় মাপের ইসলামী পণ্ডিত হিসেবে খ্যাতিমান হয়েছিলেন। শেখ নিজাম (র.) তাঁকে অত্যধিক ভালবাসতেন এবং শেখ নিজাম (র.)'র জীবদ্দশায় তাঁকে মুরীদ করানোর অনুমতি দিয়েছিলেন। শেখ নিজাম (র.)'র এত কাছে আর কেউ বসার সুযোগ পেতেন না যা কেবল খাজা মুহাম্মদ ইমামের ভাগ্যে জুটেছিল। জামাত খানায় তিনি নামাযের ইমামতি করতেন যেখানে শেখ নিজাম (র.) মোক্তাদী হিসাবে নামায পড়তেন জামাত সহকারে। আনওয়ারুল মাজালিশ নামক গ্রন্থে তিনি শেখ নিজাম (র.)'র বহু কথোপকথন সংকলন করেছেন। দুঃখের বিষয় এ গ্রন্থটি বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। হিন্দি ও ফার্সি ভাষায় গজল গায়কগণ সর্বদা তাঁর সান্নিধ্যে থাকতেন এবং গজল গাইতেন। তাঁর অপর ভাই খাজা মুসাও একজন হাফেজে কুরআন ছিলেন। তিনি ফিকাহ্ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি একজন প্রখ্যাত কবি ছিলেন এবং ফার্সি ও আরবি ভাষায় বহু কবিতা রচনা করেছেন।

খাজা শেখ ফরিদ (র.)'র পুত্র খাজা ইয়াকুবের দুই পুত্র খাজা আজিজ উদ্দিন ও খাজা কাজী দীর্ঘদিন শেখ নিজাম (র.)'র সাথে ছিলেন এবং শেখ নিজাম (র.) তাঁদের লেখাপড়া তদারক করতেন। শেখ নিজাম (র.) তাঁকে দক্ষিণ ভারতে ত্বরিকা প্রচারের জন্য নিয়োজিত করেছিলেন।

শেখজাদা কামাল উদ্দিন ও শেখ ফরিদ (র.)'র আত্মীয় ছিলেন। শেখ নিজাম উদ্দিন (র.) শেখজাদা আজিজ উদ্দিনকে দিওগীর পাঠান এবং শেখ কামাল উদ্দিনকে পাঠান মালওয়া নামক স্থানে। পাঠাবার আগে শেখ নিজাম (র.) উভয়ের প্রতি জালালী দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন যা তাঁদের প্রতি শেখ নিজাম (র.)'র আধ্যাত্মিক ফয়েজের পরিচায়ক। খাজা আজিজ উদ্দিন বিন খাজা ইব্রাহিম বিন খাজা নিজাম উদ্দিনও শেখ নিজাম (র.)'র তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত হন। শেখ ফরিদ গঞ্জেশকর (র.)'র কন্যা বিবি মস্‌তুরার ছেলে খাজা আজিজ উদ্দিন সুফিও শেখ নিজাম (র.)'র যত্নে লালিত পালিত হন। তিনি শেখ নিজাম (র.)'র কথোপকথন 'তোহ্‌ফাতুল আবরার ফি কেরামতুল আখিয়ার' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। তাঁর ছোট ভাই শেখজাদা কবির উদ্দিনও শেখ নিজাম (র.)'র তত্ত্বাবধানে লেখাপড়া শেখেন। তিনি সর্বদা শেখ নিজাম (র.)'র কাছাকাছি থাকতেন এবং শেখ নিজাম (র.) তাঁর ধার্মিকতার ভূয়সী প্রশংসা করতেন। প্রকৃত পক্ষে, শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জেশকর (র.)'র অনেক উত্তরসূরি বংশধরকে শেখ নিজাম (র.) স্নেহের সাথে লালন পালন করেন এবং বিদ্যা শিক্ষা দেন।

কিরমানী পরিবার ও শেখ নিজাম (র.): আধ্যাত্মিক গুরু হিসেবে জীবন সাধনার শুরু থেকে শেখ নিজাম (র.)'র সাথে যাদের উঠাবসা ছিল, তম্মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল কিরমানী পরিবার। শেখ নিজাম (র.) সর্ব প্রথম অজোধানে তাঁর পীরের জামাত খানায় কিরমানী পরিবারের সংস্পর্শে আসেন। সৈয়দ মুহাম্মদ মাহমুদ ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। তিনি কিরমানের অধিবাসী ছিলেন। তিনি ব্যবসার উদ্দেশ্যে ঘন ঘন ভারত সফর করতেন। তাঁর চাচা ছিলেন মুলতানের একজন টাকশাল কর্মকর্তা। তাঁর (চাচার) কন্যা বিবি রানীকে সৈয়দ মুহাম্মদ মাহমুদ বিয়ে করেন। তিনি যখনি ভরত সফরে আসতেন, তখনি জামাত খানায় এসে শেখ ফরিদ (র.)'র সাথে দেখা করে যেতেন। জামাত খানার পরিবেশ দেখে তিনি মুগ্ধ হন এবং জামাত খানায় স্থায়ীভাবে তাঁর স্ত্রীসহ বসবাস করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি আধ্যাত্মিক সাধনায় নিমগ্ন হন এবং ধন-দৌলতের পেছনে না দৌড়ে রেয়াজত সাধনা ও দারিদ্র্যকে অবলম্বন করে বেঁচে থাকাকে শ্রেয় মনে করেন। শেখ নিজাম (র.) যখন জামাত খানায় আসলেন, তখন শেখ মাহমুদ কিরমানীর স্ত্রী বিবি রানী তাঁকে বোনের মত আদর যত্ন ও সেবা দিয়ে দেখাশুনা করেন। শেখ ফরিদ (র.)'র ওফাতের পর শেখ মাহমুদ তাঁর স্ত্রীসহ দিল্লীতে চলে আসেন এবং শেখ নিজাম (র.)'র সাথে বসবাস করতে থাকেন। শেখ নিজাম (র.)'র সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ফলে উভয়ের মধ্যে অত্যন্ত আন্তরিক সম্পর্ক সৃষ্টি হয় এবং উভয়ের ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা চেতনার মধ্যে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। আধ্যাত্মিক ও পার্থিব বস্তুগত বিষয়ে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী হয় এক এবং অভিন্ন। সৈয়দ মুহাম্মদ মাহমুদ কিরমানীর চার

ছেলে ছিল। তাঁরা হলেন– সৈয়দ নুর উদ্দিন মোবারক, সৈয়দ কামাল উদ্দিন আমির আহমদ, সৈয়দ কুতুব উদ্দিন হোসেন এবং শামসুদ্দিন সৈয়দ খামোশ। সৈয়দ নুর উদ্দিন হলেন 'সিয়ার-উল-আওলিয়া'র লেখক আমির খুরদ এর পিতা এবং শেখ ফরিদ (র.)'র শিষ্য। তিনি খুবই উদার, অতিথিপরায়ন ও আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি পরবর্তীতে খাজা কুতুব উদ্দিন মওদুদের সিলসিলায় ভর্তি হন ও তাঁর খলীফা মনোনীত হন। কিন্তু সৈয়দ নুর উদ্দিন মোবারক কাউকে মুরিদ বা বায়াত করতেন না।

সৈয়দ কামাল উদ্দিন আমির আহমদ ছিলেন একজন ভূস্বামী ও সৈনিক। শেখ নিজাম (র.) তাঁকে লালন পালন করেন। সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক দিওগীর এর কাছে বখলীতে তাঁকে কারাবন্দী করেন। কিন্তু পরে তাঁকে মুক্তি দেয়া হয় এবং রাজ দরবারে হাজির হবার নির্দেশ দেয়া হয়। তিনি সুফি সাধকের পোশাক পরে রাজদরবারে হাজির হন। সুলতান তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এ পোশাক পরে তুমি রাজ দরবারে এসেছো কেন?" তিনি উত্তর দিলেন, "সুফির পোশাক পরলে আমাকে মহানবী (দ.)'র উত্তরসূরি বংশধরের মত লাগত এবং তাই আমি এ পোশাক পরতাম। কিন্তু এ পোশাক পরা ছেড়ে দেয়াতে আমি শাস্তি পেলাম। তাই আজ সুফির পোশাক পরে এসেছি।" সুলতান বললেন, "এটা হচ্ছে সরকারি চাকুরী না করার জন্য তোমার একটি অজুহাত। আমি তোমার পরামর্শমত এ দেশের সরকার পরিচালনা করতে চাই।" সুলতান তাঁকে উচ্চ সরকারি পদে নিয়োগ দান করলেন।

সৈয়দ কুতুব উদ্দিন হোসেন অত্যন্ত বিদ্বান, ধার্মিক এবং উদার ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি মাওলানা ফখরুদ্দীন জাররাদীর ছাত্র ছিলেন এবং শেখ নিজাম (র.)'র তত্ত্বাবধানে তিনি লালিত-পালিত হন। শেখ নিজাম (র.) তাঁকে নিজের পুত্র বলে সম্বোধন করতেন। জোহর নামাযের সময় তিনি সর্বদা শেখ নিজাম (র.)'র সভায় উপস্থিত থাকতেন। শেখ নিজাম (র.)'র অনেক দর্শনার্থী তাঁকে দেখার জন্য তাঁর বাড়িতে আসতেন। খাজা জাহান আহমদ আয়াজ তাঁকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে দিওগীর নিয়ে যান এবং সেখানে যাবার কিছুদিন পর তিনি হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যান।

শামসুদ্দিন সৈয়দ খামোশও শেখ নিজাম (র.)'র তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত হন এবং শেখ নিজাম (র.)'র সাথে তিনি 'খামছা-ই-নিজামী' পাঠ করতেন। দিল্লী শহরের যে সকল দর্শনার্থী শেখ নিজাম (র.)'র কাছে আসতেন, তাঁরা সবাই সৈয়দ খামোশের সাথে রাত্রে অবস্থান করতেন। তিনি তাঁদেরকে সাদরে গ্রহণ করতেন। শেখ নিজাম (র.)'র সাথে কিরমানী পরিবারের এ ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ফলেই আমির খুরদের দ্বারা শেখ নিজাম (র.)'র বিখ্যাত জীবনী গ্রন্থ সিয়ার উল আওলিয়া রচনা করা সম্ভব হয়েছিল।

চতুর্দশ অধ্যায়

শেখ নিজাম (র.) ও তাঁর খলীফাবৃন্দ

শেখ নিজাম (র.)'র চেষ্টার ফলে চিশ্‌তী সিলসিলাহ্ সারা ভারতে আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি চর্চার একটি আন্দোলনে পরিণত হয়। তিনি মানুষকে পরিশুদ্ধি, সততা, ধার্মিকতা, নৈতিকতার পথে আহ্বান জানানোর জন্য তাঁর খলীফাবৃন্দকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠান। মুহাম্মদ ঘোথী সাত্তারী (Ghauthi Sattari)'র মতে, শেখ নিজাম (র.) সাতশত খলীফাবৃন্দকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহরে সিলসিলাহর প্রচার ও প্রসারের জন্য প্রেরণ করেন। ফলে হরিয়ানা, মালওয়া, গুজরাট, দাক্ষিণাত্য ও বঙ্গ দেশের (Bengal) বিভিন্ন শহরে চিশ্‌তী সিলসিলাহ্‌র আধ্যাত্মিক কেন্দ্র গড়ে উঠে। পরবর্তীতে ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রাদেশিক রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবার পর ত্বরিকা প্রসারের কাজে এ কেন্দ্রগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

শেখ নিজাম (র.)'র ওফাতের কিছুদিন পূর্বে তাঁর অসুস্থ অবস্থায় সৈয়দ হোসেন কিরমানী, শেখ নাছির উদ্দিন মাহমুদ, মাওলানা ফখরুদ্দীন জাররাদী, খাজা মোবাশ্বির এবং খাজা ইকবালের সাথে পরামর্শক্রমে তাঁর খলীফা হবার উপযুক্ত ব্যক্তিদের একটি তালিকা প্রণয়ন করা হয়। এ তালিকায় ত্রিশ জনের নাম ছিল। শেখ নিজাম (র.)'র বহু সিনিয়র শিষ্যের পক্ষে আমির খসরু খেলাফতের জন্য শেখ নিজাম (র.)'র কাছে দরখাস্ত পেশ করেন। শেখ নিজাম (র.) বললেন, "খেলাফতের জন্য এত বেশি লোক মনোনীত করার দরকার কী?" শেখ নিজাম (র.)'র মন্তব্য শুনে আমির খসরু আবেদনকারীর তালিকা কিছুটা কাটছাঁট করে পুনরায় শেখ নিজাম (র.)'র কাছে পেশ করলেন। তালিকায় আখী সিরাজের নাম দেখে শেখ নিজাম (র.) মন্তব্য করলেন, "খেলাফতের জন্য প্রথম শর্ত হল শিক্ষা।" অতঃপর শেখ নিজাম (র.) সৈয়দ হোসেন কিরমানীকে খেলাফত নামা লেখার আদেশ দিলেন। খেলাফতের দলিলাদির খসড়া করলেন মাওলানা ফখর উদ্দিন জার্‌রাদী এবং শেখ নিজাম (র.)'র নির্দেশে খেলাফত প্রাপ্তদের নাম লিখলেন সৈয়দ হোসেন কিরমানী। খেলাফত নামার নীচে শেখ নিজাম (র.) তাঁর নাম লিখলেন এভাবে 'গরীব মুহাম্মদ বিন আহমদ আলী আল বাদাউনী আল বোখারী থেকে'। খেলাফতনামা প্রণীত হয় শেখ নিজাম (র.)'র ওফাতের চার মাস আগে ২০ জিলহজ্ব ৭২৬ হিজরি সনে। খেলাফত নামার একটি নমুনা নিম্নে দেয়া হল:

খেলাফত নামা

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করছি। তাঁর জন্যই সমস্ত প্রশংসা ও ধন্যবাদ যিনি তাঁর প্রিয় বান্দাকে পার্থিব জগতের বস্তুগত কামনা বাসনা থেকে রক্ষা করেছেন। কারণ এ জগত হচ্ছে নিন্দিত (Condemned) স্থান। আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর প্রিয় বান্দা তথা অলিদেরকে, তাঁর মনোনীত দাসদের অন্তরকে তাঁর দিকে ঝুঁকিয়ে দেন এবং তিনি তাঁদেরকে চিরস্থায়ী স্বর্গীয় সুরা পান করান। তাঁদের অন্তর নিশী রাতে আলোকিত হয় এবং তাঁরা তখন চোখের জল ফেলেন। তাঁরা আল্লাহ্‌র ভালবাসায় সিক্ত হন এবং তাঁরা আল্লাহ্‌র গোপন খবর সফলভাবে বর্ণনা করতে সক্ষম হন। তাঁদের কেউ কেউ প্রতি মুহূর্তে এলহাম পান এবং তাঁদের নূরানী আলোর রশ্মি বিচ্ছুরণের দ্বারা জগতকে আলোকিত করেন। তাঁদের কথা আল্লাহ্‌র কথা হয়ে যায়, কারণ তাঁরা লোকজনকে আল্লাহ্‌র পথে আহ্বান জানান যাতে করে জনগণ বিশুদ্ধ ও পরিশুদ্ধ হয় এবং আল্লাহ্‌র বন্ধু হয়ে যায়।

আল্লাহ্‌র সমস্ত আশীর্বাদ মহানবী (দ.)'র প্রতি বর্ষিত হোক যিনি এ পৃথিবীতে আল্লাহ্ কর্তৃক পথ নির্দেশক ও রসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন। আশীর্বাদ তাঁর খলীফাবৃন্দ ও উত্তরসূরী বংশধরদের প্রতি যাঁরা সঠিক পথ দেখিয়েছেন এবং সর্বক্ষণ আল্লাহ্‌র প্রার্থনায় রত আছেন। মানুষকে আল্লাহ্‌র পথে আহ্বান করা সবচেয়ে প্রশংসনীয় কাজ এবং ঈমানের অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। হাদীসে আছে, "আমি আল্লাহ্‌র নামে শপথ করছি যাঁর হাতে মুহাম্মদের জীবন এবং আমি শপথ করছি, কারণ আমি আপনাকে বিশ্বাস করাতে চাই যে, এ জগতের মানুষের মধ্যে তিনিই হলেন আল্লাহ্‌র বন্ধু যিনি আল্লাহ্‌র বন্ধুত্বের কথা তাঁর প্রাণীকুলের কাছে প্রকাশ করেন এবং তাঁর প্রাণীকুলের বন্ধুত্বের কথা তাঁর (আল্লাহ্) কাছে প্রকাশ করেন। তিনি মানুষকে আল্লাহ্‌র ভালবাসার পথে পরিচালিত করেন এবং আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব স্মরণ রাখতে লোকদেরকে উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি লোকদেরকে হালাল কাজ করতে এবং আল্লাহ্ যা চান তা করতে অনুপ্রাণিত করেন।" মানুষ তাদের পরিবার পরিজন, সন্তান-সন্ততি এবং নিজের নিরাপত্তার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করে। আল্লাহ্ তা'য়ালা মহানবী (দ.)কে অনুসরণ করা সকল প্রাণীকুলের জন্য বাধ্যতামূলক করেছেন। আল্লাহ্ বলেন, "তুমি বল, এটাই আমার পথ। আমি তোমাদেরকে খোদার পথে আহ্বান জানাই যার প্রমাণ আমি এবং আমাকে যারা অনুসরণ করে তারা চাক্ষুষ দেখতে পায়। সকল মহিমা আল্লাহ্‌র এবং আমি আল্লাহ্‌র সাথে শির্‌ক করিনা।" (আল কুরআনঃ সূরা ১২, আয়াত ১০৮)। রসূল (দ.)'র প্রতি আনুগত্য বলতে এটাই বুঝায়। অর্থাৎ মহানবী (দ.)'র হাদীস স্মরণ করা এবং আল্লাহ্‌র খাতিরে তাঁর সুন্নাহকে অনুসরণ করা, দুনিয়ার সমস্ত সংশ্রব ত্যাগ করে একজন মানুষকে আল্লাহ্‌র প্রতি অনুরক্ত হওয়া, আল্লাহ্‌র ধ্যানে মগ্ন হওয়া উচিৎ। তিনিই হলেন সত্যিকারের অলি যিনি এরূপ হবেন এবং তিনি মহানবী (দ.)'র অনুসারীদের নেতা হবেন। কারণ তিনি খোদার সিফাত সম্পর্কে অবগত এবং আল্লাহ্‌র একত্বে বিশ্বাসী। সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র এবং তাঁর মনোনীত ব্যক্তিও প্রশংসার যোগ্য। তিনি হবেন মহানবী (দ.)'র অনুসারীদের নেতা

এবং মুহাম্মদ (দ.)'র ঈমানের উজ্জ্বল সূর্য। সেই মানুষটি হলেন আমার মনোনীত খলীফা। মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর (খলীফা) মাধ্যমে সকল ঈমানদার ও সুফিদের প্রতি খোদার নূর ও আশীর্বাদ বর্ষণ করুন। যেহেতু আমার মনোনীত খলীফা তাঁর সুদৃঢ় বিশ্বাসের কারণে আমার শিষ্য হয়েছেন এবং আমার পর্যাপ্ত হেদায়েত প্রাপ্ত হয়েছেন, আমি তাঁকে তাঁর সুফি পোশাক (খিরকা বা Mystic cloak) তাঁর শিষ্যদেরকে দেয়ার জন্য এবং তাঁদেরকে তাঁর খলীফা হিসেবে মনোনীত করার জন্য অনুমতি দিলাম যেরূপ আমার পীর আমাকে দিয়েছেন। তবে শর্ত থাকে যে, কোনমতেই আমার খলীফা মহানবী (দ.)'র পথ থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হতে পারবেন না এবং সর্বদা আল্লাহ্র আরাধনায় রত থাকবেন এবং বস্তুগত কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত থাকবেন। আমার পীর তাঁর আধ্যাত্মিকতা ও কারামতের জন্য সারা বিশ্বে প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং ধ্যানের মাধ্যমে বাতেনী জগৎ দেখতে পেতেন। তিনি আল্লাহ্র আশেক ছিলেন। তিনি মহানবী (দ.)'র শরীয়তের পাবন্দ ছিলেন এবং তাঁর বিশ্বাস ও ধ্যানে নির্ভীক ছিলেন। মহান আল্লাহ্ তাঁর রওজা শরিফে আশীর্বাদ বর্ষণ করুন এবং তাঁকে শান্তিতে রাখুন।

আমার পীর খিরকাহ্ পেয়েছেন শেখদের (সুফিদের) রাজা, ত্বরিকতের সুলতান, খোদার ভালবাসায় যিনি নিজেকে বিসর্জন দিয়েছেন সেই মহান ব্যক্তিত্ব কুতুবুল মিল্লাত ওয়াদ দ্বীন বখতিয়ার আউসী থেকে; বখতিয়ার আউসী পেয়েছেন সাধকের উজ্জ্বল নক্ষত্র মুঈন উদ্দিন হাসান সিজ্জী থেকে; হাসান সিজ্জী পেয়েছেন সৃষ্টিকুলের জন্য সত্যের প্রমাণ ওসমান হারুনী থেকে; ওসমান হারুনী পেয়েছেন সত্যভাষী হাজী শরিফ জিন্দানী থেকে; শরিফ জিন্দানী পেয়েছেন মরণশীলদের মধ্যে আল্লাহ্র ছায়া মওদুদ চিশ্তী থেকে; মওদুদ চিশ্তী পেয়েছেন সুফিদের রাজা (King of the Shaikha) মিল্লাত ওয়াদ দ্বীন ইউসুফ চিশ্তী থেকে; ইউসুফ চিশ্তী পেয়েছেন ভক্তদের আশ্রয় আবু মুহাম্মদ চিশ্তী থেকে; আবু মুহাম্মদ চিশ্তী পেয়েছেন পুণ্যাত্মাদের নেতা এবং ধার্মিকদের স্তম্ভ আবি আহমদ চিশ্তী থেকে; আবি আহমদ চিশ্তী পেয়েছেন নেতাদের লণ্ঠন আবু ইসহাক চিশ্তী থেকে; আবু ইসহাক চিশ্তী পেয়েছেন ফকিরদের পুত্র মমসাদ উলু দিনওয়ারী থেকে; দিনওয়ারী পেয়েছেন বিশ্বাসীদের নেতা জবায়রাতুল বসরী থেকে; বসরী পেয়েছেন পরিশুদ্ধদের মুকুট এবং প্রেমিকদের প্রমাণ হুজায়ফাতুল মারাশী থেকে; মারাশী পেয়েছেন শেখদের সুলতান, প্রেমিকদের যুক্তি, পার্থিব রাজত্ব বিসর্জনকারী ইব্রাহিম বিন আদহাম থেকে; ইব্রাহিম বিন আদহাম পেয়েছেন দেশের তারকাদের স্তম্ভ, গুণীদের শিক্ষক, বিজ্ঞানের সেরা পণ্ডিত, মহান সাধক শেখ আব্দুল ওয়াহিদ বিন জায়েদ থেকে; বিন জায়েদ পেয়েছেন তাবেয়ীনদের কমাণ্ডার ও বিশ্বের ইমাম হাসান আল বসরী থেকে; হাসান আল বসরী পেয়েছেন আমিরুল মোমেনীন, মহানবী (দ.)'র উত্তরসূরী (Successor), উত্তরাধিকারের পোশাক দাতা (Giver of garment of succession), মহানবী (দ.)'র তরফ থেকে খেলাফতের পোশাক গ্রহণকারী (অর্থাৎ হযরত আমিরুল মোমেনীন, ধার্মিক খলীফাদের সর্বশেষ, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ইমাম পরম শ্রদ্ধেয় আলী মরতুজা বিন আবি তালিব (রা.) থেকে (মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁকে সম্মানিত করুন এবং সকল অলিদের বাতেনী বিষয় পরিশুদ্ধ করুন এবং এই আলো হাশরের দিন ত্বক বজায়

রাখুন); হযরত আলী (রা.) পেয়েছেন সকল নবীর শ্রেষ্ঠ নবী, সকল নবীর শেষ নবী, আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহপ্রাপ্ত নবী হযরত মুহাম্মদ (দ.) থেকে। যাঁরা মহানবী (দ.)'র সাথে যুক্ত আছেন তাঁদের সকলকে মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা রহম করুন।

অতএব যে সকল মানুষ আমার কাছে আসতে পারেনি, তারা আমার সামসুদ্দীন বিন ইয়াহিয়ার আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব (Spiritual leadership) গ্রহণ করতে পারে যেহেতু আমি তাঁকে আমার উত্তরাধিকারী (successor) ও প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছি। ধর্মীয় ও ধর্মবহির্ভূত বিষয়ে তিনি আমার সহকারী (deputy)। ধর্মীয় ও ধর্মবহির্ভূত বিষয়ে তাঁকে অনুসরণ করা মানে আমাকে অনুসরণ করা। আমি যাঁদেরকে শ্রদ্ধা করি তাঁদেরকে কেউ অপমান করলে আল্লাহ্ তাকে অপমান করবেন। মহান আল্লাহ্ তা'য়ালাই প্রকৃত সাহায্যদাতা। আমি আল্লাহ্‌র নিকট থেকে সাহায্য চাই এবং তাঁর উপর নির্ভর করি।

শেখ নিজাম উদ্দিন মুহাম্মদ বিন আহমদ

অনুলেখক: হোসেন বিন মুহাম্মদ বিন মাহমুদ আলভী আল-কিরমানী ১০ই জিলহজ্ব, ৮২৪ হিজরি (সিয়ার উল আওলিয়া, পৃ. ২২৯-৩৬)

বি.দ্র.: উপর্যুক্ত খেলাফতনামাটি শেখ নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.) মাওলানা সামছুদ্দিন বিন ইয়াহিয়াকে প্রদান করেছিলেন।

শেখ নিজাম (র.) খলীফা নিয়োগের ক্ষেত্রে খুবই কঠোর নীতি মেনে চলতেন। চরিত্র, সাধনা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, আধ্যাত্মিকতা, ত্যাগ-তিতিক্ষা, নির্মোহতা, সিলসিলাহ্ বিস্তারে ভূমিকা, পাণ্ডিত্য, ব্যক্তিত্ব, মানবতা, স্রষ্টার প্রতি অনুরাগ, নবী প্রেম, কুরআন-হাদীস সম্পর্কে জ্ঞানের ব্যাপকতা প্রভৃতি দিক বিবেচনা করে তিনি তাঁর খলীফা নিয়োগ দিয়েছেন। তাঁর খলীফার সংখ্যা প্রায় ষাটের কাছাকাছি। তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থাকা, বহুল আলোচিত ও সুফি সাধক হিসেবে প্রসিদ্ধ কয়েকজনের নাম ও তাঁদের সংক্ষিপ্ত জীবনী আধ্যাত্মিকতার স্বরূপ সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধির জন্য নিম্নে প্রদত্ত হলো:

শেখ নিজাম (র.)'র বিশিষ্ট খলীফা বৃন্দের নামঃ

১. মাওলানা সামছুদ্দীন ইয়াহিয়া, ২. শেখ নাছিরুদ্দিন চেরাগ, ৩. শেখ কুতুব উদ্দিন মোনাওয়ার, ৪. মাওলানা হুসাম উদ্দিন মুলতানী, ৫. মাওলানা ফখরুদ্দিন জাররাদী, ৬. মাওলানা আলা উদ্দিন নীলি, ৭. মাওলানা বোরহান উদ্দীন ঘরীব, ৮. মাওলানা ওয়াজিহ্ উদ্দিন ইউসুফ, ৯. মাওলানা সিরাজ উদ্দিন ওসমান (আখি সিরাজ হিসেবে খ্যাত)। তিনি বাংলার অধিবাসী ছিলেন। শেখ নিজাম (র.) তাঁকে ভারতের দর্পণ (Mirror of India) নামে ডাকতেন। ১০. মাওলানা শিহাব উদ্দিন এবং ১১. কাজী মুহিউদ্দিন কাসানী।

উপর্যুক্ত খলীফাবৃন্দের সংক্ষিপ্ত জীবনী:

১. মাওলানা সামছুদ্দিন ইয়াহিয়া ছাত্র জীবনে শেখ নিজাম (র.)'র সিলসিলায় ভর্তি হন। তিনি শেখ নিজাম (র.)'র জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় মুগ্ধ হয়ে যান এবং তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর পীরের ন্যায় অত্যন্ত সাদাসিধে জীবন যাপন করতেন। তিনি শেখ নিজাম (র.) থেকে খেলাফত লাভ করলেও তিনি খুব স্বল্প সংখ্যক লোককে বায়াত করান। দর্শনার্থীরা যে সকল নজর-নেয়াজ আনতেন তা তিনি দর্শনার্থীদের মধ্যে বন্টন করে দিতেন এবং নিজের জন্য কিছু রাখতেন না। তাঁর ছাত্র নাছিরুদ্দিন চেরাগ লিখেছেন: "আমি জ্ঞানকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমাকে সত্য করে বলো কে তোমাকে পুনর্জীবন দিয়েছে? জ্ঞান উত্তর দিল, সামছুদ্দিন ইয়াহিয়া।"

সামছুদ্দিন ইয়াহিয়া 'মাশায়িক উল আনওয়ার' গ্রন্থের একটি পর্যালোচনা লিখেছেন। সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক তাঁকে রাজদরবারে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, "আপনার মত এত বড় পণ্ডিত এখানে বসে কী করছেন?" সুলতান তাঁকে কাশ্মীরে গিয়ে ইসলাম প্রচারে কাজ করার জন্য নির্দেশ দিলেন। সুলতান তাঁকে কাশ্মীরে নিয়ে যাবার জন্য কয়েকজন সহকারীও তাঁর সাথে দেন। কাশ্মীর থেকে সামছুদ্দিন ইয়াহিয়া বাড়িতে ফিরে আসেন এবং বলেন যে শেখ নিজাম (র.) তাঁকে স্বপ্নে দিল্লীতে চলে আসার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি দারুণ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তাঁর বুকে একটি ফোঁড়া দেখা দেয়। সুলতান মনে করলেন যে, এটা কাশ্মীর থেকে চলে আসার জন্য তাঁর একটি অজুহাত মাত্র। সুলতান তাঁকে রাজদরবারে ডেকে পাঠালেন এবং স্বচক্ষে তাঁর ফোঁড়া দেখে তাঁর বক্তব্য বিশ্বাস করলেন। এর কয়েকদিন পরে তিনি ওফাতপ্রাপ্ত হন এবং চবুৎরাহ্-ই-ইয়ারান (Chabutrah-i-yaran) কবরস্থানে সমাহিত হন।

২. শেখ নাছির উদ্দিন চেরাগ শেখ নিজাম (র.)'র একজন বিশিষ্ট খলীফা ছিলেন এবং তাঁর সিলসিলাহ্ বিস্তারের কাজে বিশেষ অবদান রাখেন। তাঁর দরবার শেখ নিজাম (র.)'র দরবারের মতই স্বর্গীয় আমেজে পূর্ণ ছিল বলে আমির খুরদ বর্ণনা করেন। সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক যখন ঈর্ষান্বিতভাবে ইবনে তাইমিয়ার আদর্শ প্রচার করছিলেন, তখন তিনি সুফি প্রতিষ্ঠানগুলোকে মহানবী (দ.)'র সুন্নাহর সাথে পরিপূর্ণভাবে সম্পৃক্ত করে সমালোচকদের সমালোচনা থেকে রক্ষা করেন। তিনি ঘোষণা করেন, "কুরআন-হাদীস কর্তৃক সমর্থিত নয় পীরের এমন কোন শিক্ষা গ্রহণ করা কারো জন্য বাধ্যতামূলক নয়।"

শেখ নাছিরুদ্দিন চেরাগ আওয়াধের একটি ধনী বণিক পরিবারের সন্তান ছিলেন। শেখ নিজাম (র.)'র সুনাম শুনে তিনি দিল্লীতে আসেন এবং তাঁর সিলসিলায় ভর্তি হন। আওয়াধের নির্জন জঙ্গলে তিনি সাধনায় অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি পুনরায় জঙ্গলে গিয়ে সাধনা করার জন্য আমির খসরুর মাধ্যমে শেখ নিজাম (র.)'র অনুমতি চাইলেন। শেখ নিজাম (র.) বললেন, "তাকে বল, সে যেন সমাজে বসবাস করে এবং সমাজের মানুষের ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করে।"

সুতরাং তিনি দিল্লীতে অবস্থান করতে বাধ্য হলেন। শেখ নিজাম (র.) ওফাতের পর সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের হাতে তিনি অনেক যাতনা ভোগ করেন। সুলতান চাইলেন যে, সুফিরা যেন তাঁর কথামত বিভিন্ন স্থানে বসবাস করে। কিন্তু শেখ নিজাম (র.) কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশের সাথে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিলনা। ফলে নাছিরুদ্দিন চেরাগ তা মানলেন না। তিনি তাঁর নীতিতে অটল থাকলেন। এজন্য তাঁকে অকথ্য নির্যাতন ভোগ করতে হয়। ৭৫৭ হিজরির ১৮ই রমজান তারিখে তিনি ওফাতপ্রাপ্ত হন।

৩. শেখ কুতুব উদ্দিন মোনাওয়ার হচ্ছেন হাঁচির শেখ জামাল উদ্দিনের পৌত্র। তাঁর পূর্ব পুরুষেরা যেখানে বাস করতেন তিনি তথায় এক নির্জন কোণায় বাস করতেন। জুমার নামায পড়া কিংবা বড়দের কবর জেয়ারত করা ছাড়া তিনি আর কোন সময় খানকাহ্‌র বাহির হতেন না। শেখ নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.) তাঁকে 'আওয়ারিফ উল মারিফ' নামক গ্রন্থের একটি কপি দিয়েছিলেন যা তিনি তাঁর পিতামহ থেকে পেয়েছিলেন এবং তাঁর পিতামহ তা পেয়েছিলেন শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জেশকর (র.)'র নিকট থেকে। কাজী কামাল উদ্দিন সদর-ই-জাহানের মাধ্যমে সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক তাঁর জন্য দু'টো গ্রামের বরাদ্দ পত্র পাঠিয়েছিলেন। তিনি সদর-ই-জাহানকে বুঝালেন যে, এ বরাদ্দ গ্রহণ করা তাঁর উচিৎ হবেনা, যেহেতু এটা গ্রহণ করলে তাঁর পূর্বসূরীদের আদর্শ থেকে তাঁর বিচ্যুতি ঘটবে। সদর-ই-জাহান তাঁর অসম্মতির খবরটি অত্যন্ত বিনীতভাবে সুলতানকে জানালেন যাতে সুলতান রাগান্বিত না হন। এরপর একদা সুলতান হাঁচির পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি শেখ কুতুব উদ্দিনকে ডেকে পাঠালেন, কিন্তু শেখ কুতুব উদ্দিন সুলতানের সাথে দেখা করতে আসার পূর্বেই হাঁচি ত্যাগ করলেন। অবশেষে দিল্লীতে যখন উভয়ের দেখা হল তখন সুলতান অভিযোগ করলেন যে, শেখ কুতুব উদ্দিন তাঁর সাথে হাঁচিতে দেখা না করে তাঁকে অসম্মান করেছেন। শেখ কুতুব উদ্দিন এত বিনয়ের সাথে বিষয়টি ব্যাখ্যা করলেন যে, সুলতান তাতে অত্যন্ত খুশী হলেন এবং তাঁর সাথে করমর্দন করলেন। শেখ কুতুব উদ্দিন সুলতানের হাত এত সুদৃঢ়ভাবে ধরে রাখলেন যে, তাতে সুলতান তাঁর প্রতি কুতুব উদ্দিনের আন্তরিকতা ও আস্থা দেখে মুগ্ধ হলেন।

এরপর সুলতান রাজ দরবারে ফিরে গিয়ে ভাবী সুলতান ফিরোজ শাহ্ এবং জিয়াউদ্দিন বারনীর মাধ্যমে এক লাখ টাকা (Tanka) শেখ কুতুব উদ্দিনের জন্য পাঠান। বারবার অনুরোধ করায় কুতুব উদ্দিন মাত্র দুই হাজার টাকা গ্রহণ করেন এবং এ টাকার আধিকাংশ তিনি শেখ নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.) ও খাজা কুতুব উদ্দিন বখতিয়ার কাকী (র.)'র মাজার নির্মাণে ব্যয় করেন এবং কিছু টাকা শেখ নাছিরুদ্দিন চেরাগকে উপহার দেন। ৭৫৭ হিজরীর ১৬ জিলক্বদ তিনি ওফাত প্রাপ্ত হন।

৪. মাওলানা হুসাম উদ্দিন মুলতানী ফিকাহ্ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। বেশিরভাগ হাদীস তাঁর মুখস্থ ছিল। তিনি 'কুতুল কুলুব' ও 'এহ্ইয়াউ উলুমিদ্দিন' গ্রন্থের ওপর অভিজ্ঞ ছিলেন। জামাল কিয়াম উদ্দিনের মতে, তাঁর মত পণ্ডিত দিল্লীতে সে সময়ে খুব বেশি ছিলনা। শেখ নিজাম

(র.) তাঁকে বস্তুগত আকর্ষণ পরিত্যাগ করার জন্য উপদেশ দিতেন। তিনি শহরের বাসা ছেড়ে কোন এক যায়গায় নদীর তীরে বসবাসের জন্য শেখ নিজাম (র.)'র অনুমতি প্রার্থনা করেন। শেখ নিজাম (র.) বলেন, "না! তুমি শহর ছেড়ে যাবেনা। তুমি শহরে বাস করবে এবং অন্যরা যেভাবে বাস করে, তুমিও সেভাবে শহরে থাকবে।" মুহাম্মদ বিন তুঘলক যখন ওলামা ও মশায়েখদেরকে জোর পূর্বক দিল্লী থেকে দিওগীর পাঠাবার প্রকল্প হাতে নিলেন, তখন তিনি গুজরাটে চলে গেলেন। তিনি ৭৩৬ হিজরির ৮ জিলক্বদ ওফাত প্রাপ্ত হন। তাঁকে পত্তনে (Pattan) দাফন করা হয়।

৫. মাওলানা ফখরুদ্দিন জাররাদী একজন ধার্মিক ও বিদগ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। সুলতান গিয়াস উদ্দিন তুঘলক যখন ওলামাদের প্রভাবে সেমা মাহফিলের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন, তখন তিনি সেমা মাহফিলের পক্ষে দুটি লিফলেট ছাড়েন। গিয়াস উদ্দিন তুঘলক এর বৈধতা যাছাইয়ের জন্য একটি ওলামা সম্মেলন ডাকেন। মুহাম্মদ বিন তুঘলকের সাথে মাওলানা ফখরুদ্দিন জাররাদীর বিতর্ক মীর খুরদ বিস্তারিতভাবে রেকর্ড করেন। সুলতান তাঁকে তাঁর সামনে ডাকেন এবং বললেন যে, তিনি মঙ্গোলীয়দের বিরুদ্ধে জেহাদ করতে চান এবং এতে তাঁর সহযোগিতা চান। মাওলানা জাররাদী বললেন, "ইনশা আল্লাহ্!" সুলতান বললেন, "এটা সিদ্ধান্তহীনতা যা সন্দেহাতীত নয় এরূপ বক্তব্য।" সুলতান তখন জাররাদীকে খাবার পরিবেশন করতে বললেন এবং তিনি নিজ হাতে নিজের থালা থেকে তাঁকে মাংস পরিবেশন করলেন। জাররাদী অনিচ্ছা সত্ত্বেও সামান্য কিছু খেলেন। সুলতান এক থলে টাকা এবং কিছু কাপড় ফখরুদ্দিন জাররাদী, শেখ নাছিরুদ্দিন মাহমুদ ও শেখ সামছুদ্দিন ইয়াহিয়াকে (যাঁরা সবাই ওই সম্মেলনে আহূত হয়েছিলেন) দিলেন। কুতুব উদ্দিন দবির জাররাদীর ছাত্র ছিলেন এবং তিনি তথায় উপস্থিত ছিলেন। কুতুব উদ্দিন দবির জাররাদীকে অতিশয় সম্মান দেখালেন, তাঁর জুতা এবং টাকার থলে বহন করলেন। সুলতান এতে অসন্তুষ্ট হলেন এবং তাকে শাস্তি দেবার ভয় দেখালেন। মাওলানা জাররাদী এরপরে দৌলতাবাদে হিজরত করলেন এবং কাবা শরিফে হজ্ব করতে গেলেন। হজ্ব সম্পাদন শেষে তিনি বাগদাদে গেলেন এবং সেখানে সুধীমহলের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেন। তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনায় সবাই মুগ্ধ ও অভিভূত হন। দেশে ফেরার পথে জাহাজ ডুবিতে তিনি ওফাত প্রাপ্ত হন।

৬. মাওলানা আলা উদ্দিন নীলি ছিলেন একজন হাফেজ-ই-কুরআন। তিনি ধর্মীয় বিজ্ঞানে খুবই অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি প্রখ্যাত বাগ্মী ছিলেন এবং কশ্‌ফ বিষয়ে তাঁর জ্ঞানগর্ভ ভাষণ সকল মহল কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছিল। নামাযে তাঁর কুরআন তেলাওয়াত শুনে শেখ নিজাম (র.) অতিশয় মুগ্ধ হতেন। একদিন শেখ নিজাম (র.) তাঁর কুরআন তেলাওয়াত শুনে এত বেশি মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, শেখ নিজাম (র.) তাঁর নিজের জায়নামায তাঁকে দিয়ে দিয়েছিলেন। "ফাওয়ায়িদ উল ফুয়াদ' গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি তিনি নিজহাতে টাইপ করেন এবং প্রায়শ এ গ্রন্থটি আবৃত্তি করতেন। ইবনে বতুতা তাঁর শুক্রবারের খুত্‌বা শুনতেন। তাঁর

সম্পর্কে ইবনে বতুতা বলেন, "যাঁরা তাঁর খুত্‌বা শুনতেন তাঁদের বেশিরভাগ লোক তাঁর হাত ধরে অনুতপ্ত হতেন, তাঁদের মাথা মুড়িয়ে ফেলতেন এবং জজ্‌বাতি হালতে নাচতে থাকতেন।" তিনি কোন লোককে মুরীদ করেননি অর্থাৎ তাঁর কোন শিষ্য ছিলনা। তাঁকে 'চবুৎরাহ-ই-ইয়ারান' (Chabutrah-i-yaran) এ সমাহিত করা হয়।

৭. মাওলানা বোরহান উদ্দিন ঘরীব সেমা মাহফিলের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। সেমা মাহফিলে তাঁর শিষ্যরা একটি বিশেষ ভঙ্গীতে নাচতে থাকতেন, যে ভঙ্গীকে বোরহানী ভঙ্গী (Burhani way of dancing) বলা হতো। শেখ নাছির উদ্দিন চেরাগ, আমির খসরু এবং আমির হাসান তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন এবং তাঁকে অত্যন্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন। মুহাম্মদ বিন তুঘলকের আদেশে তিনি দিওগীর হিজরত করেন। দাক্ষিণাত্যে চিশ্‌তীয়া ত্বরিকা প্রচারে তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর শিষ্যরা 'আহসানুল আকওয়াল', 'নাফাইস উল আনফাস', 'শামাইল উল আতকিয়া', 'ঘারাইব উল কারামত' প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁর কথাবার্তা সংকলিত করেন। এ সকল কথোপকথনে দাক্ষিণাত্যে শেখ নিজাম (র)'র আদর্শ প্রচারে তাঁর উৎকণ্ঠার কথা প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁকে দৌলতাবাদে সমাহিত করা হয়।

৮. মাওলানা ওয়াজিহ উদ্দিন ইউসুফ শহুরে সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। আলাউদ্দিন খলজির সেনাবাহিনী চাঁন্দেরী পৌঁছার পূর্বেই শেখ নিজাম (র.) তাঁকে চাঁন্দেরী পাঠান। চাঁন্দেরী যখন খলজি সাম্রাজ্যের সাথে যুক্ত হল, তখন অনেক সৈন্য যাঁরা কোন না কোনভাবে শেখ নিজাম (র.)'র সাথে যুক্ত ছিলেন, তাঁরা মাওলানা ওয়াজিহ উদ্দিন ইউসুফ এর আধ্যাত্মিক নির্দেশনা ও ফয়েজ লাভের জন্য তাঁর দরবারে সমবেত হতেন। তাঁকে চাঁন্দেরীতে সমাহিত করা হয়।

৯. মাওলানা সিরাজ উদ্দিন উসমান (যিনি 'আখি সিরাজ' নামে সমধিক জনপ্রিয়) বাংলার অধিবাসী ছিলেন এবং শেখ নিজাম (র.)'র আধ্যাত্মিক যশ ও খ্যাতিতে আকৃষ্ট হয়ে দিল্লীতে আসেন। শেখ নিজাম (র.) তাঁকে 'ভারতের আয়না' বলতেন। প্রত্যেক বছর তাঁর মাকে দেখতে তিনি লখনৌটি (Lakhnauti) যেতেন। তিনি জামাত খানার এক কোণে একাকী থাকতেন এবং কিছু বই ও কাগজ ছাড়া তাঁর আর কোন সম্পদ ছিলনা। প্রাথমিকভাবে খেলাফত দানের জন্য তাঁর নাম যখন প্রস্তাব করা হয়, তখন শেখ নিজাম (র.) তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা আধ্যাত্মিক কাজের জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ করেনা বলে অভিমত প্রকাশ করেন। ফলে মাওলানা ফখরুদ্দিন জাররাদী তাঁকে শিক্ষাদানের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন এবং তাঁর জন্য 'তফসির-ই-ইসমানী' নামক গ্রন্থ রচনা করলেন। যখন লোকজনকে দৌলতাবাদে হিজরত করার জন্য বাধ্য করা হল, তখন আখি সিরাজ নিজের শহর লখনৌটিতে চলে গেলেন। যাবার সময় সাথে করে শেখ নিজাম (র.) কর্তৃক ওয়াক্‌ফ করা লাইব্রেরী থেকে কিছু বই নিয়ে গেলেন। তিনি বাংলা এবং বিহারে চিশ্‌তীয়া ত্বরিকাকে জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে অবদান রাখেন এবং সকল শ্রেণীর লোক তাঁর কাছ থেকে আধ্যাত্মিক ফয়েজ নিতে আসতেন। তাঁকে পাণ্ডুয়াতে সমাহিত করা হয়।

১০. মাওলানা শিহাব উদ্দিন জামাত খানা মসজিদের ইমাম ছিলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর অত্যন্ত মধুর ছিল এবং নামাযে তাঁর কুরআন তেলাওয়াত শুনে মোক্তাদীরা ভাবে উদ্বেলিত হয়ে যেত। সম্ভবত মুহাম্মদ বিন তুঘলকের 'জনতা খেদাও' (mass exodus) অভিযানের সময় তিনি দৌলতাবাদ চলে যান। কিন্তু পরে তিনি আবার দিল্লীতে চলে আসেন এবং তথায় ওফাত প্রাপ্ত হন।

১১. কাজী মুহিউদ্দিন কাসানী সম্পর্কে আমির খুরদ 'ইয়ারান-ই-আলা' (Yaran-i-Ala অর্থাৎ অতি উচ্চ স্তরের শিষ্য) শিরোনামের একটি পুস্তকে তাঁর সম্পর্কে বর্ণনা করেন। শেখ নিজাম (র.) তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন এবং তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য উঠে দাঁড়াতেন। তিনি শেখ নিজাম (র.)'র হাদীসের বয়ান শুনার জন্য অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। শেখ নিজাম (র.)'র জীবদ্দশায় তিনি ওফাত প্রাপ্ত হন।

শেখ নিজাম (র.)'র শিষ্যদের মধ্যে অলি, বিশিষ্ট পণ্ডিত, বুদ্ধিজীবী, কবি, গায়ক, গীতিকার, ঐতিহাসিক প্রভৃতি শ্রেণীর লোকের সমাহার ছিল। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক বারনী (Barani) এবং প্রখ্যাত ফার্সি কবি আমির খসরু শেখ নিজাম (র.)'র বিশিষ্ট শিষ্য ছিলেন। শেখ নিজাম (র.) তাঁদেরকে অত্যধিক স্নেহ করতেন, কিন্তু তাঁদেরকে খেলাফত দান করেননি। কারণ তাঁরা আধ্যাত্মিক বিষয়ে মানুষকে হেদায়েতের জন্য সম্পূর্ণরূপে মনোনিবেশ করার জন্য প্রয়োজনীয় সময় দিতে সক্ষম ছিলেন না। শেখ নিজাম (র.) তাঁদেরকে রাজ দরবারের সাথে সংস্রব ত্যাগ করতে কখনও বলেন নি, যেহেতু রাজ দরবারের সাথে সম্পর্ক না রাখার শর্ত কেবলমাত্র খলীফাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। একদা আমির খসরু সেমা মাহফিলে অজ্‌দ করতে করতে দাঁড়িয়ে যান এবং তাঁর হাত দু'টো ওপরের দিকে তুলে নাচতে থাকেন। শেখ নিজাম (র.) তাঁকে কাছে ডেকে আনলেন এবং বললেন, "তুমি যেহেতু পার্থিব বিষয়ের সাথে জড়িত, তোমার হাতকে এভাবে ওপরে তোলার জন্য তোমাকে অনুমতি দেওয়া হলনা।" শেখ নিজাম (র.) আমির খসরুকে 'আমার তুর্কী' বলে ডাকতেন এবং তাঁর সম্পর্কে কবিতাও রচনা করেছেন।

শেখ নিজাম (র.) প্রায়শ বলতেন, "কোন কোন সময় এমন মুহূর্ত আসে যখন আমি নিজেকে নিয়ে বিরক্ত বোধ করি, কিন্তু আমির খসরুকে নিয়ে আমি কোনদিন বিরক্ত বোধ করিনি।" শেখ নিজাম (র.)'র অন্যান্য শিষ্যরাও আমির খসরুর সাথে বিভিন্ন আধ্যাত্মিক বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন। শেখ নাসিরুদ্দিন চেরাগ নির্জন স্থানে একাকী বসবাসের জন্য আমির খসরুর মাধ্যমে শেখ নিজাম (র.)'র অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন। শেখ নিজাম (র.) যখন মাওলানা বোরহান উদ্দিন ঘরীবের সাথে কোন এক সময় অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন, তখন আমির খসরু মাওলানা বোরহান উদ্দিন ঘরীবকে ক্ষমা করে দেয়ার জন্য শেখ নিজাম (র.)কে রাজী করিয়েছিলেন। আমির হাসান সিজ্‌জীর সাহিত্যের প্রতি ঝোঁক ছিল এবং শেখ নিজাম (র.)'র প্রতি তিনি অনুরক্ত ছিলেন। শেখ নিজাম (র.) তাঁর সাহিত্য চর্চাকে পছন্দ করতেন

এবং ভালবাসতেন। শেখ নিজাম (র.)'র অনেক কথাবার্তা রেকর্ড করার জন্য তাঁকে অনুমতি দিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁকে খেলাফত দেননি। কারণ তিনি সেনাবাহিনীতে চাকুরী করতেন।

জিয়াউদ্দিন বারনী একজন অভিজাত পরিবারে সন্তান ছিলেন এবং দিল্লীর সুলতানদের সাথে তাঁর পরিবারের আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বাকপটু, বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ এবং দিল্লীর সুধী সমাজে অত্যন্ত সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। তিনি প্রায়শ শেখ নিজাম (র.)'র সান্নিধ্যে কাটাতেন, কিন্তু শেখ নিজাম (র.) তাঁকে খেলাফত প্রদান করেননি। ফিরোজ শাহ্ তুঘলকের রাজত্বকালে তাঁর ভাগ্যের বিপর্যয় ঘটে এবং তিনি তাঁর মান-সম্মান এবং সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হন। জীবনের শেষ সময়টুকু তিনি শেখ নিজাম (র.)'র মাজার শরিফে অতিবাহিত করেছেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়

হযরত শেখ নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.)'র জীবন ও কর্মের সামগ্রিক মূল্যায়ন

এক. শেখ নিজাম (র.)দক্ষিণ এশিয়ার একজন অত্যন্ত আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ধর্মীয় বিজ্ঞান, বিশেষ করে কুরআন ও হাদীসে তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি ছিলেন অতি উচ্চ মার্গের একজন অলি যাঁর চেহারা মোবারকে ছিল পবিত্র আধ্যাত্মিকতার ছাপ। তিনি ছিলেন মানব প্রেমিক, নির্যাতিত, নিপীড়িত, লাঞ্ছিত, নিগৃহীত, অসহায়, বঞ্চিত, ভাগ্যাহত, হতদরিদ্র ও দুর্বলের আশ্রয়। তিনি অহিংসায় বিশ্বাস করতেন এবং মন্দকে ভাল দিয়ে বিতাড়িত করতেন। তিনি ছিলেন ধর্মীয় ঐতিহ্য ও নৈতিকতার উজ্জ্বল প্রতীক। জামালীর মতে, "তাঁর আভ্যন্তরীণ জীবনে (Inner life) তিনি ছিলেন বায়েজিদের মত এবং ধর্মের বাহ্যিক চর্চার ক্ষেত্রে ছিলেন আবু হানিফার মত।" (সিয়ার-উল-আওলিয়া, পৃ. ৫৯)। প্রায় অর্ধ শতাব্দী যাবৎ তাঁর দিল্লীর খানকাহ্ ছিল আধ্যাত্মিক সাধনা ও শান্তির কেন্দ্র। তাঁর জীবনের মিশন ছিল খোদার সাথে মানুষের সংযোগ স্থাপন করা এবং একটা বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গীর বিকাশ সাধন করা যাতে করে মানুষ সকল প্রকার সংকীর্ণতা ও হীনমন্যতার ঊর্ধ্বে উঠতে সক্ষম হয়। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ধর্মের মহান নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নৈতিকভাবে স্বায়ত্তশাসিত ব্যক্তিত্ব হিসেবে তাঁর শিষ্যদেরকে গড়ে তোলার কোন বিকল্প নেই। মানবতার সাথে সংশ্লিষ্ট ও মানবকল্যাণে নিবেদিত ধর্মীয় বিশ্বাস ও ধর্ম চর্চাই আসল ধর্ম– তাঁর এ ধারণা ধর্মীয় সাধনায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনে। তাঁর মানবদরদী চিন্তা-ভাবনা ও আচার-আচরণ তাঁকে সকল মানুষের ভালবাসার পাত্র বানিয়েছে। তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর যশ-খ্যাতি সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে এবং লোকজন পঙ্গপালের মত তাঁর দোয়া ও ফয়েজ নেবার জন্য তাঁর দরবারে ছুটে আসে। তাঁর দরবারে আশরাফ-আতরাফ, ধনী-দরিদ্র, গ্রাম্য-শহুরে, হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান, রাজা-প্রজা সকল শ্রেণীর দর্শনার্থীর ভিড় ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন, সবাই আল্লাহ্‌র সৃষ্টি এবং আল্লাহ্ সবাইকে ভালবাসেন। শিক্ষিত-অশিক্ষিত, শহরবাসী-গ্রামবাসী, সৈনিক-যোদ্ধা, সম্ভ্রান্ত-অসম্ভ্রান্ত, মুক্তমানুষ-ক্রীতদাস সবাইকে শিষ্যত্বে বরণ করেছেন তিনি। কোন শিষ্য পাপ করলে তা শেখ নিজাম (র.)'র সামনে স্বীকার করতেন এবং নুতন করে পাপ না করার জন্য শপথ নবায়ন করতেন। সাধারণ জনগণ ধর্ম ও নামাযের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন।

নারী-পুরুষ, যুবা-বৃদ্ধ, দোকানদার-চাকুরীজীবী, ছেলে মেয়ে, ক্রীতদাস-চাকর সবাই তাঁর সাথে নামাযের জামাতে সামিল হতে আসতেন।

বেশিরভাগ দর্শনার্থী শেখ নিজাম (র.)'র সাথে নিয়মিত চাশ্‌ত ও ইশরাকের নামায পড়তেন। তাঁর শিষ্যদের উদ্যোগে দিল্লী শহর থেকে গিয়াসপুর পর্যন্ত রাস্তার পাশে কিছুদূর অন্তর অসংখ্য সরাইখানা (Platform) নির্মাণ করা হয়, কূপ খনন করা হয়, সরাইখানায় পথিকদের জন্য পানিভর্তি কলস রাখার ব্যবস্থা করা হয়। প্রতিটি সরাই খানায় কার্পেট বিছিয়ে রাখা হয় এবং একজন খাদেম ও হাফেজ রাখা হয় যাতে শেখ নিজাম (র.)'র সাথে দেখা করার উদ্দেশ্যে ভ্রমণরত যাত্রী সাধারণ বিশ্রাম নিতে পারে এবং সকল প্রকার নফল ও ফরজ নামায আদায় করতে পারে। শেখ নিজাম (র.)'র আহ্বানে ভক্তরা এসব জনহিতকর কাজ করেছেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে। শেখ নিজাম (র.)'র প্রভাবে মানুষ সকল প্রকার পাপজনিত কথাবার্তা পরিত্যাগ করেছে। সকল মানুষের মাঝে ছিল একটিই কথা– চাশ্‌ত, আওয়াবীন, তাহাজ্জুদের নামায পড়তে হবে। নুতন শিষ্যরা পুরাতন শিষ্যদেরকে জিজ্ঞাসা করত চাশ্‌তের নামায কয় রাকাত? আওয়াবীনের নামায কয় রাকাত? ইশরাকের নামায কয় রাকাত? প্রতি রাকাতে কুরআনের কোন সূরা পড়ব? প্রতি নামাযের পরে কি মুনাজাত করতে হবে? শেখ নিজাম (র.) প্রতি ওয়াক্তে কয় রাকাত নামায পড়েন? প্রত্যেক রাকাতে তিনি কুরআনের কোন সূরা পড়েন? শেখ ফরিদ (র.) ও শেখ বখতিয়ার (র.)'র নামাযের রীতি কিরূপ ছিল? শেখ নিজাম (র.) মহানবী (দ.)'র ওপর কী কী দরূদ পড়েন? তারা রোজা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করত, কীভাবে আহার হ্রাস করা যায় তা' জানতে চাইত। অনেকে কুরআন মুখস্থ করত। নুতন শিষ্যদেরকে দেখাশুনার ভার পড়ত পুরাতন শিষ্যদের ওপর। পুরাতন শিষ্যদের কাজ ছিল নামায পড়া, দুনিয়ার চিন্তা বাদ দিয়ে আল্লাহ্‌র জিকির করা, ওলী-বুজুর্গদের জীবনী পড়া, আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের জন্য সাধনা করা প্রভৃতি। নফল নামাযে শিষ্যরা এত বেশি অনুরক্ত ছিল যে, তা দেখে সুলতানের দরবারের পদস্থ রাজ কর্মকর্তা কর্মচারীরাও শেখ নিজাম (র.)'র শিষ্যত্ব বরণ করে নফল নামায ও ইবাদতে মশগুল থাকত। তারা চাশ্‌ত ও ইশরাকের নামায পড়ত এবং প্রত্যেক চান্দ্র মাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখে আইয়ামে বিজের রোজা এবং জিলহজ্ব মাসের প্রথম ১০ দিন নফল রোজা রাখত। প্রতি ২০ দিন বা ১ মাস অন্তর শহরের বিভিন্ন জায়গায় ধর্মপ্রাণ ভক্তদে সেমা মাহফিল বসত এবং আধ্যাত্মিক গানের কথা ও সুরের মূর্ছনায় উদ্বেলিত হয়ে ভক্তরা খোদার প্রেমে সিক্ত হয়ে কেঁদে বুক ভাসিয়ে ফেলত। শেখ নিজাম (র.)'র বেশিরভাগ শিষ্য রমজান মাসের শুক্রবারে এবং হজ্বের দিনগুলোতে সারা রাত দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতেন। বেশিরভাগ সিনিয়র ও বয়স্ক শিষ্যরা রাতের তিন-চতুর্থাংশ সময় দাঁড়িয়ে নামায পড়তেন এবং এশার নামাযের অজু দিয়ে ফজরের নামায আদায় করতেন।

এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বেশিরভাগ শিষ্য আধ্যাত্মিকতার উচ্চ সোপানে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। শেখ নিজাম (র.)'র প্রভাবে বেশিরভাগ রাজ্যে ভারতের অনেক মুসলমান সুফিবাদ, নামায, মোরাকাবা-মোশাহেদার প্রতি আসক্ত হয়েছেন এবং পার্থিব জীবনের কামনা-বাসনার প্রতি

নিরাসক্ত হয়েছেন। মানুষের অন্তর যখন ভাল কর্ম ও নেক আমলের দ্বারা আলোকিত হয়, তখন সে মদ, জুয়া এবং অন্যান্য হারাম কাজ থেকে বিরত হয়ে যায়। তখন পরস্পরের প্রতি পরস্পরের শ্রদ্ধাবোধ বেড়ে যায় এবং আল্লাহ্র ভয়ে ভীত হয়ে সুদ, ঘুষ, মিথ্যা কথা বলা, ওজনে কম দেওয়া এবং অজ্ঞদেরকে প্রতারণা করা প্রভৃতি অনৈতিক কাজ থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরে সরে যায়। বেশিরভাগ পণ্ডিত ও বিদ্বান ব্যক্তি শেখ নিজাম (র.)'র সংস্পর্শে এসে সুফিবাদের প্রতি আসক্ত ও স্রষ্টানুরাগী হয়ে উঠেন। 'কুত-উল-কুলুব', 'এহিয়া উল উলুম' এবং এর অনুবাদ গ্রন্থ 'আওয়ারিফ', 'কাশ্‌ফ-উল-মাহজুব', 'শরহ-ই-তায়ার্‌রুখ', 'রিসালাহ্-ই-কুশায়রী', 'মীরসাদুল ইবাদ', 'মকতুবাত-ই-আইনুল কুজ্জাত', 'লাওয়াইহ্', 'লাওয়ামা' (কাজী হামিদ উদ্দিন নাগোরী প্রণীত) প্রভৃতি সুধী সমাজে অত্যন্ত সমাদৃত হয় এবং এ সকল পুস্তক পড়ার প্রতি সুধী মহল অতিশয় আগ্রহী হয়ে উঠে তাঁদের মধ্যে সুফিবাদী ভাবধারা বিকাশের ফলে। 'ফাওয়াইদ উল ফুয়াদ' (আমীর হাসান রচিত) গ্রন্থে শেখ নিজাম (র.)'র বাণী সংকলিত হয়েছে বিধায় এ গ্রন্থটির চাহিদা সুধীমহলে সীমাহিনভাবে বেড়ে যায়। ক্রেতা সাধারণ বইয়ের দোকানে সুফিবাদের ওপর বই পুস্তক হন্যে হয়ে খুঁজতে থাকে। প্রত্যেক আশেক-ভক্তের রুমালের সাথে মেছওয়াক কিংবা টুথব্রাশ কিংবা চিরুনী বাঁধা থাকত। সবাই মেছওয়াক করে কিংবা দাঁত মেজে অজু করত এবং চুল আঁচড়াতো অজু সম্পাদনের পর। অতঃপর নফল নামাযে দাঁড়িয়ে যেত। ফলে অজুর চাহিদা এত বেশি বেড়ে যায় যে, পানির দাম ও অজুর পানি রাখার জন্য মাটির পাত্রের দাম অতিরিক্ত বেড়ে যায়। এক কথায়, আল্লাহ্ তায়ালা শেখ নিজাম (র.) কে শেখ জোনায়েদ (র.) এবং শেখ বায়েজিদ (র.)'র উত্তরসূরী হিসেবে ওই সময়ের জন্য দুনিয়াতে পাঠিয়েছিলেন। সুফিবাদের পথে মানুষকে পরিচালিত করার জন্য এবং সুফিবাদে মানুষকে দীক্ষিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল যোগ্যতা দিয়ে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে এ ধরাধামে পাঠিয়ে ছিলেন।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষের দিকে শেখ নিজাম (র.)'র সুফি প্রতিষ্ঠানসমূহ সাফল্য ও গৌরবের সর্বোচ্চ শিখরে উপনীত হয়েছিল। সুলতান আলাউদ্দিন খলজীর (১২৯৬-১৩১৬ খ্রি.) দুই দশকের শাসনকালে শেখ নিজাম (র.)'র আধ্যাত্মিক কর্মকাণ্ড তুঙ্গে উঠে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সুলতান সাম্রাজ্যবাদী অভিযানের অংশ হিসেবে মানুষের সামগ্রিক জীবনকে (সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয়) নিয়ন্ত্রণ করার জন্য উদ্বিগ্ন ছিলেন এবং আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে শেখ নিজাম (র.) সফল মানুষের জন্য আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণের দ্বার উন্মুক্ত করেন যাতে করে সুফি আন্দোলন গণআন্দোলনে রূপান্তরিত হয়।

একদিন জিয়াউদ্দিন বারনী দেখতে পেলেন যে, শেখ নিজাম (র.) কয়েক ঘন্টা যাবৎ বিরতিহীন অবস্থায় সকল শ্রেণীর লোককে বায়াত করছেন। তিনি শেখ নিজাম (র.)কে তাঁর ত্বরিকায় এভাবে গণভর্তির কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। শেখ নিজাম (র.) স্বয়ং তাঁকে সম্বোধন করে বললেন, "প্রত্যেক যুগের একটা নিজস্ব প্রয়োজন আছে এবং আমি যা করছি, তা সময়ের প্রয়োজনে করছি।"

শেখ নিজাম (র.)'র পূর্বে রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক কর্মকাণ্ড এরূপ প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হয়নি এবং এরূপ সমান্তরাল গতিতে চলেনি। সুলতান রাজ্য জয়ে ব্যস্ত আর সুফি সাধক শেখ নিজাম (র.) মানুষের অন্তর জয়ে ব্যস্ত। সুলতানের সেনা অভিযানের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছে শেখ নিজাম (র.)'র মানব কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড।

দুই. যশখ্যাতি ও বিচারবুদ্ধিতে অনন্য আলাউদ্দিন খলজি শক্ত হাতে রাজ্য শাসন করেছিলেন। তিনি কার্যকরভাবে ক্ষমতাকে সুসংহত করেছিলেন এবং সকল প্রতিকূল শক্তিকে দমন করে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তকে তিনি এত বেশি সুরক্ষিত করেছিলেন যে, যে দুর্ধর্ষ মঙ্গোলীয়রা প্রাচ্যের উন্নতিশীল সংস্কৃতি ধ্বংস করার জন্য তাণ্ডব চালিয়েছিল, তাদেরও তাঁর ভূখণ্ডে প্রবেশ করার পূর্বে দু'বার চিন্তা করতে হোত। তাঁর ক্ষমতা প্রদর্শনের জন্য এবং শত্রুদের মনে ভীতি ও আতঙ্ক সৃষ্টি করার জন্য তিনি ছিন্নভিন্ন (massacred) মঙ্গোলীয়দের মস্তক নিয়ে বিজয় স্তম্ভ (victory tower) নির্মাণ করেছিলেন। তিনি নিজেকে দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার বলতেন এবং তাঁর পূর্বসূরী সুলতানদের জনহিতকর কাজ, প্রশাসন এবং রাজ্য জয়ের সাফল্যকে কীভাবে অতিক্রম করা যায় সেজন্য সদা-সর্বদা তৎপর ও উদ্বিগ্ন থাকতেন। তিনি চিন্তা করতেন, যদি আইবেক এবং ইলতুত্‌মিশ কুতুব মিনার তৈরি করতে পারেন, তবে তাঁর সাফল্যকে স্মরণে রাখার জন্য আরও বড় স্তম্ভ বা মিনার তাঁকে তৈরী করতে হবে; যদি ইলতুত্‌মিশ 'হাউজি সামছি' তৈরি করতে পারেন, তবে তাঁকে অবশ্যই আরও বড় 'হাউজি আলাই' তৈরি করতে হবে। অন্যান্য সুলতানরা কেবলমাত্র উত্তর ভারতে ক্ষমতা সুসংহত করতে পেরেছিলেন, তাঁকে অবশ্যই দাক্ষিণাত্যে ও ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তাঁর পূর্বসূরীরা কৃষি প্রশাসন কাঠামো পরিবর্তনে ইচ্ছুক ছিলেন না। তিনি মধ্যস্বত্বভোগীদের উৎখাত করেন এবং কৃষকদের সাথে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেন। অন্যান্য শাসকরা জনগণের কাজকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন, তিনি মানুষের বিবেককে নিয়ন্ত্রণ করেছেন।

সুলতান আলাউদ্দিন খলজি মওজুদদার ও কালোবাজারীকে কঠোর হস্তে দমন করেছেন এবং বাজার নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম অনেক নীচে নামিয়ে এনেছিলেন। কঠোর শাস্তির বিধান চালু করায় ব্যবসায়ী ও বণিকদল সুলতান কর্তৃক নির্ধারিত দামের অতিরিক্ত দাম নিতে সাহস করতনা। চাহিদা ও যোগানের উৎস কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হোত। গ্রামীণ ও শহুরে অর্থনীতির মধ্যে 'বানজারাহ্' নিয়ন্ত্রণ, ভূমি কর আদায় এবং খুট্‌স (Khuts), মোকাদ্দমস (Muqaddams) এবং চৌধারী (chaudharis) প্রভৃতিকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সমন্বয় সাধন করা হোত। অসামাজিক উপাদানগুলোকে কঠোরভাবে দমন করা হোত। যাদুকর, জুয়াড়ী, ইবাহাতি (ibahatis), জ্যোতিষ (astrologer) প্রভৃতিকে তাদের পেশা ছেড়ে দিতে বাধ্য করা হোত এবং পেশা ছেড়ে না দিলে নির্মমভাবে ফাঁসি দেয়া হোত। পতিতাদেরকে তাদের পেশা ছেড়ে দিয়ে বিবাহ করতে বাধ্য করা হোত যা করতে সুলতান ইলতুত্‌মিশও সাহস করেননি। পতিতালয়কে নিষিদ্ধ করা হয়। রাজ কর্মচারীদের সাথে প্রজাদের সামাজিক সংযোগ নিয়ন্ত্রণ করা হয় এবং দক্ষ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন গোয়েন্দাগিরি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। বড়-ছোট, উচ্চ-নীচ, সকল স্তরের লোকের ঘরের ভিতরের ও

বাইরের এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক সকল কাজকর্ম, ঘটনা, ও কথাবার্তা সম্পর্কে সুলতান সদাসর্বদা অবহিত থাকতেন। তাঁর সফলতা দেশের সব প্রান্তসীমায় সুনিশ্চিত হয় এবং দক্ষিণাঞ্চল থেকে রাজকোষে সম্পদের প্রবাহ বহুগুণ বৃদ্ধি পায় যা ইতোপূর্বে কোন সুলতানের আমলে হয়নি।

তিন. অবশ্য দিল্লীতে একটি খানকাহ্ ছিল যা সুলতানের রাজনৈতিক সীমানার মধ্যে অবস্থিত হলেও তা দিল্লী সাম্রাজ্যের অংশ ছিলনা। বিরামহীন রাজনৈতিক ও সামরিক কর্মকাণ্ডের মাঝখানে এ খানকাহ্টি ভালবাসার মরুদ্যান হিসেবে বিদ্যমান ছিল। সুলতানের আধিপত্য এখানে বিস্তৃত হয়নি এবং এর কর্মকাণ্ডে সুলতান হস্তক্ষেপ করতে সক্ষম হননি। খানকাহ্র আশেক-ভক্তদেরকে সরকারি চাকুরী করতে কিংবা খানকাহ্র মধ্যমণি অলিয়ে কামেলকে রাজদরবারে হাজির হতে বাধ্য করা যায়নি। রাজনৈতিক জীবনের সংক্রমণ থেকে মুক্ত একটি পবিত্র আধ্যাত্মিক পরিবেশ বিদ্যমান ছিল এ খানকাহ্য়। বড় ছোট সবাই এখানে বিনম্র চিত্তে দণ্ডায়মান থাকত। সুলতানের গোয়েন্দা এখানে ঘেরাও (Gherao) করতে পারেনি। এটা একটি ভিন্ন জগৎ। এ জগতটি হল শেখ নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.)'র খানকাহ্। মানুষের নৈতিক মূল্যবোধ বিকাশের এবং মানব সেবায় উৎসর্গ করার মানসিকতা তৈরী করার মহান দায়িত্ব ও ব্রত হাতে নিয়েছিলেন শেখ নিজাম (র.)। খলজি রাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী চেতনার কার্যকর প্রতিষেধক ছিল শেখ নিজাম (র.)'র দর্শন। শেখ নিজাম (র.) বস্তুবাদী ও ভোগবাদী আকাঙ্ক্ষা নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন এবং তৃপ্তি, আত্মসম্মান ও আত্ম-সংযমের জীবনাদর্শ প্রচার করেছিলেন।

মোহর্‌রম মাসের ২৪ তারিখ, ৭১০ হিজরি, মোতাবেক ২৬শে মে, ১৩১০ ইংরেজি মালিক কাফুর অনেক যুদ্ধলব্ধ দ্রব্য সম্ভার (Booty) নিয়ে দক্ষিণের অভিযান থেকে প্রত্যাবর্তন করেন। প্রাপ্ত সম্পদসম্ভার 'ছবুৎরাহ্ নাসিরী' (Chabutrah Nasiri) তে প্রদর্শনীর (Exhibition) আয়োজন করলে সবাই এত বিশাল সম্পদসম্ভার দেখে চমকে উঠেন। প্রদর্শনীর পরের দিন (অর্থাৎ ২৫ শে মোহর্‌রম ৭১০ হি. মোতাবেক ২৭শে মে, ১৩১০ ইং) শেখ নিজাম (র.) দর্শকদের একটি সভা ডাকেন এবং বলেন যে, এ বিশাল সম্পদ জনসাধারণের কল্যাণে ব্যবহার করতে হবে। তাঁর এ জোরালো কণ্ঠে প্রদত্ত উপদেশ দিল্লীর আনাচে-কানাচে সকল মানুষের কানে পৌঁছে গেল।

সুলতান আলাউদ্দিন খলজি ছিলেন মৃত্যু শয্যায়। শেখ নিজাম (র.) তাঁর জামাত খানায় সুলতান ইলতুত্মিশের কথা তুললেন এবং বললেন যে, 'হাউজী সামছি' (Hauzi Shamsi) নির্মাণের কারণে তাঁর (ইলতুত্মিশের) নাজাত হয়েছে, কেননা এর মাধ্যমে সারা দিল্লীর মানুষ পানি পেয়েছে। শেখ নিজাম (র.) কাউকে সরাসরি নির্দেশ কিংবা উপদেশ না দিয়ে উদাহরণ বা গল্পের মাধ্যমে কোন কাজ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন। আলাউদ্দিন খলজি যখন মারা গেলেন, তখন আমির খসরু কাব্যিক ছন্দে সুলতানের সাম্রাজ্যবাদী অভিলাষকে নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করলেন:

“কেন তুমি করিলে জয় এত রাজ্য ও শহর?
মরণের পরে জুটিল তোমার শুধু সাড়ে তিন হাতের একটি কবর।”

শেখ নিজাম (র.)’র শিষ্য আমির খসরুর উপর্যুক্ত পংক্তিদ্বয়ে শেখ নিজাম (র.)’র দর্শনের সুন্দর প্রতিফলন ঘটেছে। ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বারনীর পর্যবেক্ষণে জনজীবনে শেখ নিজাম (র.)’র প্রভাব অতি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে নিম্নোক্তভাবে,

শেখ নিজাম (র.)’র শিক্ষার ফলে জনগণ থেকে পাপের পরিমাণ হ্রাস পায়। সমাজের মধ্যে একটা আধ্যাত্মিক পবিত্রতা সৃষ্টি হয়। জনগণ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধকে শ্রদ্ধা করতে শেখে। তাঁর প্রভাবে মদ, জুয়া প্রভৃতি অসামাজিক কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে যায়। সুলতান মানুষের কাজ করার স্বাধীনতা খর্ব করেছিলেন। শেখ নিজাম (র.) মানুষের স্বাধীন সত্তার বিকাশের জন্য, মানুষের আত্ম-নির্ভর ব্যক্তিত্ব ও মুক্তচিন্তার বিকাশের জন্য মানুষকে উপযুক্ত করে গড়ে তুলেছিলেন। শেখ নিজাম (র.) রাষ্ট্রের সাথে কোন সংঘর্ষে লিপ্ত হননি, তবে রাষ্ট্রকে তাঁর আত্মার ওপর হস্তক্ষেপ করতেও দেননি।

চার. শেখ নিজাম (র.) আলোর জীবন্ত প্রস্রবণ। মানুষের আলোর দিশারী। খোদার নৈকট্য লাভের জন্য আগুয়ান মানুষের নিরাপদ ও কার্যকর ঠিকানা। যে সকল শিষ্য তাঁদের হৃদয়-মনকে আলোকিত করার জন্য তাঁর সান্নিধ্যে এসেছে, তারা তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে সক্ষম হয়েছে এবং সীমাহীন ভক্তি ও শ্রদ্ধায় তাদের দেহ-মন তাঁর প্রতি উৎসর্গ করেছে। দিল্লীতে বসবাস শুরু করার কয়েক বৎসর পর একজন ভিক্ষাজীবী ভবঘুরে শেখ নিজাম (র.)’র কাছে আসল এবং কিছু আর্থিক সাহায্য চাইল। সে সময় শেখ নিজাম (র.)’র কাছে দেয়ার মত কোন দ্রব্য বা অর্থ ছিলনা। তিনি ভিক্ষুককে কিছুকাল জামাত খানায় অবস্থান করতে এবং কোন উপহার বা দান সামগ্রীর প্রতীক্ষায় থাকতে বললেন। কিন্তু বেশ কিছুকাল যাবৎ কোন উপহার বা দান সামগ্রী আসলনা। ভিক্ষাজীবী লোকটি খানকাহ্ থেকে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিল। শেখ নিজাম (র.) ভিক্ষুকটিকে যাবার অনুমতি দিলেন এবং যাবার সময় তাকে নিজের জুতা জোড়া দিয়ে দিলেন। ভিক্ষুকটি রওয়ানা দিল। পথে আমির খসরুর সাথে তার দেখা হল যিনি মুলতান থেকে দিল্লীতে বাৎসরিক সফরে আসছিলেন। তাঁর সাথে লাখ লাখ তঙ্কা (Tanka) ছিল। তিনি ভিক্ষুকটির হাতে শেখ নিজাম (র.)’র জুতা দেখে বিস্মিত হলেন এবং তাকে শেখ নিজাম (র.)’র কথা জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁর আধ্যাত্মিক গুরু শেখ নিজাম (র.) কেমন আছেন জানতে চাইলেন। ভিক্ষুকটি তাঁকে শেখ নিজাম (র.)’র আর্থিক দুরবস্থার কথা জনাল এবং সে যা যা প্রত্যক্ষ করেছে সব কিছু বর্ণনা করল। আমির খসরু ভিক্ষুক থেকে জুতা জোড়া নিয়ে নিলেন এবং বিনিময়ে তাঁর সঞ্চিত সকল টাকা ভিক্ষুককে দিয়ে দিলেন। আমির খসরু জুতা জোড়া মাথায় নিয়ে তাঁর আধ্যাত্মিক গুরু শেখ নিজাম (র.)’র কাছে আসলেন। শেখ নিজাম (র.) আমির খসরুর দিকে তাকালেন এবং বললেন, “খসরু! তুমি খুব সস্তায় জুতা জোড়া কিনে ফেলেছ। যদিও বায়াত হওয়ার জন্য (দীক্ষা নেয়ার জন্য কিংবা সিলসিলায় ভর্তি হবার জন্য) পীরের হাতে হাত রাখার প্রথা প্রচলিত ছিল,

মালিকজাদা আহমদের শেখ নিজাম (র.)'র প্রতি এত প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল যে এবং তাঁর শান-মান-মর্যাদায় তিনি এত অভিভূত হয়ে ছিলেন যে, তিনি শেখ নিজাম (র.)'র হাতে হাত রাখতে সাহস করেন নি।

এমনকি শেখ নিজাম (র.)'র ওফাতের পরও তাঁর শিষ্যরা তাঁর স্মৃতির প্রতি একই সম্মান ও শ্রদ্ধা পোষণ করতে থাকেন। যখন শেখ নিজাম (র.)'র ওফাতের পর শেখ কুতুব উদ্দিন মুনাওয়ারের সাথে শেখ নাছিরুদ্দিন চেরাগ এর সাক্ষাৎ হয়, তখন উভয়ে শেখ নিজাম (র.)'র স্মৃতি রোমন্থন করে কান্নায় ভেঙে পড়েন।

মাওলানা সিরাজ উদ্দিন উসমানকে (যিনি আখি সিরাজ নামে অধিক জনপ্রিয়) শেখ নিজাম (র.) বিভিন্ন উপলক্ষে যে সকল পোশাক দান করেছিলেন, তিনি তাঁর কবরে তাঁর শিয়রের ওপরে ওই সকল পোশাক সমাহিত করার জন্য অসিয়ত করে যান এবং সে অসিয়ত পালন করা হয়। পীরের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ভালবাসার এ অপূর্ব নিদর্শন সত্যি বিরল। শেখ নিজাম (র.) আমির খসরুকে যে সকল চিঠি লিখেছিলেন, সব চিঠিগুলো আমির খসরুর মরদেহের সাথে তাঁর অন্তিম ইচ্ছা অনুযায়ী কবরে দাফন করা হয়। মোহাম্মদ বিন তুঘলক যখন শেখ বোরহান উদ্দিন ঘরীব (Gharib) কে দৌলতাবাদে হিজরত করার জন্য আদেশ দিলেন, তখন তিনি শেখ নিজাম (র.)'র মাজারকে সামনে রেখে দিল্লী থেকে দৌলতবাদ হেঁটে গিয়েছিলেন। কোন অবস্থাতেই তাঁর আধ্যাত্মিক মনিব বা গুরুর মাজারকে পেছনে ফেলেননি কিংবা পশ্চাতে থাকতে দেননি। এমনকি শত বাধা-বিপত্তি, বিপর্যয় কিংবা মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েও শিষ্যরা শেখ নিজাম (র.)কে কখনও ঋণলে যাননি। খাজা জাহানকে যখন ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলানোর জন্য নেয়া হয়, তখনও তিনি মাথায় শেখ নিজাম (র.) কর্তৃক প্রদত্ত টুপি পরিধান করেন এবং রুমাল মাথায় বাঁধেন।

শেখ নিজাম (র.)'র মাজার ছুঁয়ে কোন প্রতিজ্ঞা করলে কোন শিষ্য সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে সাহস করতেন না। যখন সুলতান ফিরোজ শাহ্ সামছুদ্দীন দামঘানী (Damghani) কে গুজরাটের গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দিলেন, তখন তাঁর আচরণ ভাল এ মর্মে শেখ নিজাম (র.) কে তাঁর জামিনদার হিসেবে পেশ করতে সুলতান তাঁকে বললেন। দামঘানী রাজী হলেন। পরের দিন দামঘানী সুলতানসহ শেখ নিজাম (র.)'র মাজারে গেলেন, মাজারের গিলাফ তাঁর হাতে নিয়ে কেবলামুখী হয়ে দামঘানী শেখ নিজাম (র.)কে তাঁর সাক্ষী বা জামিনদার বানালেন।

শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জেশকর (র.) শেখ নিজাম (র.) কে হিন্দুস্তানের আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্য দান করেছিলেন এবং তাঁকে এ সাম্রাজ্য গ্রহণ করতে আদেশ দিয়েছিলেন। শেখ ফরিদ (র.) এটাও ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, শেখ নিজাম (র.) হবেন বটবৃক্ষ সদৃশ যিনি জনগণকে ছায়া ও আশ্রয় দান করবেন।

শেখ ফরিদ (র.)'র ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হয়েছিল। শেখ নিজাম (র.) তাঁর পীরের প্রত্যাশা পূরণ করেছিলেন, ভারতে আধ্যাত্মিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং সুলতানুল মাশায়েখ এর মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছিলেন। তিনি মানুষের দুঃখ-দুর্দশার কথা শুনেছেন, সমস্যার সমাধান দিয়েছেন এবং তাদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতি ঘটিয়েছেন। মানুষের চোখে জল দেখলে শেখ নিজাম (র.) কান্নায় ভেঙে পড়তেন। চোখের জলে তাঁর চিবুক ভিজে যেত।

দক্ষিণ এশিয়ার মানুষকে শেখ নিজাম (র.) পাঁচ দশকেরও অধিককাল ধরে আধ্যাত্মিক নির্দেশনা ও আশ্রয় দিয়ে গেছেন। তিনটি রাজবংশের (dynasties) এক ডজনেরও অধিক শাসকবর্গ তাঁর আধ্যাত্মিক শাসনামলে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেছেন এবং বুদবুদের (bubbles) মত বিদায় নিয়েছেন, কিন্তু শেখ নিজাম (র.)কে কোন রাজনৈতিক পরিবর্তন তাঁর অবস্থান থেকে টলাতে পারেনি। সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন হয়েছে, কিন্তু কোন রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে তাঁর নৈতিক শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক চর্চা এবং সাধনা থেমে থাকেনি।

মহানবী (দ.)'র সুন্নাহ্‌র প্রতি শেখ নিজাম (র.)'র অবিচল দৃঢ়তা বিভিন্নভাবে প্রশংসিত হয়েছে। কেউ কেউ তাঁকে মহানবী (দ.)'র ডান বাহু বলে আখ্যায়িত করেছেন। (সূত্রঃ D.R. Khizr Khan, Shirin Khusrau, P. 12; Matla-ul-Anwar, P. 22, Hasht Bihisht, P. 13)। কেউ কেউ বলেছেন, "উম্মতের জন্য মহানবী (দ.) যেরূপ, কওমের জন্য শেখ নিজাম (র.)ও তদ্রূপ।" (সূত্রঃ Qiwan-ul-Aqaid, P. 8; Shawamil-ul-Jamal, P. 21; Siyar-ul-Awliya, P. 360)। বারনীর মতে, "অলিরা হলেন নায়েবে রসূল (দ.) এবং মহানবী (দ.)'র বেলায়তের উত্তরাধিকারী। নবুয়তের মিশনকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য অলিরা দায়িত্বপ্রাপ্ত।" শেখ নিজাম (র.)'র সময়কালীন এবং তাঁর পরবর্তী সময়ের সুফি বিশেষজ্ঞদের মূল্যায়ন অনুযায়ী শেখ নিজাম (র.)'র ব্যক্তিত্বে যীশুখ্রিস্ট ও খিজির (আ.) এর চারিত্রিক গুণাবলীর মিশ্রণ ঘটেছে। আমির খসরু থেকে শুরু করে ড. ইকবাল পর্যন্ত সকল সুফি পণ্ডিতবর্গরা এ অভিমত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মতে, "হযরত ঈসা (আ.) যেরূপ মানুষের রোগ ভাল করেছেন, তদ্রূপ শেখ নিজাম (র.) মানুষের রোগাক্রান্ত অন্তরকে রোগমুক্ত করেছেন। খিজির (আ.) যেরূপ মানুষকে সত্য ও পুণ্যের পথ দেখিয়েছেন, শেখ নিজাম (র.)ও তদ্রূপ মানুষকে ধার্মিকতা ও পরিশুদ্ধির পথ দেখিয়েছেন।" (সূত্রঃ Diwan, P. 37; Matla-ul-Anwar, p. 20, 22; Aina-i-Sikandari, P. 12; D.R. Khizr Khan, P. 15; Majnun Laila, P. 17; Qiwan-ul-Aqaid, P. 8)। আমির খসরু বলেন, "শেখ নিজাম (র.)'র দেহ পানি ও মাটি দিয়ে তৈরি হয়নি। হযরত ঈসা (আ.) এবং খিজির (আ.) এর জীবনের মিশ্রণে তা' তৈরি হয়েছে।" আল্লামা ইকবাল বলেন, "তোমার মাজারে আসলে মানুষের অন্তর জীবিত হয়। তোমার অবস্থান হযরত ঈসা (আ.) এবং খিজির (আ.)'র ওপরে।" (সূত্রঃ Kulliyat, P. 96; Siyar-ul-Auliya, P. 19)। কারো কারো মতে, "শেখ নিজাম (র.) হচ্ছেন হযরত জোনায়েদ বাগদাদী (রা.)

এবং হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (রা.)'র প্রতিচ্ছবি।" আমীর খসরুর মতে, "শিবলী (রা.) ও ইব্রাহিম আদহাম (র.) যে পথে পরিভ্রমণ করেছেন, শেখ নিজাম (র.)'র শিষ্যরাও সে পথ অতিক্রম করেছেন।" (সূত্রঃ Majnun Laila, P. 13; Barani, P. 36; Futuh-ul-Salatin, P. 456; Nuh Sipiht, P. 24)। "যেই তাঁর শিষ্যত্ববরণ করেছেন, তিনিই অমর আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করেছেন।" (Matla-ul-Anwar, P. 22)। জনগণ তাঁকে তাঁর সময়ের 'কুতুব' বলে অভিহিত করতেন। (সূত্রঃ Hasht Bihisht, P. P. 22; D.R. Khizr Khan, P. 227; Sirat-i-Firuz Shah, P. 85)। আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্যের রাজা হিসেবে শেখ নিজাম (র.) তাঁর যোগ্য খলীফাদেরকে এক একটি ভূখণ্ডের আধ্যাত্মিক আধিপত্য দান করেছিলেন। (সূত্রঃ Matla-ul-Anwar, P.23)। সকল দুর্যোগ ও বিপদে তিনি ছিলেন সকলের নিরাপদ আশ্রয়। (Matla-ul-Anwar, P. 23)। আমির খসরু বলেন, "যেখানেই শেখ নিজাম (র.)'র নিঃশ্বাস পৌঁছেছে, সেখানেই হাজার হাজার দুঃখের পর্বত বরফের মত গলে গিয়েছে।" (Futul-ul-Salatin, PP. 456-7)।

পাঁচ. শেখ নিজাম (র.)'র ওফাতের পর শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিবাহিত হয়ে চলেছে, কিন্তু তাঁর মাজারে দর্শনার্থীদের ভিড়ের কোন কমতি নেই– রাজা, পদস্থ কর্মকর্তা, পারিষদ, পণ্ডিত, সুফি সাধক, ধনী-গরীব, সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধাঞ্জলিতে সিক্ত হয়ে চলেছে শেখ নিজাম (র.)'র মাজার ও মাজার প্রাঙ্গণ। মোহাম্মদ বিন তুঘলক (যিনি শেখ নিজাম (র.) এর মরদেহ বহনকারী খাট কাঁধে নিয়েছিলেন) শেখ নিজাম (র.)'র কবরের ওপরে একটি সৌধ নির্মাণ করে দেন। ফিরোজ শাহ্ তুঘলক এ সৌধকে আরও বহুভাবে সম্প্রসারিত ও উন্নত করেন। বাবর যখন দিল্লীতে আসেন, তখন তিনি শেখ নিজাম (র.)'র মাজারের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করে যমুনা নদীর তীরে গিয়ে ক্যাম্প স্থাপন করেন। সম্রাট আকবর তাঁর পিতাকে সমাহিত করার জন্য শেখ নিজাম (র.)'র খানকাহ্‌র নিকটে একটি স্থান নির্বাচন করেন। আকবর থেকে বাহাদুর শাহ্ জাফর পর্যন্ত প্রত্যেক মোঘল সম্রাট শেখ নিজাম (র.)'র মাজারে দোয়া নিতে এসেছেন এবং জেয়ারত করেছেন। যখন দিল্লীতে আকবরের প্রাণ নাশের চেষ্টা ব্যর্থ হল, তখন আকবর বললেন যে, শেখ নিজাম (র.)'র দোয়ার বরকতে তিনি প্রাণে রক্ষা পেয়েছেন যেহেতু এ ঘটনার কয়েকদিন আগে তিনি শেখ নিজাম (র.)'র মাজার জেয়ারত করেছিলেন। খসরুর বিদ্রোহ মোকাবেলা করার জন্য সম্রাট জাহাঙ্গীর শেখ নিজাম (র.)'র মাজার জেয়ারত করেছিলেন। (সূত্রঃ Tazkirah-i-Humayun wa Akbar, P. 234; Akbar Namah, P. 313; Badauni, P. 60; Tazuk-i-Jahangir, P. 27)। শেখ নিজাম (র.)'র মাজারের পদপ্রান্তে মুহাম্মদ শাহ্‌কে সমাহিত করা হয়। বলা হয়ে থাকে যে, মুহাম্মদ শাহ্ তাঁর কবরের জায়গাটি এক লাখ রুপী দিয়ে খরিদ করেছিলেন। (সূত্রঃ Basir-ud-Din, Waqi-at-i-Darul Hakumat, Dellhi, P. 797)। দক্ষিণ ভারতের শাসকেরাও শেখ নিজাম (র.)'র প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা পোষণ করতেন। বাহমনী রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা আলাউদ্দিন হাসান গাঙ্গু তাঁর দুঃসময়ে দিল্লীতে এসেছিলেন। একদিন তিনি শেখ নিজাম (র.)কে দেখতে যান। তাঁর যাবার কিছুক্ষণ আগে উলুঘ খান (Ulugh

Khan) শেখ নিজাম (র.)'র খানকাহ্ থেকে বিদায় নেন (উলুঘ খান পরবর্তীতে মোহাম্মদ বিন তুঘলক নাম ধারণ করেন)। শেখ নিজাম (র.) তাঁর এক খাদেমকে বললেন, "এক রাজা বিদায় নিলেন। আর এক রাজা দরজায় অপেক্ষা করছেন। তাঁকে ভিতরে নিয়ে আস।" শেখ নিজাম (র.) আলাউদ্দিন হাসান গাঙ্গুকে সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন এবং দাক্ষিণাত্যে তাঁর জন্য উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন। শেখ নিজাম (র.) তাঁর হাতের একটি আঙ্গুল দিয়ে এক টুকরা রুটিতে চাপ দিলেন, রুটির টুকরাটি গাঙ্গুকে খেতে দিলেন এবং বললেন, এটাই হবে আপনার রাজ্যের মানদণ্ড। গাঙ্গু খুশীমনে এ দুর্লভ উপহার গ্রহণ করলেন এবং শেখ নিজাম (র.)'র দোয়া চেয়ে বিদায় নিলেন। যখন গাঙ্গুর সুদিন ফিরে আসল এবং হাসান গাঙ্গু সুলতান পদে অধিষ্ঠিত হলেন, তখন তিনি শেখ নিজাম (র.)'র রূহ মোবারকে সওয়াব পৌঁছাবার নিয়তে গরীব-দুঃখীকে বন্টনের জন্য শেখ বোরহান উদ্দিন ঘরীবের (Gharib) নিকট পাঁচ মণ স্বর্ণ ও দশমণ রূপা পাঠিয়ে দেন।

বিভিন্ন সিলসিলাহ্র অলিগণ শেখ নিজাম (র.)কে গভীর শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। মুলতানের বিখ্যাত সোহরাওয়ার্দী ত্বরিকার অলি শেখ রুকুনুদ্দীন আবুল ফতেহ্ শেখ নিজাম (র.)কে 'ধর্মের রাজা' নামে সম্বোধন করতেন। শেখ শরফুদ্দীন ইয়াহিয়া মানেরী প্রায়শ বলতেন, "শেখ নিজাম (র.) আধ্যাত্মিকতার এমন একটি স্তরে পৌঁছেছেন যেখানে নিদ্রা যাওয়া কিংবা জেগে থাকা সমান তাৎপর্যপূর্ণ।" শেখ নিজাম (র.)'র ওফাতের পর বহু অলি-দরবেশ ও সুফি সাধক ফয়েজ লাভের জন্য শেখ নিজাম (র.)'র মাজারে অবস্থান করেছেন, তাঁরা মোরাকাবা-মোশাহেদা ধ্যান করেছেন, এবং আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ অর্জনের জন্য মাজারের পরিবেশ অত্যন্ত অনুকূল বলে মত প্রকাশ করেছেন। গুলবার্গার (Gulbarga) সৈয়দ মুহাম্মদ গিসু দারাজ তাঁর শ্রোতাদেরকে একদা বলেছিলেন, "সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক সকলকে দিল্লীর বাইরে চলে যাবার আদেশ দিলে খাজা কুতুব উদ্দিন বখতিয়ার কাকী (র.) ও শেখ নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.)'র মাজার ছাড়া অন্যান্য খানকাহ্ ও মাজারসমূহ জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কেবলমাত্র এ দু'টি মাজারে মোমবাতি জ্বলতে দেখা যায়।" পণ্ডিত, কবি-দার্শনিক, বিদ্বান ব্যক্তিসহ সর্বস্তরের জনসাধারণ বিপুল সংখ্যায় শেখ নিজাম (র.)'র মাজারে ফয়েজ লাভের উদ্দেশ্যে জেয়ারত করতে আসে অবিরত। উচ্চ শিক্ষার্থে ইউরোপ যাবার প্রাক্কালে আল্লামা ড. মুহাম্মদ ইকবাল তাঁর শিক্ষা জীবনের উৎকর্ষ অর্জনের নিমিত্ত ফয়েজ লাভের উদ্দেশ্যে শেখ নিজাম (র.)'র মাজার জেয়ারত করতে আসেন এবং মুনাজাত করেন।

শেখ নিজাম (র.)'র মাজার প্রাঙ্গণ অনাগত কালের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এবং সর্বস্তরের গণমানুষের জন্য পরম শ্রদ্ধা ও ভালবাসার কেন্দ্রভূমি। শেখ নিজাম (র.)'র মাজার প্রাঙ্গণে কবরের জন্য একটি জায়গা পাওয়া এবং তথায় সমাহিত হওয়াকে সবাই পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার ও আধ্যাত্মিক ফয়েজ লাভের উৎস হিসেবে বিবেচনা করত। আমির খসরু থেকে গালিব, খান-ই-জাহান মকবুল থেকে আজিজ কোকালতাস, জিয়াউদ্দিন বারনী থেকে স্যার শাহ্ সুলাইমানসহ অনেক বিখ্যাত মণীষী ও গুণীজন মাজার প্রাঙ্গণের আনাচে-কানাচে

সমাহিত হয়েছেন এবং শায়িত আছেন। প্রখ্যাত সুফি সাধক খাজা হাসান নিজামী মাজার প্রাঙ্গণে সমাহিত ব্যক্তিদের কবরগুলো চিহ্নিত করা ও সংরক্ষণ করার জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন যার ফলে ঐতিহাসিকগণ আজ ইতিহাসের চিরস্মরণীয় উপাদনগুলো খুঁজে বের করার সুযোগ লাভ করেছেন।

চবুৎরা-ই-ইয়ারান (Chabutra-i-Yaran) সম্পূর্ণরূপে শেখ নিজাম (র.)'র শিষ্য ও তাঁর উত্তরসূরী বংশধরদের কবর দেয়ার জন্য নির্ধারিত এবং তাঁর প্রখ্যাত খলীফাগণ তথায় সমাহিত হয়েছেন এবং শায়িত আছেন। ১৩২৫ সাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত শেখ নিজাম (র.)'র মাজার প্রাঙ্গণকে ঘিরে যে সকল কবর রচিত হয়েছে, সেগুলো শেখ নিজাম (র.)'র প্রতি সাড়ে ছয় শতাব্দীরও অধিককাল ধরে যে জনগণের ভালবাসা ও আস্থার মহাসমূদ্র সৃষ্টি হয়েছে তার ঐতিহাসিক সীল ও কালের সাক্ষীরূপে বিদ্যমান রয়েছে। আজ হিন্দু এবং মুসলিম উভয়ে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানায় এবং তাঁর নাম উচ্চারণ করার সাথে সাথে তাঁর ঐতিহাসিক দর্শন, অন্তর্দৃষ্টি, আধ্যাত্মিকতা ও নৈতিকতার স্বর্গীয় অনুভূতি ও আত্ম-সচেতনতার একটি মহাজাগতিক মূল্যবোধের প্রেরণা মানুষকে উদ্বেলিত করে। তাঁর জীবন সাধনা ছিল মানুষের ভালবাসায় নিবেদিত ও সহমর্মিতায় সিক্ত যা মধ্যযুগীয় রাজ দরবারের বিলাসিতা ও যুদ্ধবিগ্রহের উন্মাদনা থেকে মুক্ত একটি মানব দরদী ও কল্যাণকামী সমাজ প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে এবং মানুষের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক চিন্তা-চেতনায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দিয়েছে। হযরত শেখ নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.)'র এ কালজয়ী অবদান আবহমান কাল ধরে চিরস্মরণীয়, চিরবরণীয় ও চিরভাস্বর হয়ে থাকবে।

তথ্যপঞ্জী

(SELECT BIBLIOGRAPHY)

A Early Religious and Mystical Works

Asrr-ut-Tawhid fi Maqamat-i-Abt Said, Muhammad bin Munawwar Ed. Ahmad Bahmanyar (Tehran, 1934)

Awarif-ul-Maarif Shaikh-u d-din Suhrawardi

Arabic text: (Beirut, 1966)

Urdu trans.: Maulvi Abu'l-Hasan (Nawal Kishore: Lucknow, 1926)

Persian version: *Misbah-ul-Hidayab wa Miftab-ul-Kifayab, `lzz-u `d-din Mahmud Kashani, ed. Agha Jalal Huma'i (Tehran)*

English trans.: Lt. Col. H. Wilberforce Clarke, Govt, of India Central Printing Office (Calcutta, 1891)

Ibya-u `l-`Ulam, Imam Ghazzali

Arabic text: (Dar al-Fikr: Beirut, 1991)

Urdu trans.: *Maza1-u `l-`Arifin (Nawal Kishore, 1875)*

Kashf-u `l-Mahjub, Shaikh Ali Hujweri

Persian text: (i) Matba-i-Punjab (Lahore); (ii) (Lahore, 1968)

English trans.: R.A. Nicholson (London, 1936)

Urdu trans.:

(i) Shah Zahir Ahmad (Lahore, 1925

(i) Muhammad Ahmad Qadiri (Lahore, 1985)

Kimiya-i-Sa'adah: Imam Ghazzali Matba-i-Hashimi (Meerut, 1377 AH)

Kitab-u 'l Luma' Abu Nasr al-Saraj

Gibb Memorial Series (London, 1914)

Mirsad-ul-lbab Min-al-Mabda ila al-Ma'ad, Najm-u `d-din Daya

Text (Tehran, 1336 Solar)

Qut-u'l-Qulub, Abu Talib Makki

2 vols. (Cairo, 1310 / 1892)

Risalab-i-Qushairi, Abu Qasim `Abd-u'l-Karim Qushairi

Text: (Cairo, 1346 / 1927)

B. Malfuzat

AFYal-u'l-Fawa'id, conversations of Shaikh Nizam-u'd-din Auliya.
compilation attributed to Amir Khusrau
Text: (Rizvi Press: Delhi, 1304 – 1305 AH)
Urdu trans.: Latif Malik (Lahore, 1960)
Ahsan-u `l-Aqwal, conversations of Shaikh Burhan-u d-din Gharib.
compiled by Hammad bin Imad Kashani
MSS: (i) Personal collection
(ii) Osmania Library (1478 / 1979)
Urdu trans.: (Matba Jahangir Safair: Bombay, 1342 AH)
Anwar-u'l-A'yun, conversation of Shaikh Ahmad `Abd-u'l-Haqq of Rudauli, compiled by Shaikh `Abd-u'l-Quddus Gangohi (Ahsan-u'l-Mataba : Aligarh, 1905)
Asrar-u'l-Makhdumin, conversations of Khwaja Karak of kara
(Nasim-i-Hind Press: Fathpur-Haswa, 1893)
Durar-i-Nizami, conversations of Shaikh Nizam-u'd-din Auliya,
compiled by Maulana `Ali Jandar
MSS: (i) Buhar Collection, Asian Society of Bengal (183)
(ii) Salar Jang Museum, Hyderabad (61 / 5 - 99)
(iii) Personal collection.
Fawa'id-u'l-Fu'ad, conversations of Shaikh Nizam u'd-din Auliya
compiled by Amir Hasan Sijzi
MSS: (i) MS Personal Collection
(ii) MS Personal Collection-Prepared for Rai of Kuchesar on 30 July 1863
Texts: (i) Nawal Kishore (Lucknow, 1302 / 1884)
(ii) Ed. M. Latif Malik (Lahore, 1966)
Urdu trans.: Shams Barelvi (Karachi, 1978)
Khwaja Hasan Sani Nizami (Delhi, 1990)
Fihi-ma-Fihi, conversations of Maulana Jalal-u'd-din Rumi, compiled by his son Sultan Bana-u'd-di
Ed.: Maulana `Abd-u'l-Majid Daryabadi (Azamgarh, 1928)
Gharaib-u'l-Karamat, conversations of Shaikh burhan ud-din Gharib, compiled by Majd-u d-din
Ms.: Salar Jang Museum 43/876

Jami'u'l-Ulum, conversations of Syed Jalal-ud-din Bukhari
Ed.: Qazi Sajjad Husain (Delhi, 1982)
Jawami-ul-Kalim, converastion of Syed Muhammad Gisu Daraz, compiled by Syed Muhammad Akbar Husaini
Lith: (Intizami Press: Kanpur, 1936)
Khair-ul-Majalis, conversations of Shaikh Nasir-ud Chiragh of Delhi, compiled by Hamid Qalandar
Text: Ed. K. A. Nizami, A. M. U. (Aligarh, 1959)
Urdu trans.: *Siraj-ul-Majalis (Delhi, 1315 AH)*
Lataif-i-Quddusi, conversations of Shaikh `Abd-ul-Quddus Gangohi, compiled by Shaikh Rukn-ud-din
Matba-i-Mujtabai (Delhi, 1311 AH)
Madin-ul-Maani, conversations of Shaikh Sharaf-ud-din Yahya Maneri, compiled by Zain Badr `Arabi
2 vols. Sharaf-ul-Akhbar (Bihar, 1301-1303 AH)
Malfuzat-i-Shah `Abd-u'l-`Aziz,
Ed.: Qazi Bashir-u'd-din
Lith.: (Mujtaba'i Press Meerut, 1314 AH)
Nafa'is u'l-Anfas, conversations of Shaikh Burhan-u`d-din Gharib, compiled by Rukn-ud-din bin Imad Kashani
MSS: (i) Nadwar-ul-Ulama Library (Lucknow, 1366)
(ii) Personal Collection
Rabat-u'l-Muibbin, conversations of Shaikh Nizam-u'd-din Auliya; compilation attributed to Amir Khusrau
MS: Personal collection
Rabat-u'l-Qulub, conversations of Shaikh Farid Ganj-i-Shakar, compilation attributed to Shaikh Nizam-u'd-din Auliya
MS: Personal Collection
Litl.: (Qadiri Press: Lucknow, 1311 AH)
Sarur-us-Sudur, conversations of Shaikh Hamid-u'd-din Nagauri, compiled by his grandson, Shaikh Aziz
MSS: (i) Habibganj collection, Aligarh Muslim University Library.
(ii) Photostat of MS in Pakistan Historical Society, Karachi.
(iii) Personal Collection.
Shama'il-u'l-Atqiya, conversation of Shaikh Burham-u'd-din Gharib, compiled by Rukn-u'd-din bin 'lmad-u'd-din

MS: Personal Collection
Lith.: (Ashraf Press: Hyderabad, 1347 AH)
Shawamil-u'l-Jumal dar Shama'il-Kumal, by Abu'l-Faiz Minallah
MS: Rauza-i-Shaikh Collection, Gulbarga
Siraj-u'l-Hidaya, conversations of Syed Jalal-u'd-din Bukhari, compiled by Makhdumzada Abdullah
MS: Personal Collection
Ed.: Qadi Sajjad Husain (Delhi, 1983)
Tuhfat-u'l-Majalis, conversations of Shaikh Ahmad Maghribi, compiled by Mahmud bin Sa'd Irjii
MS: India Office Pers. Collection DP. 979
Urdu tans: Syed Abu Zafar Nadwi (Ma'arif Press: Azamgarh, 1939)

C. *Early Tazkirhs* and Biographical Accounts

Nafahat-u'l-Uns, `Abd-u'r-Rahman Jami (Nawal Kishore: Lucknow, 1915)
Qiwam-u'l-Aqaid, Muhammad Jamal Qiwam-u'd-din
MS: Osmania University Library, Hyderabad
Siyar-u'l-Arifin, Fazlullah known as Durwesh Jamali
(i) Photostat coPz of MS in John Rylands Library (earliest known MS)
(ii) MS: Personal Collection
(iii) Lith.: (Rizwi Press: Delhi, 1311 AH)
(iv) Urdu trans.:
(a) Ghulam Ahmad, Shams-u'd-Mataba, (Moradabad,1901)
(b) Ayyub Qadiri (Lahore, 1976)
Siyar-u'l-Auliya, Syed Muhammad bin Mubarak Kirmani, known as Amir Khurd
(i) MS: Personal collection, collected and compared by Diwan Allah Jiwaya of Pakpattan
(ii) Lith: Chirangi Lal (Muhibb-i-Hind Press: Delhi, 1302 / 1885)
(iii) Urdu trans:
(a) Ghulam Ahmad Biryan (Muslim Press: Delhi, 1320)
(b) I`Jaz-u'l-Haqq Quddusi (Lahore, 1980)

D. Early Historical Works

Babur Namah, Babur

(i) Persian trans.: `Abd-u'r-Rahim Khan-i-Khanan (Bombay, 1308 AH)
(ii) English Trans.: Mrs. A. S. Beveridge (London, 1921)
Futubat-i-Firuz Shabi, Firuz Shah Tughluq
(i) Lith: (Tizvi Press: Delhi, 1885)
(ii) Sh. Abd-u'r-Rashid, M. A. Makhdoomi, Aligarh (with English trans.)
(iii) M. A. Chaghatai with Urdu trans. (Poona, 1941)
Futuh-us-Salatin, Isami
Ed.: A. S. Usha (Madras, 1948)
English trans.: 3 vols. A. Mahdi Husain (Asia Publishing House, 1967 - 77)
Khazain-u'l-Futuh, Amir Khusrau
Ed.: M. Wahid Mirza (Asiatic Society of bengal: Calcutta, 1953)
English trans.: M. Habib, Tbc Campaigns of Sultan Ala-ud-Din Khalji, (Madras, 1931)
Mukatabat-i-Rashidi, Rashid-u'd-din Fazlullah
Ed.: Mohd. Shafi (Educational Press: Lahore, 1947)
Rihla, Ibn Battuta
Arabic text: (Cairo, 1928)
Urdu trans.: K.B. Muhammad Husain (Delhi, 1345 AH)
English trans.: (a) (abridged): H. A. R. Gibb (London, 1929)
(b) A. Mahdi Husain (Baroda, 1953)
Sirat-i-Firuz Shahi, anonymous
MS: Bankipur Library
Tabaqat-i-Nasiri, Minhaj-u's-Siraj
Ed.: (a) Nassau Lees, Khadim Husain and `Abd-u'l-Hayy (Calcutta, 1864)
(b) `Abd-u' l-Hayy Habibi, Kabul
English trans.: M.G. Reverty (Bib. Indica, 1897)
Tarkh-i-Firuz Shahi, Zia-u 'd-din Barani
Ed.: Sir Syed Ahmad Khan (Asiatic Society of Bengal: Calcutta, 1860)
Tarikh-i-Firuz Shabi, Shams-i-Siraj `Afif
Ed.: Vilayat Hosain (Asiatic Society of Bengal: Calcutta, 1889-91)

Tarikh-i-Mubarak Shahi, Yahya bin Ahmad Sirhindi
Ed.: K.B. Hidayat Hosain (Asiatic Society of Bengal: Calcutta, 1931)
Tarikh-i-Mubarak Shahi, Yahya bin Ahmad Sirhindi
Ed.: K. B. Hidayat Hosain (Asiatic Society of Bengal: Calcutta, 1931)
English trans: K. K. Basu. Gaekwad Oriental Series, 1932

E. Early Literary and Religious Works

Dibacha Ghurrat-u'l-Kamal, Amir Khusrau
Yasin `Ali Dihlawi, Matba'-i-Qaisariya (Delhi)
I`jaz-i-Khusrawi, Amir Khusrau (Nawal Kishore, 1865)
Insha-i-Mahru, `Ain-u'l-Mulk Mahru
Ed.: S.A. Rashid (Lahore, 1965)
Mukh-u'l-Ma'ani, Hasan Sijzi
MS: Aligarh Muslim University Library
Mulhimat, Jamal-u'd-din Hanswi
Text: (a) (Alwar, 1306 AH)
(b) (Delhi, 1891)
English trans: Sardar `Ali Ahmda Khan (ed.) with English trans. (Lahore, 1985)
Tuhfat-u `l-Mahbub,
Urdu trans. of Shaikh Nizam-u'd-din Auliya's mystic treatise, by M. Abu Muhiy-u `d-din Khan (Agra, 1902)
Usul-u `s. Sama, Maulana Fakhr-u'd-din Zarradi
Lith: (Muslim Press: Jhajjar, 1311 AH)

F. Early Poetical Works

A'ina-i-Sikandari, Amir Khusrau
Ed.: Sa'id Ahmad Faruqi (Aligarh, 1917)
Bahr-u'l-Ma'ani, Letters of Ja'far Makki al-Husaini (Ahtashamiya Press Moradabad, 1889)
Dawawin-i-Khusrau, Amir Khusrau (Nawal Kishore, 1871)
Diwan-i-Hasan Dihlawi
Ed.: Mas'ud `Ali Mahwi (Ibrahimiya Machine Press: Hyderabad, 1352 AH)
Diwan-i-Jamal u'd-din Hanswi
Pirji Rafi-u'd-din Tehsildar (Chashma-i Faiz Press: Delhi, 1889)

Diwan-i-Mutahhar

Oriental College Magazine (May-August 1935)

Ma'arif (May-July 1935)

Duwal Rani Khizr Khan, Amir Khusrau

Ed.: (i) Rashid Ahmad Salim (Aligarh, 1917)

(ii) With English Introduction and notes by K. A. Nizami (Aligarh, 1988)

Fragments of Hamid Qalandar's Poetical Compositions particularly verses in praise of Shaikd Nizam-u'd-din Auliya (fos. 130, 137)

MS: British Museum Supp. Catalogue p. 232

Hasht Bihisht, Amir Khusrau

Ed.: Maulana Sulaiyman Ashraf (Aligarh, 1918)

Majnun Laila, Amir Khusrau

Ed.: Habibur Rahman Khan Sherwani (Aligarh, 1927)

Matla'-u'l-Anwar, Amir Khusrau

Ed.: M. Muqtada Khan Sherwani (Aligarh. 1926)

Nuh-Sipihr, Amir Khusrau

Ed.: M. Wahid Mirza (Calcutta, 1948)

Qir'an-u'd-Sa'dain. Amir Khusrau

Ed.: Maulvi Muhammad Isma 'il (Aligarh, 1918)

Shirin-o-Khusrau, Amir Khusrau

Ed.: 'Ali Ahmad Khan Asir (Aligarh, 1927)

Tughluq Hamah, Amir Khusrau

Ed.: S. Hashmi Faridabadi (Aurangabad, 1933)

Wast-u'l-Hayat, Amir Khusrau

Ed.: Fazl Ahmad Hafiz (Aligarh, 1920)

F. Later Biographical Accounts, *Tazkirahs, etc.*

Akhbar-u'l-Akhyar, Shaikh `Abd-u'l-Haqq Muhaddith Dihlawi

MS: Personal Collection

Text: (Mujtaba `i Press: Delhi 1309 AH)

Trans.: (i) Syed Yasin Ali (Muslim Press: Delhi, 1328 AH)

(ii) Subhan Mahmud and Muhammad Fazil (Karachi, n.d.)

Akhbar-u'l-Asfiya, `Abd-u'l-Samad bin AFYal Muhammad

MSS: (i) India Office Library

(ii) Bankipur

Anwar-u'l-`Arifin, Hafiz Muhammad Husain Moradabadi
Nawal Kishore (Lucknow, 1879)
Gulzar-i-Abrar, Muhammad Ghauthi Shattari
MS: Personal Collection
Urdu trans.: Azkar-u'l-Abrar, by Maulvi Fazl Ahmad (Agra, 1326 AH)
Hada'iq-ul-Hanafiya, Faqir Muhammad Jihlami
(i) Nawal Kishore (Lucknow, 1906)
(ii) Ed. Khurshid Ahmad Khan (Lahore, n.d.)
Hasanat-u'l-`Arifin, Dara Shukoh
MS: Nadwat-u'l-Ulama Library, Lucknow
Urdu trans.: Muhammad `Umar Khan (Kapoor Art Press: Lahore, n.d.)
lqtibas-u'l-Anwar, Mahammad Akram Baraswi
(Lahore, 1895-1896)
Jawahir-i-Faridi, `Ali Asghar Chishti
MS: Personal Collection
Lith.: Lahore 1301 / 1884
Urdu trans.: (Karimi Press: Lahore)
Khazinat-u'l-Asfiya, Ghulam Sarwar
2 vols (Thamar-i-Hind Press: Lucknow, 1873)
Lata'if-i-Ashrafi, Nizam-u'd-din Yamani
(Nusrat-u'l-Mataba : Delhi, 1295 AH)
Ma'arij-u'l-Walayat, Ghulam Mu'in-ud-din Abdullah
MS: 2 vols. Personal Collection
Majma-u'l-Auliya, Mir `Ali Akbar Husaini Ardistani
MS: India Office Library
Manaqib-u'l-Mahbubin, Maulana Najm-u'd-din
(Thamar-i-Hind Press: Lucknow, 1875)
Matub-u't-Talibin, Syed Muhammad Bulaq Chishti
MS: Personal Collection
Mir'at-u'l-Asrar, `Abd-u'r-Rahman Chishti
MS: Personal Collection
Munis-u'l-Arwah, Jahan Ara Begum
MS: Personal Collection
Urdu trans.: Anis-u'l-Ashbah, Muhammad Fazl-i-Haqq,

(Matba'-i-Nami: ... 1315 AH)
Nuzhat-u'l-Khawatir, Hakim Syed `Abd-u'l-Hayy,
(Da'irat-u'l-Ma'arif: Hyderabad, 1956-62)
Fauza-i-Aqtab, Muhammad Bulaq Chishti
Chirangi Lal (Muhibb-i-Hind Press: Delhi, 1887)
Rauza-i-Auliya, Azad Bilgrami
(Matba-i-Eijaz Safdari, 1310 AH)
Risalah Hal Khanwadah-i-Chisht
Maulana Taj-u'd din, a descendant of Maulana Shihab-u'd-din Imam
MS: Personal Collection
Subhat-u'l-Marjan, Ghulam `Ali Azad Bilgrami
Ed.: M. Fazlur Rahman Nadwi, vol. i (Aligarh, 1976)
*Tazkirah `Ulama-i-Hind*, Rahman `Ali
Lith.: (Nawal Kishore: Lucknow, 1914)
Urdu trans.: Ayyub Qadiri (Pakistan Historical Society: Karachi, 1961)
Tiqsar al-Ahrar min Tizkar Junud al-Abrar, Siddiq Hasan Khan (Bhopal, 1878)
Zikr-i-Jami Auliya-i-Dehli, Muhammad Habibullah
MS: British Museum, Oriental 1746

G. Later Historical Works

`Ain-i-Akbari, Abu'l-Fazl
Text: Ed. Sir Syed Ahmad Khan (Delhi, 1272 AH)
English trans.: vol. i: H. Blochmann, reprint (Delhi, 1977)
vol. ii. H. S. Jarrett, reprint (Delhi, 1978)
vol. iii. H. S. Jarrett, reprint (Delhi, 1978)
Urdu trans.: 3 vols. M. Fida `Ali Talib (Lahore, n.d.)
Akbar Namah, Abu'l-Fazl
Text: Ed. Agha Ahmad `Ali and Abd-u'r-Rahim (Calcutta, 1873-87)
English trans: H. Beveridge, 3 vols, (Calcutta, 1897-1921)
Burhan-u'l-Ma'asir, Syed `Ali Tabataba'i
Ed.: Ghulam Yazdani (Hyderbad, 1355 AH)
Muntakhab-u't Tawarihk, `Abd-u'l-Qadir Badaoni
Text: Ed. Ahmad `Ali, Kabir-u d-din and W. Nassau Lees. Bib Indica (Calcutta, 1864-9)
English trans.: vol i:G.S.A. Ranking (Calcutta, 1895)

Tabaqat-I Akbari, Nizam-u `d-din Ahmd Bakhshi
Ed.: B. De and Hidayat Husain, Bib. Indica (Calcutta, 1913-40)
Tarikh-i-Ferishta, Muhammad Qasim Hindu Shah
(i) Nawal Kishore 1281 AH
(ii) Chapter XII dealing with Sufi-saints, Matba'-i Majidi (Kanpur, 1926)
Urdu trans.: M. Fida `Ali Talib (Hyderabad, 1926-32)
Tazkirah-i-Humayun-wa-Akbar, Bayazid Bayat
Text: Ed. Hidayat Husain, Bib. Indica (Calcutta, 1941)

WORKS IN ENGLISH

Afifi, A. H., *The Mystical Philosophy of Mubiyuddin Ibn-ul-Arabi* (Cambridge, 1939)

Ahmad, Aziz, *An Intellectual History of Islam in India (Edinburgh, 1969)*

Studies in Islamic Culture in the Indian Environment (Oxford, 1964)

Ahmad, M. G. Zubaid, *The Contribution of India to Arabic Literature* (Allahabad, 1946)

Arberry, A. H. *Sufism* (London, 1956)

Chaghatai, Abdullah, *Pakpattan and Baba Farid* (Lahore, 1968)

Faruqi, Burhan Ahmad, *The Mujaddid's Conception of Tawhid* (Lahore, 1940; reprint Delhi, 1977)

Gibb, H. A. R., *Mohammadanism* (London, 1951)

Habib, Muhammad, *Life and Works of Hazrat Amir Khusrau of Delhi* (Aligarh, 1927)

Politics and Society during the carly Medieval Period, collected works ed. K. A. Nizami, vols, (P. P. House, 1974-81)

Habib, M. and Nizami, K. A (eds). The *Comprehensive History of India.* vol v. (Delhi, 1970)

Habibullah, A. B. M. The *Foundation of Muslim Rule in India* (Lahore, 1945)

Haq, S. Moinul, *Islamic Thought and Movements in the Subcontinent* (711-1947) (Karachi, 1979)

Husain. A. M. *Tughluq Dvnasty (Thacker Spink: Calcutta, 1963)*

The Rise and Fall of Muhammad bin Tughluq (Luzac, 1938)

Iqbal, Mohd., *The Reconstruction of Religious Thought in Islam* (Lahore, 1944)

Islam and Ahmadism (Lahore, 1936)
Lal, K. S., *History of the Khaljis* (Munshiram Manoharlal): Delhi, 1980
Mirza, Muhammad Wahid, *Life and Works of Amir Khusrau* (Calcutta, 1935)
Nizami, K. A., The life and Times of Shaikh *Nizam – U'd-Din Auliya* (New Delhi, 2007)
Nizami, K.A., *The Life and Times of Shaikh Farid-u'd-din Masud Ganj-i-Shakar* (Aligarh, 1955)
Studies in Medieval Indian History and Culture (Kitab Mahal: Allahabad, 1966)
Some Aspects of Religion and Politics in India during the Thirteenth Century, 3rd edn (Delhi, 1978)
On History and Historizns of Medreval India (Delhi, 1983)
Prasad, Ishwari. *History of the Qaraunah Turks* (Indian Press: Allahabad, 1936)
Quresh:, I. H., *The Administration of the Sultanate of Delhi*, 1st edn (Lahore, 1942: 45th rev'd edn, Karachi, 1958)
Schimmel. Annemarie *Mystical Dimensions of Islam* (University of North Carolina Press, 1975)
Islam in the indian Sub- Contenent (Lenden, 1980)
Stephen, Catr, *The Archaeology and Monumental Remains of Delhi (Ludhiana, 1876)*
Toynbee, Arnold. `An Historian's Approach to Religion', Gifford Lectures delivered in the University of Edinburgh, 1952-3
Tripathi, R. P. *Some Aspects of Muslim Administration in India* (Allahabad. 1936)
Vambery, Arminius, *History of Bokhura* (London, 1373)
Williams, John Alden, *Themes of Islamic Civilization* (Berkeley, 1973)
Yamamoto, Tatsura, `Delhi: Architectural Remains of Delhi'. in Matsuo Ata and Takinowo, *Sultanate*, 3 vols (ToKzo, 1970)

WORKS IN URDU

Abd-ul-Haqq. *The Sufis Work in the Early Development of the Urdu I …* (Aurangabad, 1933)
Abd-u'r Rahman Sabah-u'd-din, *Bazm-i-Sufiyah* (Azamgarh, n.d.)
Ahmad Khan, Sir Syed. *Asar-u'd-Sanadad* (Karachi, 1966)
Lakchron Ka Majmu'a (Lahore, 1890)
Ali, Syed Yasin, *Sirat-i-Nizami* (Delhi, 1332 AH)

Ambethavi, Mushtaq Ahmad, *Anwar-u'l-`Ashiqin* (Osman Press: Hyderabad. 1332 AH)
Bashir-u'd-din, *Waqi at-i-Dar-ul-Hukumat Delhi* (Agra, 1916)
Bismil, Razi-u'd-din, *Tazkirat-u'l-Wasilin* (Lahore, 1318 AH)
Kanz-u't-Tawarikh (Nizami Press: Badaun, 1907)
Dihlawi, Akhlaq Husain, *Hazrat Mahbub-i-Ilahi* (Delhi, 1964)
Dihlawi, Mirza Muhammad Akhtar, *Tazkirah-i-Auliya-i-Hind* (Munir Press, Delhi, 1928)
Faridi, Muhammad Alam Shah, *Mazarat-j-Auliya-i-Delhi* (Jan-i Jahan Press: Delhi, 1330 AH)
Farrukhi, Aslam, *Sahibji Sultanji* (Karachi, 1989)
Nizam Rang (Karachi, 1988)
Nabib, Muhammad, *Hazrat Nizam-ud-din Auliya-Hayat Aur Ta'limat* (Delhi, 1972)
Ikram, M. *Mauj-i-Kausar* (Lahore, 1952)
Lahori, Ghulam Sarwar, *Hadiqut-u'l-Auliya*, Lith.: (i) Matba'-i-Khurshid `Alam (Lahore, 1293 ah) (ii), Ed., M. Iqbal Mujaddidi (Lahore, 1875)
Mahrahravi, Said Ahmad, *Hayat-i-Khusrau* (Lahore, 1909)
Nadwi, Syed Abu `l-Hasan *`Ali, Tarikh-i-Da`wat-o-`Azinutt*, vol, iii (Lucknow, 1963)
Nizami, Khwaja Hasan, *Tarikh-i-Auliya (Nizanu Ban Sari)* (Delhi 1945, 4th edn, Delhi, 1984)
Nizami, Khwaja Hasan San:, *Tazkirah-i-Nizmi* (Delhi, 1971)
Nizami, K. A., *Salatin-i-Dehli kay Mazhabi Rujhanat* (Delhi, 1958)
Tarikh-i-Masha'ikh-i-Chisht, vol. i (revised.edn. Delhi. n.d)
Shaikh Nizam-u'd-di Auliya (National Book Trust: India. 1985)
Tarikhi Maqalat (Delhi. 1965)
Zahir-u'd-din, *Ikhbar-u'l-Akhbar* (Nami Press: Lucknow, 1305 AH)

WORK IN JAPANESE

Matsuo Ara, *Dargahs in Medicval India* (Institute of Oriental Culture, University of ToKzo: ToKzo, 19777)

(সমাপ্ত)

প্রফেসর ড. মুহম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত মীরসরাই থানার দক্ষিণ হাইতকান্দি গ্রামের চৌধুরী পাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম মাহবুব আলী চৌধুরী এবং মাতার নাম মরহুম বেগম রওশন আক্তার সামছুন নাহার। ড. চৌধুরী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ থেকে কৃতিত্বের সাথে ১৯৭৩ সনে বি.এ. (অনার্স) এবং ১৯৭৪ সনে এম.এ. ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ব্যাংকক এর থামাসাত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭৯ সনে অর্থনীতিতে এমএস. ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৮২-৮৩ সনে তিনি কানাডার University of Manitoba বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে Ph.d. Coursework করেন। ১৯৯৩ সনে ভারতের রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গবেষণার মাধ্যমে অর্থনীতিতে Ph.d. ডিগ্রী লাভ করেন। ২০০২-০৩ সনে তিনি আমেরিকার New Orleans বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিষয়ে "Post Doctoral" পর্যায়ে গবেষণা করেন।

প্রফেসর ড. আবদুল মান্নান চৌধুরী অনেক বৃত্তি লাভ করেছেন। তন্মধ্যে D.P.I. মেধা বৃত্তি, I.R.C. Scholarship, Rockefeller Foundation Scholarship, Manitoba University (Canada) Teaching Assistantship, Saskatchewan University (Canada) Scholarship, NOrth Eastern University (USA) Tuition Fellowship, I.C.S.S.R. Doctoral Fellowship, Senior Fulbright Scholarship (Post-Doctoral) প্রভৃতি। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে প্রভাষক পদে যোগ দিয়ে কর্মজীবনের সূচনা করেন ১৯৭৪ সনে। অত:পর সহকারী অধ্যাপক, সহযোগি অধ্যাপক ও সর্বশেষে প্রফেসর পদে উত্তীর্ণ হন। বর্তমানে তিনি সিলেকশন গ্রেড প্রাপ্ত প্রফেসর এবং বিভাগের অন্যতম বরিষ্ঠ শিক্ষক।

তিনি অনেক গবেষণাধর্মী বই-পুস্তক লিখেছেন এবং অনুবাদ ও সম্পাদনা করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ হল: উন্নয়ন অর্থনীতি ও পরিকল্পনা, উচ্চতর কৃষি অর্থনীতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক অর্থনীতি ও বাণিজ্য, ইসলামী অর্থনীতি, শ্রম অর্থনীতি পরিচিতি, আধুনিক অর্থনীতি পরিচিতি, বিশ্ববাণিজ্য ও আন্তর্জাতিক লেন-দেনের অর্থনীতি, Rural Landlessness and Institutional Refroms, Environmental Marketing Strategies in the USL, Impact of Foreign Exchange Constraint on Asian Rice Import, The Unchained Divine Relations, The Miracles of Khatun-eZannat, Light Upon Light, মাইজভাণ্ডারী দর্শন, উৎপত্তি, বিকাশ ও বিশেষত্ব; হযরত শেখ নিজামউদ্দিন আওলিয়া (রঃ)'র জীবন ও কর্ম: আধ্যাত্মিকতার আলোকে, জবল-এ-নুর বা আলোর পাহাড়, কাওকাবুদ দুররী বা জীবনের ধ্রুবতারা প্রভৃতি। তিনি যে সকল জার্নাল সম্পাদনা করেছেন, সেগুলোর মধ্যে অর্থনীতি জার্নাল, Special Issue of Managerial Finance, টক উল্লেখযোগ্য।

প্রকাশনা ও গবেষণার পাশাপাশি তিনি চ.বি. অর্থনীতি বিভাগের সভাপতি, সিণ্ডিকেট সদস্য, ফিন্যান্স কমিটির সদস্য, নিজামপুর কলেজ পরিচালনা পরিষদের শিক্ষাবিদ সদস্য, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি (চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার) এর সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির নির্বাহী সদস্য, মাইজভাণ্ডারী একাডেমির সভাপতিসহ বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদে কর্তব্য পালন করেছেন। বর্তমানেও তিনি বিভিন্ন একাডেমিক ও গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত আছেন।

তাঁর স্ত্রীর নাম লুৎফুন্নেছা চৌধুরী। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি দুই পুত্র ও এক কন্যা সন্তানের জনক। তিনি মাসিক জীবনবাতি, আলোকধারা, তরজুমান, আল-মোবিন, মীরাছ, মুক্তির দর্শন প্রভৃতি ম্যাগাজিনে ইসলামী অর্থনীতি, সুফিতত্ব ও মাইজভাণ্ডারী দর্শনের উপর নিয়মিত লিখে যাচ্ছেন। ইসলামী অর্থনীতি, সুফিবাদ, ইসলাম ও মাইজভাণ্ডারী দর্শনের উপর তাঁর প্রায় তিন শতাধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। অর্থনীতি বিষয়ের উপর দেশী ও বিদেশী জার্নালে তাঁর প্রায় তিন শতাধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

তিনি বিভিন্ন সেমিনারে ও টিভিতে নিরলসভাবে বিভিন্ন বিষয়ে মূল্যবান বক্তব্য রেখে চলেছেন। তাঁর মন প্রাণ ইসলাম সুফিবাদ ও সুন্নিয়তের প্রচার, প্রসার ও সেবায় চির উৎসর্গীকৃত এবং নিবেদিত।

তিনি বিভিন্ন সংগঠন ও সংস্থা কর্তৃক বিশেষ সম্মাননা/পদক/সংবর্ধনা পেয়েছেন। তন্মধ্যে আদর্শ লিখক ফোরাম (আলিফ) কর্তৃক গুণীজন সংবর্ধনা, মাসিক তরজুমান লেখক সম্মাননা, মাসিক জীবনবাতি লেখক সম্মাননা, American Biographical Institute কর্তৃক Man of the Year হিসেবে স্বীকৃতি, আশেকানে মাইজভাণ্ডারী একাডেমী কর্তৃক সম্মাননা, 'আলোড়ন' পত্রিকা সম্মাননা, রাহেভাণ্ডার সম্মাননা, আঞ্জুমানে রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া সম্মাননা, রেজা ইসলামী একাডেমী সম্মাননা, আলোকিত সমাজ সম্মাননা, মীরসরাই সমিতি সম্মাননা ও চ.বি. একুশে পুরস্কার উল্লেখযোগ্য।